শিশির সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
২৯শে জুন, ১৯৬০
১৪ই আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
গ্রন্থজগৎ
৬, বঙ্কিম চাটার্জ্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রণ
ধনঞ্জয় সামন্ত
মহেন্দ্র প্রেস
৫৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হেমেন্দ্রকুমার রায়
„ রামচন্দ্র অধিকারী
„ পরিমল গোস্বামী
„ বিনয়কৃষ্ণ দত্ত
„ প্রাণতোষ ঘটক
„ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
„ হেমকুমার বসু
„ অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ বিকাশ বাগচি
„ অমৃতময় মুখোপাধ্যায়
„ কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হীরেন চৌধুরী
„ গণেশ বসু
„ লালমোহন দত্ত
„ অম্বুজ রায়
„ দিলীপ দাসগুপ্ত (দাসগুপ্ত স্টুডিও)
„ অরবিন্দ গুহ

SISIR SANNIDHYE

ভূমিকা

অভিনয় কলাবিদ্যাসমূহের অন্যতম প্রধানরূপে স্বীকৃতি লাভ করলেও ইহা মুখ্যতঃ কণ্ঠস্বর ও ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতাবর্গের পক্ষেও নিজ নিজ প্রতিভার কোন স্থায়ী নিদর্শন রেখে যাওয়া এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর পেষণে কণ্ঠস্বর ও স্বচ্ছন্দ অঙ্গসঞ্চালন রুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা অভিনয় দর্শকদের মনে স্মৃতিসর্বস্ব হয়ে ওঠে। তাদের প্রতিভা এমন কোন স্থায়ী উপাদান রেখে যায় না যার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সাহায্যে অনাগত কালের চিত্তে তাদের কোন কালজয়ী বৈশিষ্ট্য উৎকীর্ণ হতে পারে। অবশ্য নিতান্ত আধুনিক কালে সবাক্ চিত্রের সাহায্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের নাট্যপ্রতিভা ভবিষ্যৎ যুগের নিকট রক্ষিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

শিশির ভাদুড়ীর অতুলনীয় নটপ্রতিভার এই নিশ্চিহ্ন বিলোপের চিন্তা আমাকে প্রায়ই ক্ষুব্ধ করে তোলে। যে প্রতিভা বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সহস্র সহস্র দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত, জটিল ব্যক্তিত্বের গভীরে যার অন্তর্দৃষ্টি রসিকসমাজকে মুহুর্মুহু বিস্ময়চকিত করে তুলত, এমন কি চরিত্রস্রষ্টা কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকারদেরও মনে নূতন প্রেরণার দোলা জাগাত, সেই নবনব নির্মাণক্ষমা প্রতিভা যে মরণের অন্তিম ফুৎকারে একেবারে নিঃশেষে নির্বাপিত হয়ে গেল, তার প্রতিভা-রহস্যের কোন সূত্র আমাদের কাছে রেখে গেল না, তাকে ভবিষ্যৎ যুগের নিকট তুলে ধরবার ক্ষীণতম উপায় থেকে আমাদের বঞ্চিত করে গেল, অদৃষ্টের এর চেয়ে কোন নিদারুণতর পরিহাস কল্পনা করাও অসম্ভব। সাহিত্যের কাল্পনিক চরিত্রসমূহকে যে রক্তমাংসের মানুষের চেয়েও জীবন্ত করে তুলত, মানবমনের সূক্ষ্মতম ভাবগুলিও যে নিজের চোখে-মুখে ছবির চেয়েও উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়ে তুলত, মানুষের অবচেতন চিত্তের গভীরে যে সমস্ত চিন্তার নিঃশব্দ-গোপন সঞ্চার সকলের দৃষ্টি

এড়িয়ে গিয়েও নটের রহস্যভেদী অনুভূতি-মুকুরে স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব ফেলত সে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত বিচিত্র শক্তি সংহরণ করে নিয়ে এক ধূসর বিস্মৃতি-যবনিকার তলে আত্মগোপন করে আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চলে গেছে। অন্যান্য বিভাগের কলাশিল্পীদের দেহাবসান ঘটলেও তাদের আত্মার জ্যোতিঃ আমাদের মানস আকাশকে আলোকিত করে। কবিকে, চিত্রকরকে, স্থপতিকে আমরা তাঁদের রচনার মধ্যে অমর করে অনুভব করতে পারি। শুধু সংগীত ও অভিনয়-কলা তাদের সৃষ্টি-প্রকরণের ক্ষণজীবিত্বের অভিশাপে এই অমরত্বের স্বর্গলোকচ্যুত। বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এত বিভিন্ন জাতীয় চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন, তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে এত খণ্ড খণ্ড করে নানা আধারে বিকীর্ণ করেছেন, কথার বুদ্‌বুদে ও অঙ্গভঙ্গীর বিচিত্র সাবলীলতায় নিজের অখণ্ড প্রাণ-শক্তিকে অবাধ সঞ্চরণে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে তাঁর নটলীলা সমাপ্তির পর এই খণ্ডাংশগুলি আর ফিরে এসে উৎসমুখে পুনঃ সংহত হয়না। সংসারের নশ্বরত্ব বোঝাবার জন্য তাই মহাকবি মঞ্চাভিনয়ের উপমাই প্রয়োগ করেছেন। আমাদের শিশির তাই নিজেকে রাম, আলমগীর, চাণক্য, জীবানন্দ প্রভৃতির বিচিত্র প্রাণলীলার মধ্যে এমন নিঃশেষে পরিবেশন করে দিয়েছে, নিজ বস্তুজীবনকে এত ছায়া ও মায়া জীবনের সূক্ষ্মতার মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে যে তার আর কোন স্বতন্ত্র পরিচয় খুঁজে পাওয়া দুরূহ। আরও দুঃখের বিষয় এই যে এই ছায়া ও মায়া-লোকের ক্ষণিক বিভ্রমগুলিও তাদের স্রষ্টার স্মৃতিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারে নি। প্রতিভার প্রাণের ফুৎকারে যাদের জন্ম, সেই প্রতিভাকে চিরকালের মত সঞ্জীবিত করে রাখার মত তাদের অবিচল বস্তু-অবয়ব কোথায়?

দুই

শিশির সম্বন্ধে যখন আমার মন এইরূপ ক্ষোভ ও অতৃপ্তিবোধে পূর্ণ তখন নিরতিশয় আনন্দের সঙ্গে শুনলাম যে তার কয়েকজন গুণগ্রাহী

অনুরাগী সহচর তার জীবন-অপরাহ্ণের কয়েকটি স্মৃতিকণা সঞ্চয় করে তাদের গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে। শিশির তখন শিবির-প্রত্যাবৃত্ত, রণবিমুখ একিলিসের ন্যায় নটজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে এক অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক মননশীল সংলাপে নিজ অনায়ত্ত আদর্শসাধনার জন্য অন্তঃসঞ্চিত ক্ষোভকে ও বহুব্যাপিনী মনীষাকে মুক্তি দেবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করছে। আমার তখনি মনে হল যে শিশিরের স্মৃতিরক্ষার এও একটা গৌণ হলেও প্রকৃষ্ট উপায়। শিশির কেবল নটশ্রেষ্ঠই ছিল না, তার নাটক সম্বন্ধে এত ব্যাপক জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল ও সাহিত্যবিষয়ে এমন একটি স্বচ্ছন্দসঞ্চারী ও অনুশীলিত মন ছিল যা বাঙলার তথাকথিত পণ্ডিত সমাজেও দুর্লভ। তার সেই বুদ্ধিদীপ্ত, অনুরাগসরস মনের কথাগুলি ধরে রাখতে পারলেও, নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞান ও চিন্তাশীল মন্তব্যগুলিকেও সাধারণের গোচরীভূত করতে পারলেও তার ব্যক্তিত্বের অন্ততঃ একটা দিকও ভবিষ্যৎ যুগের কাছে পরিচিত হবে ও যাঁরা ভবিষ্যতে নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করবেন তাঁদের কাছে মহামূল্য সম্পদরূপে গণ্য হবে। এইজন্যই আমি এই সাধু প্রচেষ্টাকে আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই আলাপচারীর সংগ্রাহক গ্রন্থারম্ভে শিশিরকে অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনাটি নানা দিক্ দিয়ে সার্থক। মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তির একটা অবিচ্ছিন্নতা ও নিশ্চিতি আছে। আমরা জানি যে তা সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে সম উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করবে ও এর একটা নির্ভরযোগ্য স্থায়িত্ব আছে। কিন্তু অপরাহ্ণ-সূর্যের রশ্মিবিকিরণে যেমন বর্ণাঢ্যতা তেমনি আকস্মিকতাও লক্ষণীয়। আমরা যেমন এর বর্ণালীবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হই, তেমনি এর কিরণচ্ছটা যে কোথায় পড়বে, কোন্ অপ্রত্যাশিত কোণকে হঠাৎ আলোকে ভরে দেবে, আবার পর মুহূর্তেই এর রশ্মি অপসারিত হয়ে কোন নূতন স্থানকে স্বর্ণাভামণ্ডিত করবে তা পূর্ব থেকে অনুমান করতে না পেরে বিস্মিত হই। আর এর

সমস্ত প্রজ্বলন্ত দীপ্তির মধ্যে আসন্ন বিলয়ের ম্লান বিষাদ যেন আত্মগোপন করে থাকে। দেখতে দেখতে সমস্ত বর্ণসমারোহ, সমস্ত দিগন্তপ্লাবী ঐশ্বর্য গোধূলিচ্ছায়ার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় ও আমাদের মনে একটা উদাস বিভ্রান্তি জাগায়। শিশিরের প্রতিভাসূর্যের এই বিদায়-আয়োজনও তেমনি যেমন একদিকে বিস্ময়কর, তেমনি অপরদিকে করুণ ভাবের উদ্দীপক। যে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে অজস্র দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করতে পারত তার শিথিল মুষ্টি থেকে ঝরে পড়া দু'চারটি শস্যকণাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হল— বিধাতৃবিধানের একি দারুণ অসঙ্গতি!

তিন

প্রথমতঃ নাট্যজগৎ সম্বন্ধে নাট্যাচার্যের উক্তিগুলি বিশেষরূপে তাৎপর্যবহ ও স্মরণীয়। প্রথমতঃ নাটক মূল্যায়ন। Ibsen ও রবীন্দ্র নাটক সম্বন্ধে তার অভিমতে সাহসিকতা আছে। নাটক সমস্যাপ্রধান হলেই তার আবেদন কালসীমাবদ্ধ হবেই। এক যুগের সমস্যা পরবর্তী যুগের স্বাভাবিক জীবনছন্দ হতে পারে। কাজেই বিদ্রোহের আবেগে ও যুদ্ধ-আস্ফালনে মাত্রাধিক্য এসে যায়—পুরাতন কোলাহলের অর্থ-রিক্ততা তার মধ্যে প্রকটিত হয়। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক সম্বন্ধে তার অভিমত শ্রদ্ধান্বিত ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তার মত খুব অনুকূল ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীষ্মে'র চেয়ে অনেক ভাল এই মত সে অকুণ্ঠিতভাবে ব্যক্ত করেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' ও 'আলমগীর'-এ শিশিরের যে অনেকখানি হাত ছিল তা নাট্যজগতে প্রচলিত সংবাদ—শিশিরের উক্তিতে তা সমর্থিত হয়েছে। গিরিশবাবুর সামাজিক নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকের চেয়ে অনেক ভাল—এই তার মত নিশ্চয়ই অপক্ষপাত বিচারেও সমর্থিত হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' বইটা তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কতকগুলি নাটক সম্বন্ধে শিশির যে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ

করেছে সেই অংশই তার স্মৃতিকথার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটকটি সম্বন্ধে শিশিরের সমালোচনা নাট্যকারের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ের উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত করেছে। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' ও 'ষোড়শী' নিয়ে শিশিরের সঙ্গে গ্রন্থকারের যে মতানৈক্য ও সময় সময় শরৎচন্দ্রের উষ্মাপ্রকাশ তা নাট্যজগতের ইতিহাসে খুব কৌতূহলদ্দীপক ঘটনা। প্রযোজক অভিনয়সৌকর্যের দিক থেকে গ্রন্থকারের উপর কতটা কলম চালাতে পারে ও তাতে গ্রন্থকারের আত্মমর্যাদা কতটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী'কে শিশির বঙ্গ সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নাটক মনে করত, যদিও আমার মনে হয় যে নাটকটির ঘাত-প্রতিঘাত ও চারিত্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘটনে পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে যে আয়তনের প্রয়োজন ছিল নাটকটিতে তার অভাব। মনে হয় যেন পরিণতিটি অনেকটা তাড়াহুড়ো করে, আকস্মিকভাবে এসে পড়েছে। ক্ষমার ঔদার্য ও মহত্ত্ব প্রদর্শন নৈতিক জগতে বড় ঘটনা হতে পারে। কিন্তু নাট্যজগতে যদি ন্যায্য নাটকীয় উপায়ে তা সংঘটিত না হয়, তবে একে নাট্যোৎকর্ষের নিদর্শনরূপে হাজির করান চলে না। যা হ'ক ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের চরিত্রাভিনয়ের রীতি-পার্থক্য ও মালিনীর ভালবাসার স্বরূপ-নির্ণয়—এটা personalised নয়, idealised—শিশিরের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। 'বিজয়া' নাটকে আরও একটি দৃশ্য যোগ করলে তার বিলাসকে বিবাহ করার স্বীকৃতিসূচক সই করাটি আরও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত—এ বিষয়ে আমার বরাবর খানিকটা সংশয় ছিল। এটা যেন বিজয়ার চরিত্র-দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। বিলাসের প্রতি তার সাময়িক অনুকূলচিত্ততাই তার এই প্রতিরোধ শিথিলতার কারণ। শিশির সেইরূপ একটি দৃশ্য সংযোজনার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের আতিশয্যের জন্য তা মঞ্জুর করেন নি। এই সংশয়টির এখন নিরসন হল। চন্দ্রগুপ্তের একটি অধুনাবর্জিত দৃশ্যে ছায়ার আচরণের সঙ্গতি দেখান হয়েছিল। শিশিরের কাছ থেকে এ খবরটিও আমরা পেলাম।

মাইকেলের নাট্য-প্রতিভা সম্বন্ধে শিশির কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করত তার পরিচয়ও এই স্মৃতিচর্যায় বহুস্থানে ছড়ান আছে। যাত্রা সম্বন্ধেও যে তার সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং পাশ্চাত্ত্য অনুসরণজাত থিয়েটারের প্রাদুর্ভাবের জন্য যে আমাদের স্বাভাবিক নাট্য-প্রবণতা ব্যাহত হয়েছে এ সম্বন্ধেও শিশির তার সাক্ষ্য রেখে গেছে। মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের আলোচনায় নাটকটির দৃশ্যসংযোজনা ও গঠনরীতির কৃতিত্ব সে যে ভাবে পরিস্ফুট করেছে নাট্যকলায় অভিজ্ঞ সমালোচক ছাড়া তা আর কারুর পক্ষে সম্ভব হত না।

তা ছাড়া রঙ্গালয় ও মঞ্চজগতের যাঁরা উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধেও শিশিরের কাছ থেকে আমরা অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানতে পারি। শিশিরের পূর্বসূরীদের সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে নিজ ঔদার্যেরই পরিচয় দিয়েছে। গিরিশচন্দ্র, অমৃত মিত্র, অমর দত্ত, দানীবাবু, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি, কুসুমকুমারী, চারুশীলা, কৃষ্ণভামিনী প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নট-নটীদের অভিনয়-কৌশল ও শ্রেষ্ঠত্বের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে সে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেছে। অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক সহযোগীদের সম্বন্ধেও সে প্রশংসায় কোন কার্পণ্য করে নি। অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অবনীন্দ্রনাথ যে অনেক বেশী উঁচু দরের ছিলেন এই অপ্রিয় সত্যটা এক শিশিরই সাহসিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছে। মহৎপূজাকে সে কখনই সত্য-অপলাপের পর্যায়ে নামায় নাই।

দেশবিদেশের কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধেও তার ইতস্ততঃ ছড়ান মন্তব্য আছে। এতে তার পড়াশুনার পরিধি-বিস্তার ও অন্তর্ভেদী মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই জাতীয় আলোচনায় সামগ্রিকতা নাই, থাকা প্রত্যাশিতও নয়। বৈঠকী আলাপে অনেক প্রসঙ্গ আকস্মিকভাবে উঠে পড়ে; আবার সামান্য আলোচনার পরেই প্রসঙ্গান্তর এসে যায়। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল, হঠাৎ-এসে-পড়া ও চলে-যাওয়া বিষয়ে চিন্তাশক্তি স্থির হবার সময় পায় না। লক্ষ্য ঠিক করার আগেই লক্ষ্যভেদের বস্তু

সরে যায়। তবে এই সমস্ত আলোচনায় শিশিরের মন যে কত সজীব ও সক্রিয় ছিল, সাহিত্য সম্বন্ধে প্রায় সব বিষয়েই তার খানিকটা মত প্রস্তুত ছিল তার পরিচয় মিলে। অপরাহ্ণ-সূর্যের তির্যক রশ্মি হয়ত বিষয়ের মর্মভেদ করতে পারে নি, কিন্তু এর ভাবপরিমণ্ডলকে যে খানিকটা আলোকিত করেছে তা নিঃসন্দেহ।

চার

শিশির-প্রতিভার একটা সাহিত্যিক স্মৃতিস্তম্ভ-নির্মাণ বিষয়ে আমার একটা পরিকল্পনা ছিল এবং সে সম্বন্ধে তার সঙ্গে খানিকটা আলোচনা করে তার কুণ্ঠিত ও শর্তাধীন সম্মতিও পেয়েছিলাম। এই পরিকল্পনাটি ছিল বাংলা নাট্য সাহিত্যের ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ একটা শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন তৈরি করা ও তাদের অভিনয়যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের টীকা-টিপ্পনি-সংযোজনার ব্যবস্থা। নাটকের নাট্যগুণ বা সাহিত্যিক উৎকর্ষ আলোচনার জন্য হয়ত অন্য যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যেতে পারে, যদিও এদিকেও শিশিরের যোগ্যতা যে সর্বাধিক তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অভিনয়ের দৃষ্টিভঙ্গী হতে নাটকের বিচার, দৃশ্যসংযোজনা ও সংলাপের পরিমাণ অভিনয়ের দিক থেকে কতটা গ্রাহ্য, সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের খাতিরে লিখিত নাটকের কিরূপ পরিবর্তন সমীচীন, শব্দপ্রয়োগের সঙ্গে অভিনয়-কৌশলের কি সম্পর্ক, দর্শকের রুচির সঙ্গে নাট্য প্রতিভার কতখানি আপসের প্রয়োজন—এই সমস্ত বিষয়ে প্রামাণ্য মতপ্রকাশের অধিকার একমাত্র শিশিরেরই ছিল। তার মধ্যে সাহিত্যরুচি, পাণ্ডিত্য ও মঞ্চাভিজ্ঞতার যে দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল বাঙলা দেশে তা অদ্বিতীয় ও তুলনারহিত। সে এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল এই শর্তে যে একজন গবেষক ছাত্রকে তার সঙ্গে সব সময় যুক্ত করে দিতে হবে এবং তার অবসরকালে বা প্রেরণার মুহূর্তে তার যে সমস্ত চিন্তাধারা উৎসারিত হবে তার জন্য প্রতীক্ষা করে তাদের লিপিবদ্ধ করতে হবে। বলা বাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এরূপ চাতকবৃত্তির অনুমোদন ঠিক সহজলভ্য

ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার কোন উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না। আমার এ বিশ্বাস এখনও অক্ষুণ্ণ আছে যে শিশিরকে দিয়ে এই কাজটা করাতে পারলে বিশ্বসাহিত্যে নাটকের ইতিহাসে একটা অভাবনীয় কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত হত। শিশিরের নটজীবনের কথা যখন ভুলে যেত তখনও তার নাট্যসমালোচনার স্মৃতি অক্ষয় থাকত এবং হয়ত এই পরিচয়েই সে স্মরণীয়তা অর্জন করত।

যা ঘটে নি, তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নাই। যাই হ'ক এই স্মৃতি-সঞ্চয়নগ্রন্থে আমরা শিশিরের যে আংশিক ও খণ্ডিত পরিচয় পেলাম, তার প্রতিভার যে কয়টি চূর্ণরশ্মি এখানে একটা ক্ষীণ আলোকবৃত্ত রচনা করেছে, তাই তার নটজীবনের অপরিহার্য শূন্যতাকে কিছু পরিমাণে পূর্ণ করে জনচিত্তে তার স্মৃতিকে কিছুটা রক্ষা করবে। মানুষ শিশির তার রাজকীয় উদারতা, তার সহৃদয়তা, তার বন্ধুবাৎসল্য, তার মজলিসী মেজাজ নিয়ে মনীষার যে স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করেছে তাতে তার চিরবিলুপ্তির অন্ধকার কিছুটা দূর হবে এই আশা নিয়েই এই ক্ষুদ্র ভূমিকাটি শেষ করলাম।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



বিজয়া নাটকে রাসবিহারী চরিত্রে নাট্যাচার্য

পশ্চিম আকাশের অস্তগামী সূর্য, শুধু একটু ম্লান রক্তিমাভা, তার আলোর অন্ধকারের প্রথম স্পর্শ। তার নেই দাহ, শুধুই মৃদু উত্তাপ; নেই চোখ-ধাঁধান ঔজ্জ্বল্য, শুধুই ক্লান্তিহরা স্নিগ্ধ আলো। তবু ক্ষণিকের জন্যও উপযুক্ত পাত্রে মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজের প্রকাশ দেখা যায়, একটি প্রচণ্ড শক্তির আবেষ্টন সর্বাঙ্গে অনুভূত হয়। সন্ধ্যার অস্তাচল-আরূঢ় ম্লান রবিই প্রভাতের প্রশান্ত মিহির, দ্বিপ্রহরের রুদ্র ভাস্কর এই কথাটিই নতুন করে মনে পড়ে যায়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি যেদিন হাসি-কান্নার রঙ্গভূমিতে প্রথম নেমেছিলেন আমরা তখনও রূপ নিইনি। এমন কি, আমাদের জন্মদাতারাও তখনও বোধ হয় কল্পনা, তখনও ইচ্ছা হয়েই ছিলেন। তারপর দিনে দিনে শশিকলার মত বেড়ে উঠলেন তিনি, বাল্য-কৈশোরের নানা রঙ্গ সেরে যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের আমেজে ভরপুর—তিনি তখন শিক্ষক, রসিক, নাট্যলক্ষ্মীর দীন ভক্ত। তখন চলেছে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। তারপর একদিন এল সেই বিশেষ দিন, যে দিনটির কথা জন্মলগ্নেই বিধাতাপুরুষ তাঁর ললাট-লিপিতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন—তাঁর জীবনের মহাক্ষণ। সে পরম লগনকে তিনি হেলা করেন নি আর তাই দিকে দিকে সেদিন জয়ডংকা বেজেছিল। সেদিনকার আনন্দ-উৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

আমরা যখন ধরণীর আলোক দেখলাম শিশিরকুমার তখন মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের প্রবল তেজে দেদীপ্যমান। তিনি নিজেই বলেছেন, ১৯২৯ পর্যন্ত তাঁর কোন নাটকই অসফল হয়নি। তাঁর সেই অপ্রতিহত বিজয় অভিযানের কিছু কিছু হয়ত অবোধ আমরা মা'র কোলে বসে দেখেছি। দেখেছি কিন্তু বুঝিনি; বুঝিনি কারণ বোঝার বয়স সেটা নয়, তখন মায়ের স্নেহ-আদরের দাম পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি। অবশ্য বয়স হলেও যে বুঝতাম এমন কোন কথা নেই, কারণ বোঝার মন সকলকার থাকে না।

তারপর বয়স যখন বাড়ল, বোঝবার সময় যখন হল, তখন শিশিরকুমার আর সাধারণ পর্যায়ের মানুষ নন, তিনি তখন উপকথার দেশের। তাঁর সবকিছুতেই তখন একটি অতিমানবীয় স্পর্শ লাগতে সুরু করেছে। তাঁর কথা, তাঁর চলন,

তাঁর বলন, এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও তখন এমন সব কথা মুখে মুখে চলতে সুরু করেছে যাতে তাঁকে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক বলেই মনে হয়েছে।

তখনকার দিনে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের হাতে আজকালকার মতো এত সহজে পয়সা আসত না। অনেক খোশামোদ, অনেক দরবার করে তবে দু'-চারটে পয়সা পাওয়া যেত। কাজেই থিয়েটারের সব চেয়ে কমদামী টিকিট কেনার মতো আট আনা বা একটা টাকা পাওয়াও কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। তাছাড়া থিয়েটার-বায়োস্কোপের উপর গুরুজনরা মোটেই খুশি ছিলেন না; ওসবে নজর গেলে ছেলেরা উচ্ছন্নে যায়। তাই থিয়েটার দেখা আর বিশেষ হয়ে উঠত না। তবে মাঝে মাঝে গুরুজনদের সঙ্গে এদিক-ওদিক থিয়েটার দেখিনি এমন নয়, আর তার মাঝে শিশিরকুমারের অভিনয়ও দু'-একবার দেখে থাকব।

অবশ্য বিচার করে দেখবার মত বুদ্ধি তখনও হয়নি, তবু যখনই তাঁর অভিনয় দেখেছি, তখনই মনে হয়েছে অন্যদের থেকে যেন পৃথক তিনি। অল্প দামের সীটে বসে কদাচ কখনো তাঁর গলা যদি কানে না-ও পৌছে থাকে, কি বলতে চাইছেন বুঝতে কষ্ট হত না। আর তাতেই মনে হত সত্যিকার বড় অভিনেতা নিশ্চয়ই, নইলে অন্যরা যেখানে হৈ-চৈ করে, চেঁচিয়ে, অঙ্গভঙ্গী করে একটি চরিত্রকে পুরোপুরি খাড়া করতে পারে না, সেখানে কত সহজে কত সামান্য পরিশ্রমে পুরো চরিত্রকে চোখের সামনে জীবন্ত করতে পারতেন। তাই কুড়ি-পঁচিশ বছর পরেও আলমগীরের স্বপ্নদৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভাসে, আজও যেন দেখতে পাই বন্দী আলমগীরকে; চোখের সামনে ভেসে ওঠে রামের সেই ব্যাকুল কথা—'কার কণ্ঠস্বর!'

আরো বড় হলাম, বুদ্ধির বিকাশ ঘটল কিনা জানি না, তবে মনের ভিতর আধুনিকতার নানারকম প্যাঁচ খেলতে সুরু করল। বুঝি না-বুঝি বিদেশী কিছু কিছু লেখা পড়ে পণ্ডিতম্মন্য বনে গেলাম। তখন মনে হল, শিশিরকুমারের অভিনয় ঠিক স্বাভাবিক নয়, তাঁর প্রয়োগরীতি সেকেলে বস্তাপচা, তাঁর শিক্ষাদানের রীতি অচল হয়ে পড়েছে। সে যুগটি নবনাট্য আন্দোলনের শুরুর যুগ, নবান্ন-র যুগ, গণনাট্য সংঘের প্রসারের যুগ। আমাদের মত তরুণদের বোঝান হয়েছিল আর আমরা বুঝেও ছিলাম যে, বাংলার নাট্য আন্দোলনের নতুন মোড় ঘুরছে।

কোন কিছুর অগ্রদূত হবার একটি আনন্দ আছে, আছে উন্মাদনা, আছে উচ্ছ্বাস। এই তিনটির একত্র সমাবেশ আমাদের মধ্যেও হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নতুন-কিছু করার মোহটি চলে গেল, দেখলাম নতুন বলে যাকে

ধরতে গেছি সেটি আসলে নতুনই নয়। ভুলটি ভাল করেই ভেঙে দিলেন শিশিরকুমার—নবান্নরই সমশ্রেণীর দুঃখীর ইমান প্রযোজনা করে। দেখা গেল, যাকে বাতিলের দলে ফেলা হয়েছিল তিনি সেদিনও সকলের আগে।

যাঁদের আমাদের চেয়ে জ্ঞানী মনে করতাম, হঠাৎ তাঁদের জ্ঞানের পরিমাণ ও গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল। থিয়েটারের বিষয়ে বিদেশী লেখকদের লেখা বই কিছু কিছু পড়তে শুরু করলাম, তার থেকে এই বোধটুকু জন্মাল যে, নাটক সম্বন্ধে যত আলোচনাই করা যাক না কেন, নাটকের অভিনয়ের মূলসূত্র তা থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ভাবে নাটক পড়ার, অভিনয় দেখার ও সম্ভব হলে অভিনয় করার।

এবার থেকে সেই প্রচেষ্টাতেই রত হলাম। দেশী-বিদেশী বহু নাট্যকারের বহুরকম নাটক পড়লাম আর তার থেকে আবো বিপদে পড়তে হল। এতদিন পর্যন্ত একটি ভাসা-ভাসা ধারণা ছিল যে, বক্তব্যের উপরই নির্ভর করে নাটক, একই কথা বার বার বললে বক্তব্যের মাধুর্য নষ্ট হয়, আর বক্তব্যবিহীন নাটক নাটকই নয়। অবশ্য বক্তব্য বলতে, কেন জানি না, বুঝতাম—প্রগতিশীল বক্তব্য। কিন্তু পৃথিবীর বহুবিখ্যাত নাটকের মধ্যে অদ্ভুত রকম মিল নজরে পড়ল আর আমাদের ধারণা অনুযায়ী তাদের মূল কথাকে বক্তব্য বলে স্বীকার করাও কঠিন ছিল। তাহলে কি সেগুলো ভাল নাটক নয়? তাহলে ভাল নাটক বলব কাকে?

মনের মধ্যে যখন এই রকম দোটানা, তখন আমাদেব শ্রদ্ধাস্পদ একজন এসে বললেন—ওহে, শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করবে? মনে হল যেন উত্তর এবার পাওয়া যাবে। শিশিরকুমারের বিরুদ্ধবাদীরা আর যাই বলুন, নাটক সম্বন্ধে যে তাঁর পড়াশুনার অভাব ছিল এমন অপবাদ অতি বড় নিন্দুকেও দিতে পারত না। তাই এক কথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়ে গেলাম।

কোন বিখ্যাত লোককে কাছ থেকে দেখতে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূরের মানুষ কাছে এলে দূরত্বের মোহজাল কেটে গিয়ে রূঢ় বাস্তবের সংস্পর্শে কল্পনার স্বপ্নমন্দির ভেঙে যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাই বোধ হয় বলেছিলেন যে, 'ইয়ারো' না দেখাই ভাল। অবসরকালে মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন আমাদের না-দেখা 'ইয়ারো'র কথা মনে করলেই ক্লান্তি দূর হবে। (কথাগুলো স্মৃতি থেকে বলছি, কাজেই আক্ষরিক সত্য না-ও হতে পারে, তবে ভাবটি মোটামুটি বোধ হয় ঠিকই আছে।)

শিশিরকুমারের কাছে গেলে যে আশাভঙ্গ হবে এটি ধরেই নিয়েছিলাম আর নিয়েছিলাম বলেই খুব বেশি আশাহত হইনি। মনের মধ্যে অনেক দিন আগে যে অতিমানবীয় কথাটি বাসা বেঁধেছিল, সেটির অভাবই প্রথম চোখে পড়েছিল। দেখেছিলাম মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত রুচিবান একটি মানুষকে, যাঁর ঘর বই-এ ঠাসা। ইজিচেয়ারে-বসে চুরুট-হাতে মোটা-চশমা-চোখে এই মানুষটিই যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি। কিন্তু কথা বলতে বলতে চোখের বিদ্যুৎ যখন ঝলসে উঠেছিল তখন বুঝতে পেরেছিলাম—touch of divine madness তাঁর ভিতরেও আছে।

প্রথমেই বলেছিলেন—নাটক পড়-টড়? আমতা আমতা করে বলেছিলাম—একটু একটু। খুশি মনে বলেছিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়বে। নাটক যত পড়বে তত ভাল বুঝবে। তারপর নাটক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করতে করতে বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের মালিনী পড়েছ? মাথা নেড়েছিলাম, অবশ্য তাতে হ্যাঁ কি না বোঝা যায় না। আমাদের মধ্যে একজন বলেছিল—পড়িনি, তবে অভিনয় করেছি। খানিকটা যেন অবাক হয়েছেন এই ভাবে আবার হেসে বলেছিলেন—বল কী হে, তোমার তো খুব সাহস দেখছি? রবীন্দ্রনাথের বই-এর মধ্যে মালিনীর কদরই সবচেয়ে কম, অথচ তুমি তা অভিনয় করেছ! তা পড়নি কেন? সেই চটপট জবাব দিয়েছিল—বুঝতে পারি না। হেসে উঠেছিলেন—বুঝতে পার না কেন? বেশ, পড়ে শোনাচ্ছি। বই নিয়ে এসে বলেছিলেন—এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি, অথচ এর কোন খোঁজই রাখে না কেউ।

সেদিন তাঁর পড়া শুনে আর তাঁর ব্যাখ্যা থেকে নাটকের রস গ্রহণ সহজ হয়ে গিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গিয়েছিল। বুঝেছিলাম বক্তব্যই নাটকের মূল কথা নয়, মূল কথা চারিত্রিক দ্বন্দ্ব এবং তার সুষ্ঠু বিন্যাস আর চরিত্রসৃষ্টি। এই দুইটি গুণের সঙ্গে নটের অভিনয়-কলা আর সুপ্রয়োগরীতি যদি মেলে তাহলেই নাটক শ্রেষ্ঠ নাটক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সেদিনের পর বহুবার বহুভাবে শিশিরকুমারের সঙ্গে মেশবার সুযোগ হয়েছে। মঞ্চে তাঁর দিনের পর দিন অভিনয় দেখেছি; তার পরও বহুবার আমাদের তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথম দর্শন থেকেই তাঁর সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছে তার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার সবটাই আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মোটামুটি উনিশ শ'

ছাপ্পান্ন শেষ দিক থেকে আটান্ন সালের শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যে সব কথা হয়েছে তারই কিছু কিছু অংশ এখনো আমাদের কাছে আছে।

উনিশ শ' আটান্ন সালের জুন মাস নাগাদ নাট্যরসিক ও নাট্যামোদী একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলবার জন্য তিনি 'নব্য বাংলা নাট্যপরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পুরানো নাটক পাঠ, নাটক সম্বন্ধে আলোচনা ও নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে বর্তমান যুগের বাঙালী নাট্যরসিকদের পুরানো যুগের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে ভবিষ্যতের পথনির্দেশের ইচ্ছা তাঁর ছিল। এই প্রসঙ্গে যে-সব আলোচনা করতেন তিনি সেগুলো সবই লিখে রাখবার চেষ্টা করেছি। প্রথম প্রথম সঙ্গে সঙ্গে লেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শেষের দিকে এত কথা বলতেন যে, সঙ্গে সঙ্গে লেখা বাতুলতার নামান্তর মাত্র হয়ে দাঁড়াত। তাই পরে স্মৃতি থেকে লিখেছি। তার ফলে হয়ত অনেক সময় কোন কোন কথা একটু-আধটু অদল-বদল হয়ে গেছে। তবে যতদূর সম্ভব তাঁর মুখের কথাই লিখে রাখতে চেষ্টা করেছি। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ঠিক মতো বুঝতে না পেরে ভুল করেছি। তার জন্য দোষটা আমাদের।

অনেক বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী সম্বন্ধে শিশিরকুমারের মতামত কৌতূহলোদ্দীপক মনে হবে। বাঙলা দেশের যে-সব মনীষীর কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি তাঁদের সম্বন্ধেও শিশিরকুমারের কাছ থেকে অনেক কথা জানা গিয়েছে। আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি বাংলা দেশের তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের আচার-ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধেও কিছুটা আলোকপাত করবে বলে মনে হয়।

তবে শিশিরকুমারের জীবনী-গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা আমরা করছি না বা শিশির-কুমারের নটজীবনের মূল্যায়নের দায়িত্বও আমাদের নয়। এসব কাজের জন্য উপযুক্ত পাত্র অনেকেই আছেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষ শিশিরকুমারের চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উপর তাঁরই কথার সাহায্যে কিছুটা আলোকপাত।

তাঁর কোন কোন কথা স্পষ্টতঃ অতিভাষণ-দোষে দুষ্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে তিনি কথাগুলি বলতেন তা বিবেচনা করলে বোধ হয় তাঁর এ দোষ অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। তিনি বলতেন আমাদের মত বয়ঃকনিষ্ঠদের কাছে, যাদের গুরুর অনুকরণ করার স্পৃহা অত্যন্ত উগ্রভাবে বর্তমান; তাছাড়া থিয়েটার এমনই একটা জায়গা যেখানে, নটগুরু গিরিশচন্দ্রের মতে বশিষ্ঠেরও পদস্খলন হয়, কাজেই কোমলমতি তরুণ-তরুণীরা যাতে পথ না হারায় তার জন্যই অনেক সময় অনেক কথা হয়ত কিছুটা রেখে-ঢেকে বলতেন।

আমাদের কথা হয়ত একটু বেশী বলা হয়ে গেল, কিন্তু শিশিরকুমার সম্বন্ধে আমাদের বলবার অধিকার কি আছে তা বোঝাবার জন্তই এত কথা বলতে হল। অধিকারী বিবেচনা করলে হয়ত বলবার অধিকার আমাদের কিছুই নেই, তবু তাঁর স্নেহ আমরা পেয়েছিলাম আর সেই স্নেহের দাবিতেই এই লেখাগুলি প্রকাশ করছি।

শিশিরকুমারের কথা বলার আগে বোধ হয় সে সময়কার বাংলা রঙ্গমঞ্চের অবস্থা বর্ণনা করা অন্যায় হবে না। শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণের সময়কার অবস্থার সঙ্গে আজকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অবস্থার বেশ একটা মিল আছে। মাত্র এক যুগ আগে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের নেতৃত্বাধীনে বহু বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী জনসাধারণকে আনন্দদান করতেন। অথচ আজ তাঁদের প্রায় কেউই আর রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেন না। সেদিনও রঙ্গমঞ্চের এইরকম অবস্থা। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ প্রথম যুগের দিক্‌পাল অভিনেতারা তখন গত হয়েছেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু তখনও জীবিত, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অবতরণ আর বিশেষ করছেন না। সে যুগের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দানীবাবুই তখন নিয়মিত অভিনয় করছেন। কিন্তু গিরিশ-যুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তখন স্বপ্নকথায় পর্যবসিত হয়েছে।

গিরিশ-যুগে সাধারণ অভিনেতারাও পরবর্তী যুগের বহু সুপরিচিত অভিনেতার চেয়ে ভাল অভিনয় করতেন। কথাটা শিশিরকুমার নিজেই বলেছেন। কিন্তু মিলিতভাবে অভিনয়ের উন্নতির কোন প্রচেষ্টা তাঁরা কখনও করেননি। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলতেন—এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিনয়ের মান অবশ্য খুবই উন্নত ছিল, কিন্তু সমগ্রতার দিক থেকে কোন রকম উন্নতির চেষ্টা তাঁদের ছিল না। এমন কি, অনেক সময় যদি মনোমত দর্শকসমাগম না হত তাঁরা অভিনয় সংক্ষেপ করে কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে শেষ করতেন। অভিনয়ে একটি ডোলেরও (ছক) প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরা। প্রথম যুগের বিখ্যাত অভিনেতারা অবশ্য এ ডোলে আবদ্ধ থাকতেন না। কিন্তু পরবর্তী যুগের প্রায় সকলেই এ ডোলের ফেরে পড়ে গিয়েছিলেন। এমন কি, দানীবাবুও তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, লোকে তার ক্ষমতার কথা জানে বলে তাকে সমীহ করেই চলে, কিন্তু অক্ষম যখন তার ক্ষমতার কথা

বলে তখন সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই ক্ষমতার প্রকাশ করে। সেইজন্য অক্ষমের ক্ষমতা প্রকাশ একটি ডোলেই হয়। শক্তিশালীর সে ডোল মেনে চলবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তারাই ডোল বেঁধে দেয়। শিক্ষক ছাত্রের গ্রহণযোগ্য করেই শিক্ষা দেন; কেতাবী শিক্ষায় সে হিসাব থাকে না, কাজেই সেখানে মুড়ি-মিছরির একই দর। মিছরির অবশ্য তাতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু বিপদে পড়ে মুড়ি। দুর্বল অভিনেতারা তাই ডোলের বাঁধনে পড়ে হাঁসফাঁস করত আর সামগ্রিকভাবে অভিনয়ের অবনতিই ঘটত।

অল্প বয়স থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই দুর্বলতা শিশিরকুমারের নজরে পড়েছিল। পরীক্ষার পড়ার দিকে তাঁর ঝোঁক না থাকলেও কবিতা ও নাটক জাতীয় 'অপাঠ্য' বইয়ের উপর ঝোঁক ছিল খুবই বেশি। তাছাড়া অভিনয়, নাট্যপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধেও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করেছিলেন তিনি। সে সময়ের বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রায় সব নাটকই তিনি দেখেছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতার অভিনয়-কলাও তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। যার ফলে দীর্ঘ আটচল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরেও বিভিন্ন অভিনেতার বাচনভঙ্গীর নিখুঁত ভাবে নকল করতে পারতেন। এতদিন পরে যদি অতকাল আগের কথা মনে থাকে, তবে সেই সময় আরো কত বেশি মনে ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

স্কটিশ চার্চ কলেজে ছাত্র থাকাকালীন শিশিরকুমার সর্বপ্রথম জুলিয়াস সিজার নাটকে ক্রটাসকে রূপায়িত করেন। কিন্তু সে সময় প্রয়োগের কোন দায়িত্ব বোধ হয় তাঁর উপর অর্পিত হয়নি। পরিচালক হিসাবে শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাব যতদূর জানা যায়, নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র-এর নাট্য-রূপায়ণে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এরপর নাট্য-পরিচালক ও নট হিসাবে শিশিরকুমারের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হতে থাকল।

ইতিমধ্যে এম-এ পাস করে শিশিরকুমার তদানীন্তন মেট্রোপলিটান কলেজ-এ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) ইংরেজি সাহিত্য অধ্যাপনার কাজ নেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অধ্যাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নোট ধরে পড়ান তিনি পছন্দ করতেন না আর সেজন্য ছাত্ররা অনুযোগও করত। অধ্যাপনার কাজে লেগে থাকলে শিশিরকুমারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষার প্রধান অধ্যাপক হওয়া হয়ত অসম্ভব ছিল না। শোনা যায়, তিনি যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আশুতোষ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ দেবার প্রতিশ্রুতিও

দেন। অধ্যাপনার কাজে খুব বেশি চাপ না থাকায় তাঁর পক্ষে অন্য কাজ করে অধিক অর্থোপার্জন করাও সম্ভব ছিল, আর তিনি তা করতেনও। তবু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন। তাঁর রক্তে যে তখন অভিসারের ডাক এসেছে! কানুর বাঁশী শোনার পর রাধা কি আর ঘরে থাকতে পারে!

শোনা যায়, ইনস্টিটিউটে তাঁর নাট্য-প্রয়োগের কাজে তিনি অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন। বিনয় বাবু তাঁকে অভিনয় করা ও করানর কাজে উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি জীবিত থাকলে শিশিরকুমারের পক্ষে বোধ হয় সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতরণ সম্ভব হত না। স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন—You are wasting yourself, Sisir, your true vocation is on stage। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতরণের ঔচিত্য সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করলেন শিশিরকুমার, তখন গুরুদাসবাবু তৎকালীন রঙ্গালয়ের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে বলতে পারেন নি যে, তুমি নেবে যাও শিশির! বরঞ্চ বোধ হয় বারণই করেছিলেন।

আজকে বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকেও, শিক্ষিত বাঙ্গালী তার আত্মীয়-স্বজনের কেউ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গণ্ডী পেরিয়ে যায় তা পছন্দ করে না। কাজেই আরো চল্লিশ বছর আগেকার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অথচ আশ্চর্যের কথা, সেই সময়েও শিশিরকুমারের মাতা তাঁর কৃতী সন্তানের এই 'জাতিচ্যুতি'র কথা জেনেও কোন আপত্তি করেননি, বরং তাঁকে আশীর্বাদই করেছিলেন। শিশিরকুমারই বলতেন যে, যত রাত করেই ফিরুন না কেন তিনি, তাঁর জন্য জেগে বসে থাকতেন মা।

মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, পদের মোহ, সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহ দ্বিধাহীন ভাবে ত্যাগ করে, নিশ্চিত বর্তমানকে ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বুকে নাট্যকলার উন্নতির মন্ত্র মুখে নিয়ে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে সেই যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি, তারপর আর কোনও দিনও পিছন দিকে ফেরেন নি। বার বার বাধা পেয়েছেন, বার বার অসাফল্যের মধ্যে হারিয়ে গেছেন কিন্তু কখনো হার মানেন নি। ম্যাডান কোম্পানীর চাকরিতে ঈর্ষাতুর সঙ্গীদের চেষ্টায় নিজের ইচ্ছামত উন্নতি করা সম্ভব হয় নি বলে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধে নি তাঁর। একজিবিশনে দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা অভিনয়

করার পর যখন অভিনয়খ্যাতি, পরিচালনখ্যাতি আর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের খ্যাতি চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল আর সেই খ্যাতির সুযোগ নিতে তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ যখন আইনের ফাঁকে কৌশলে সীতার অভিনয়-স্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন, তখন যেমন অদম্য উৎসাহে অজানা অচেনা যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে রাতারাতি নাটক লিখিয়ে অভিনয় করেছিলেন, তেমনি অল্পকাল আগে জরাজর্জর ভগ্নদেহে 'নব্য বাংলা নাট্যপরিষদ' স্থাপন করে আমাদের উপর যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব চাপিয়ে, সোৎসাহে রবীন্দ্রনাথের মালিনী-র রিহার্সালের কাজ নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন এবং দিনের পর দিন যৌবনের শক্তি নিয়ে সুপরিচিত-অপরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একই ভাবে অভিনয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য শেখাতে চেয়েছেন।

উৎসাহের আধিক্যে ভাঙা হাতের কথা ভুলে গিয়ে, বয়সোচিত দৌর্বল্যের কথা ভুলে, প্রায়ান্ধ দৃষ্টির কথা বিস্মৃত হয়ে যেভাবে তিনি লাফালাফি করতেন তাতে তাঁর পরিচিতেরা কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে এই ভেবে সশংকিত হয়ে পড়তেন। তিনি কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। যে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তাঁর সেই ক্ষমতার পরিচয় জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত দিয়ে গেছেন।

শিশিরকুমার ছিলেন চির আশাবাদী; বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না তাঁর। তবে তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন যে, নতুন নতুন পথ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয়, একথাও তিনি জানতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে উপযুক্ত অর্থাভাবের জন্য কোন এক বা একাধিক সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের পক্ষেও এ দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না। এ কাজের জন্য প্রয়োজন সরকারী সাহায্যপুষ্ট জাতীয় নাট্যশালার। সরকারী পরিচালন ব্যবস্থায় তিনি আস্থাবান ছিলেন না। তিনি জানতেন সরকারী লালফিতার চাপে অনেক সদিচ্ছা লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে লোপ পায়। এই জাতীয় নাট্যশালা সরকারের অর্থসাহায্যে গড়ে উঠলেও তার দায়িত্ব থাকবে পুরোপুরি নাট্যরসিকমহলের হাতে। তাঁর থিয়েটার যাবার পর এই জাতীয় নাট্যশালার কথাই বার বার বলতেন তিনি।

কিন্তু একলা অরণ্যে রোদনই সার হয়েছিল। বহুজনে তাঁর মতের যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার

কাজে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন প্রতিশ্রুতিই কার্যকরী হয়নি। বার বার এই ভাবে আশাহত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আর আমাদের মনে হয় এই হতাশাই তাঁর মহাপ্রয়াণকে ত্বরান্বিত করেছে।

শিশিরকুমারের সৃষ্ট যে চরিত্রটির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের মিল সব চেয়ে বেশি তা বোধ হয় বাংলাদেশের আর এক দুর্ভাগ্য-প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিত্র। সেইজন্যই বোধ হয় জীবনের শেষ পর্যন্ত মাইকেলই সব চেয়ে ভালো করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। বিরূপ নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ যে হয় না এ খবর শিশিরকুমারের অজানা ছিল না। তাই নিজেই দুঃখ করে বলেছেন, হাজার বছরে এমন একজন লোক আসে যাকে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মনায়করা পথ ছেড়ে দেয়। সে সৌভাগ্য আমার নয়। তবু দৈবের কাছে হার স্বীকার করেন নি কখনো, কর্ণের মত মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধই করেছিলেন।

অনেকের মুখেই শোনা যায়, শিশিরকুমার যে সম্মান পেয়েছিলেন সে সম্মান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক বা শিল্পী পাননি। কথাটা হয়ত মিথ্যা নয়; হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, দেশবাসীর প্রীতির দানে তাঁর ভাণ্ডার ভরে উঠেছে, কিন্তু যিনি রাজোচিত স্বভাবের অধিকারী, মুষ্টিভিক্ষার দানে তাঁর মন উঠবে কেন? তাছাড়া সাধারণ পাঁচ জনের মত ভাণ্ডার ভরে রাখতে তো শেখেন নি তিনি। তিনি তো কেবল দিয়েই গেছেন, যে ভাবে তিনি দিয়েছেন তাতে কুবেরের ভাণ্ডার ফুরোতেও দেরি লাগে না, শিশিরকুমার তো সামান্য মানুষ। একদিন যাঁরা তাঁর সে দান নিয়েছেন তাঁরা তাঁকে বেহিসাবী বলতে পারেন, মূর্খ বলতে পারেন, কিন্তু অস্বাভাবিক বলেন কি করে?

মানুষ হিসাবে শিশিরকুমারকে বিচার করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, কাজেই সে চেষ্টা করব না। শুনেছিলাম তিনি দর্পী, তিনি দাম্ভিক। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁর স্নেহাতুর রূপটাই দেখেছি, অযাচিত অপ্রাপ্য স্নেহের দানে আমাদের মন ভরিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি তা অমূল্য।

শিশিরকুমারের পঞ্চভূতের নশ্বর দেহ প্রকৃতির বুকে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু নাট্যাচার্য অমর হয়ে রইলেন আমাদের মধ্যে। যতদিন বাঙালী জাতি থাকবে, বাংলা ভাষা থাকবে, বাংলার থিয়েটার থাকবে, ততদিন শিশিরকুমার স্থির অবিনশ্বর ধ্রুবতারার মতো বাঙালী-মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

শিশিরকুমারের অমরত্ব প্রশ্নাতীত হলেও সাধারণ মানুষ তাতে খুশি হতে পারে না। তারা চায় স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছু। তাই আজ নানাদিক থেকে প্রস্তাব আসছে, শিশিরকুমারের নামে রাস্তার নামকরণ করা হ'ক, বা পার্কের নামকরণ হ'ক, বা শিশিরকুমারের নামে অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ক, বক্তৃতামালা সৃষ্ট হ'ক অথবা তাঁর চিতাস্থলে কিংবা কলেজ স্কোয়ারে স্মৃতিস্তম্ভ গড়া হ'ক।

এই ধরনের স্মৃতিচিহ্নের উপর শিশিরকুমারের মোহ তো ছিলই না, উপরন্তু ছিল বীতরাগ। তিনি বলতেন যে, তাঁর মত দেখতে হবে কি না হবে এমন একটি মূর্তি খাড়া করে বছরে একদিন গলায় মালা দিয়ে যাকে-তাকে দিয়ে শ্রাদ্ধ না করাই সমীচীন। রাস্তার নামকরণেও তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। বলতেন, শ্রদ্ধার নামে লাথি মারানর দরকার কি? যে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে একদিন তিনি নাট্য-উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেই অধ্যাপকের পদের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত করলেই কি উপযুক্ত সম্মান দেখান হবে তাঁকে?

একদিন যেমন গিরিশচন্দ্রের অসমাপ্ত কাজ নিয়ে শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছিলেন, তেমনি শিশিরকুমারের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নিতে পারলেই বোধ হয় তাঁর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখান হয় অবশ্য আজকালকার দিনে ঠিক শিশিরকুমার-গিরিশচন্দ্রের সমশ্রেণীর মানুষ পাওয়া কঠিন, কাজেই তাঁরা যে কাজ একলা করেছিলেন সে কাজ পাঁচজনে করতে হবে। তাছাড়া যুগটাও গণতন্ত্রের, এখন কাজ করতে হলে পাঁচজনের সাহায্য সবাগ্রে প্রয়োজন। শিশিরকুমারেব স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টিই বোধ হয় তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হত। তাঁর শেষ কথা বলতে গেলে, জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টির প্রস্তাব। কাজেই শিশিরকুমারের নামে কলকাতায় জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টি করার চেষ্টাই আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে।

হয়ত কোন দিন আমাদের জাতীয় সরকারের টনক নড়বে, আমাদের রাজ্যে রাজ্যে সৃষ্টি হবে জাতীয় নাট্যশালা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো বাংলা নাটকের উন্নতি কতদূর হবে তা সহজেই কল্পনীয়। বাংলা দেশে রসিক লোকের অভাব বোধ হয় এখনও ঘটে নি, আর বাংলা দেশের আকাশে যতই দুর্যোগ ঘনিয়ে আসুক, আজও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হাত পাতলে খালি হাতে যে ফিরতে হয় না এ কথা আমরা বিশ্বাস করি। নাট্যাচার্যের স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব কেউ নিলে জাতির ঋণ শোধের দায়িত্বই নিয়ে ধন্য হবেন এ কথা বলা যায়।

নাট্যাচার্যের কথা শুনে নতুন কোন মানুষ যদি এগিয়ে এসে তাঁর অসমাপ্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় তাহলেই আমাদের কর্তব্য কিছুটা পালন করা হয়েছে বলে মনে করব। অকারণ যে স্নেহ আমরা পেয়েছিলাম তার প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়, তবু গুরুকৃত্য পালন করে অন্ততঃ স্নেহের ঋণ পরিশোধের সামান্য চেষ্টা করছি।

॥ ২ ॥

শিশিরকুমারের কথা বলতে গেলেই দু'টি জায়গার কথা আমাদের মনে পড়ে—৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে গ্রন্থজগৎ-এর ঘর আর ২৭৮নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়ীতে তাঁর নিজস্ব ঘর। এ ছাড়া শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চের বা ওখানে যে ঘরে তিনি থাকতেন, তার কথাও হয়ত বলা চলত, কিন্তু অকারণ কথার জাল বুনে সময় কাটানর প্রয়োজন কি? তবে প্রথম দু'টি ঘরের পরিবেশেই তাঁর কথা আমরা শুনেছি বলে, পরিবেশ বর্ণনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করছি।

গোলদীঘির আশে-পাশে নানা আকর্ষণ পথচারীদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কাজেই তাদের মধ্যে ৬নং বাড়িটির নজরে পড়বার মত কোন গুণই নেই। একেবারে সেকেলে প্যাটার্নের দোতলা বাড়ি, বাইরের দিকে কাঠের বারান্দা, তার কাঠগুলোও নড়বড়ে হয়ে গেছে, নীচের ঘরগুলোয় সারি সারি বই-এর দোকান—নামকরা কোন কোম্পানিও নয়, তাই সাধারণের সঙ্গে পরিচয় এদের অল্প। উপযুক্ত সঙ্গ না পাওয়ার দরুনই বোধ হয় বাড়িটা সাধারণের চোখে অপরিচিতই রয়ে গেছে। অথচ বাংলার চিন্তাক্ষেত্রে যে সব মনীষীর দান আমরা সগর্বে স্বীকার করি তাঁদের অনেকেই এ বাড়িতে বহু বার এসেছেন।

বাড়ির প্রথম মালিক ডেভিড হেয়ারের নাম আজকের দিনে কোন বাঙালীকেই বোধ হয় বলতে হবে না। এ বাড়ির প্রতিটি কামরায় সেদিন উনবিংশ শতকের নব জাগরণের অগ্রদূতরা এসে যে রীতিমত সোরগোল তুলতেন তা এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও আমরা কল্পনা করতে পারি। হিন্দু কলেজের মাতব্বররা ছাত্রদের সঙ্গে এসে ড্যাম-নেটিভ দশা থেকে কি করে মুক্তিলাভ করা যায় তার উপায় নির্ধারণ করুন আর নাই করুন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলা দেশবাসীদের আলোকের রাজ্যে আনার পন্থা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক যে করতেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশের সম্ভাবনার প্রথম অংকুরোদ্গম কার কার এ

বাড়িতেই হয়েছিল তার খবর জানা নেই ; জানলে সে যুগের বহু বিখ্যাত মনীষীর ন্যায়ই যে নজরে পড়ত তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই আমাদের।

ডেভিড হেয়ারের যুগ কাটিয়ে বিংশ শতকের প্রথম দিকে এ বাড়িতে দেখতে পাই আমরা আর একজন বিখ্যাত বাঙালী মনীষীকে। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঞ্জীবনী সে সময়ে বাংলা দেশে রীতিমত আলোড়ন তুলত। সঞ্জীবনী পত্রিকার বহু বিখ্যাত রচনাই হয়ত তৎকালীন বিদগ্ধ জনসমাজের সামনে পড়া হয়েছিল এবং ফরাসের ওপর বসে পান-তামাক খেতে খেতে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তিরা সুচিন্তিত মতামতও হয়ত দিয়েছিলেন।

মেসোমশায়ের কাছে শ্রীঅরবিন্দ বা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এসে অনেক দিন কাটিয়ে গেছেন, আর সেই সময় তাঁদের বন্ধু ও পরিচিত লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করে বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদের জন্মও বোধ হয় এই বাড়িরই কোন ঘরে বসে দিয়েছিলেন তাঁরা।

এমনি বহু মনীষীর আনাগোনায় একশ' বছরের ওপর মুখর থেকেছে ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িটি। অথচ সেখানকার বোবা মাটিতে কারো পদচিহ্নই আজ দেখা যায় না। ব্যস্তসমস্ত খরিদ্দারের দল লিষ্টিমাফিক বই কিনতে দোকানে দোকানে হানা দিচ্ছে। প্রয়োজনের গণ্ডীর বাইরে নজর দেবার মত অবকাশ তাদের কোথায়? সে অবকাশ থাকলে এই বাড়ির একটি ঘরের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই নজরে পড়ত।

দরজা দিয়ে ঢুকে দু'পাশের কাঠ দিয়ে ঘেরা দোকানঘরগুলো পেরিয়ে, ওপরে ওঠার সিঁড়ি বাঁয়ে রেখে, ডাইনের কাদা-প্যাচপেচে উঠোনটা পেরিয়ে যে ঘরের সামনে দাঁড়াতে হয় তার সাজসজ্জা সাধারণ দোকানঘরের মত ঠিক নয়। সামনের দরজার প্যানেলগুলোতে সুন্দর মাদুরের টুকরো, বেত দিয়ে আটকান। দরজার ঠিক ওপরে চৌকো ভেন্টিলেটারের গায়ে শোলার চাঁদমালা, তার নীচেই সুদৃশ্য কাপড়ের ঝালর।

ঘরের ভেতরে ঢুকে একটু এগিয়ে এলেই, কাঠের ওপর বেত দিয়ে আটকান মাদুরমোড়া কাউণ্টার। কাউণ্টারের পেছনে গোটা দুই তিন বইঠাসা আলমারী—এইটুকুতেই দোকানের লক্ষণ। ঘরের বাকী অংশের বেশির ভাগ জুড়ে একজোড়া তক্তাপোষের ওপর ফরাস পাতা আর তার চার পাশে কতকগুলো মোড়া। পশ্চিম দিক ছাড়া বাকি তিন দিকে বুক-সমান উঁচুতে কাঠের র‍্যাক (প্রদর্শনীর কাজে লাগানো হয়)। ঘরের এখানে ওখানে শোলার ময়ূর ও অন্যান্য

শোলার কাজ। সবটা মিলিয়ে বৈঠকখানার চেহারাই ফুটে ওঠে। এখানে প্রায়ই আসতেন শিশিরকুমার। আসতেন রিহার্সাল দিতে, আসতেন নাটক পড়তে, আসতেন আসর জমাতে।

এখানেই হতো নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন, সেখানে আসতেন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায়—যাঁর আঁকা 'নিউ জেনারেশন' পশ্চিমের দেওয়ালের মাঝখানটা জুড়ে ঝুলছে, তার ডাইনে রয়েছে শিশিরকুমারের বসা একটা ছবি আর বাঁয়ে ফরাসী শিল্পী তুলু লোত্রেকের 'নিজের চেহারা' আর তাঁর জীবনীকার পিয়ের লা মুরের ছবি—রসজ্ঞ পণ্ডিত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, শিল্পী ও লেখক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, চিত্র ও নাট্যসমালোচক পঙ্কজকুমার দত্ত, জ্যোতির্ময় বসু রায়, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, সাহিত্যিক শিবনারায়ণ রায়, কুমারেশ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ, অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী, কাউন্সিলার তারাপ্রসাদ মিত্র, কবি রাম বসু, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী করুণা বন্দোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস, শ্যামলী চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে, রত্নমালার মধ্যমণির মত উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে বিরাজ করতেন শিশিরকুমার।

২৭৮নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়িটার সর্বাঙ্গে যেন মাখানো আছে একটা শান্ত বিষাদ। সামনের অশ্বত্থগাছটার ভেতর খোলা হাওয়া যেন সেই বিষাদের সুরটাই বয়ে নিয়ে যায়।

বাড়িটার অবস্থা খুব ভাল নয়, দেখলে মনে হতো এই বুঝি ধসে পড়ে। খোলা নর্দমার ওপর বাঁধানো সাঁকোজাতের জিনিসটার এক পাশে ছড়ানো এক রাশ পাথরের খোয়া—কোন দিন হয়ত রাস্তাটা সারানো হবে তারই প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে ঢালা হয়েছে। কিন্তু প্রস্তুতির চাপে হতভাগ্য পথের অবস্থা শোচনীয়। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে বাড়ির সদরে এসে দাঁড়ালে প্রথমেই নজরে পড়ে দু'পাশের দু'টো দোকান।

কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক গোটা দুই তিন চেয়ার আর রঙচটা একটা চৌকো টেবিল। সাধারণ মধ্যবিত্তের বসার ঘর। এখানে শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের কোন স্পর্শ আমাদের নজরে পড়েনি।

বাইরের ঘর পেরিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি—সরু সরু উঁচু উঁচু ধাপগুলো গোটা দুই বাঁক নিয়ে শেষ হয়েছে ছোট্ট একটা ছাদে। ছাদের ওপাশেই

শিশিরকুমারের ঘর। সে ঘর থেকে বাইরের বড় রাস্তায় জীবনের প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। ঘরের মধ্যেও তাই অতীতের স্তব্ধ প্রতীক্ষা, ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশের অপেক্ষায়।

ঘরের একটা দিক জুড়ে একটা জোড়া খাট, মাঝখানে একটা সোফা, তার পাশে উপরে খানকতক বই আর অ্যাশ-ট্রে। অন্য দিকে ছোট একটা খাট—উনি ঐ খাটেই শোন। ঘরে একখানি মাত্র চেয়ার—কেউ এলে বসতে দেওয়া হয়, লোক বেশি এলে জোড়া খাটে বসে। ঘরের বাকি অংশে শুধু বই—অধিকাংশই নাটক, মঞ্চ-সম্বন্ধীয় আলোচনা-সমালোচনা—তার মধ্যে সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী আছে, আছে অন্য বিদেশী নাট্যকারদের নাটক, নাটক ও মঞ্চ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন যুগের লেখা বই, বহু বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকের রচনা-সংগ্রহ, বাঙলা নাটকের প্রায় সব ক'টি বই আর কিছু সংস্কৃত কাব্য ও নাটক।

ঘরের তিন দিকের দেওয়ালে তিনটি ছবি—নিউইয়র্কে পৌছানর পরেই তোলা শিশিরকুমারের ছবি। মাইকেলের রূপসজ্জায় শিশিরকুমার—ছবির পাশে বোধ হয় 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি হাতে লেখা, আর সমরনায়কের সাজে সুভাষচন্দ্র।

ঘরটির সর্বাঙ্গে শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের ছাপ। কিন্তু এ শিশিরকুমার রঙ্গজগৎ-এর আসরের মধ্যমণি শিশিরকুমার নন, এ অনাদৃত কমল-হীরা যার দ্যুতি একদিন দিগন্ত উদ্‌ভাসিত ছিল, কিন্তু যা ইতিমধ্যেই স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে।

॥ ৩ ॥

প্রথম যেদিনের কথা আমাদের খাতায় লেখা আছে, দেখা যাচ্ছে সেটা ১৯৫৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর, কয়েক দিন পরেই এণ্টালী কালচারাল কনফারেন্স (এর বর্তমান নাম কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলন, প্রধান শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া।) নাট্যাচার্যের অভিনয় করার কথা মাইকেলের ভূমিকায়, তাই রিহার্সাল দিচ্ছেন আর অন্যান্য সমস্ত চরিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের শেখাচ্ছেন। কে একজন তাঁর নিজের ভূমিকা বলতে গিয়ে কথাগুলো অহেতুক একটু টেনে বলায় নাট্যাচার্য সেটি সংশোধন করে দিয়ে বললেন—প্রত্যেক লোকেরই একটি না একটি মুদ্রাদোষ থাকে। আকাঙ্ক্ষার 'আ'টির এই টান আমার মুখে মানায়, অন্য লোকে কপি করতে গেলে মানাবে কেন? সে যে চৌর্যবৃত্তি!

অন্য একজন অভিনেতার কথা উঠল, মাইকেল-এ কোন একটি চরিত্রের জন্য তাঁর নাম করা হল। একটু ভেবে নাট্যাচার্য বললেন—অনেক দিন করেনি, সেই ১৯৪৩-এ আর এটি ১৯৫৭ হল বলে।

মাইকেলের মদ খাওয়ার কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় বললেন—Rosy wine কেন বলে? Rosy condition হয় বলে? লাল রঙের এক মদ আছে বটে, কিন্তু সে তো বাচ্চা ছেলেদের মদ ধরতে শেখানোর জন্যে ব্যবহার হয়।

এই সময় চা এসে পড়ল, ওঁকে দেওয়া হল এক কাপ, একটা চুমুক দিয়েই বললেন, কী দিলে হে, গরম চিনির সরবৎ—

ব্যস্ত হলাম—সে কি! খুব চিনি দিয়েছে বুঝি?

চিনি তো বেশি দিয়েছেই, তার উপর চা একদম দেয়নি।

ইতিমধ্যে মাইকেলের সম্বন্ধে কে প্রশ্ন করেছেন, তাকে উত্তর দিলেন—মিশ্র ছন্দ প্রথম এল ব্রজাঙ্গনা কাব্যে। তার আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতায় ছিল আইনমাফিক ছন্দ। এই লোকটাই প্রথম নিগড় ভেঙে ফেলল। বাংলা দেশে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে রেঁনাসাসের ফাদার বলতেই হবে।

চায়ে চিনি বেশি হয়েছে বলে আমরা ওঁকে চা খেতে বারণ করলাম। তাতে বললেন—খাওয়ার দিকে মন দিলে রিহার্সাল দেওয়া হবে না। তবু কিছুটা চা দিতে যাওয়ায় বললেন—আচ্ছা, দাও আধ কাপ, এখন আমার স্বাস্থ্যের দিকে তোমাদেরই নজর রাখতে হবে, আমার এখন কেউ নেই। I am all alone। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন—আমার যে কর্মকর্তা ছিল, সে এখন mentally as well as physically paralysed। যা করতে হবে তোমরা নিজেরাই plan করে ঠিক করে নাও।

এই সময় টাকা-পয়সার কথা উঠল, তাতে বললেন—টাকা-পয়সা হলে মানুষ মস্ত বড় একটা ভুল করে। ভাবে, তারা একটা মস্ত বড় কিছু হল। কিন্তু বোঝে না মরলে কেউ তাকে মনেও রাখবে না, সংসারকে কিছু দান করলে তবেই তাকে মানুষ মনে রাখে।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠল এবার, বললেন—কোন বিশ্বাস সত্য নয়। সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক, সত্য grow করছে। কেউ কেউ বলে ভগবানও grow করছে। সবাই মনে মনে একটি ঔরঙ্গজেব। যে যার বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আর যা হওয়া উচিত নয় তাই হচ্ছে—গোঁড়া হচ্ছে।

তারপর অভিনয়ের প্রসঙ্গে গেলেন, বললেন—আমার সত্তর বছর বয়স হতে চলল। এ তো আর মিথ্যে কথা নয়। সত্তর বছর সত্যি হতে চলল। আমি চাই playটি ভালো করতে। তোমরা সবাই ঠিক সময়ে ঢুকলে আর বেরুলেই হবে। আমি আর গৌরদাস তো ভালই করেছিলাম, লোকেও মন্দ বলেনি।

চা আর দেব কি না প্রশ্ন করায় বললেন—না, আর চা দিও না। আমি অসুস্থ, মনেও সুস্থ নই। তবে লোককে বলতে ভালোবাসি না যে অসুস্থ আমি।

কথা বলতে বলতে হাত থেকে চা-টা চলকে গায়ে পড়ল, হাসলেন—দেখছ, অসত্যের মতো কেমন গায়ে এসে পড়ল চা-টা।

মাইকেল বইটা পাওয়া যায় না এই অনুযোগের উত্তরে বললেন—হ্যাঁ, বইটি ছাপাতে হবে। তারপর জানতে চাইলেন ক'টা বেজেছে, আটটা?

বললাম—সাড়ে ন'টা।

চমকে উঠলেন সময় শুনে, বললেন—এতো সময় কেটে গেল, অথচ কই, রিহার্সাল তো তেমন হল না! উঠে পড়লেন।

যাবার সময় বললেন—আর কিছু গোলমাল না হয় তো আগামী এপ্রিল মাসে we shall meet under a ছাউনী। তবে সবই ভাগ্য।

গাড়ীতে যেতে যেতে কলকাতার থিয়েটারের রি-মডেলিংএর কথা হচ্ছিল, তাতে উনি বললেন—আজ তো দেখলাম কোন একটা থিয়েটারের বাড়ি। বাড়ি তো খুব ভাল করেনি, ঐ রকম হলদে রঙ হবে? ও যে পায়খানার রং। স্টেজের কি কিছু improvement করেছে? তা যদি না করে থাকে এত হৈ-চৈ কেন? স্রেফ হুজুক?

পরের দিন আবার এলেন রিহার্সালে। কে একজন হঠাৎ হেসে উঠেছিল, শুনে বললেন—১৮৭৭ সালে আমি তখন আট-দশ বছরের ছেলে। একদিন এক খ্রীষ্টান সভায় গেছি, সেখানকার এক পাদ্রীর প্রার্থনার সময় তার অদ্ভুত সুর শুনে খুক্ করে হেসে উঠেছিলাম। তোমরা সে রকম অদ্ভুত শব্দ কেউ কর না।

মাইকেলের জীবন প্রসঙ্গে এক সময় বললেন—দেবকী বলে কেউ নেই। ও যে কি করে মাইকেলের জীবনে এল তা-ও জানি না। আবার এক সময় একজনের কথা সংশোধন করে বললেন—মেসো অর্থাৎ মাসির বর। আমি সেকেলে লোক, সেকেলে কথাই বলি। তারপর ছ'নম্বর বাড়ির কথায় বললেন—বাড়িটি তো ঐতিহাসিক বাড়ি।

শ্রীঅরবিন্দ আসতেন শুনে বললেন—আসবেনই তো। না এসে উপায় আছে, কেষ্টবাবু তো ওঁর মেসো ছিলেন।

আবার একজন রাজনারায়ণের পার্ট বলতে গিয়ে ভুল উচ্চারণ করেছেন, তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—বক্তৃকতা নয়—বক্তৃতা। তুমি মধুর বাবা, হিব্রু-লাতিন জানো, পণ্ডিত লোক। অথচ বক্তৃতা উচ্চারণ করতে পার না। নীচেকার দাঁতের পাটীতে আঙুল দিয়ে চেপে ধর।

ইতিমধ্যে একজন একটু সুর করে কথা বলেছে, তাকে বললেন, সুর টেনে বলছ কেন? সুর টেনে বলে যাত্রায়, কারণ, সেখানে দৃশ্যপট নেই। কাজেই সুর করে না বললে আসত না। স্টেজে স্বাভাবিক সুরে বলা দরকার।

এবার বললেন—দেখার চোখ সকলের থাকে না। শার্লক হোমসের ছিল। আর কিছু কিছু লোকের ছিল। আর থাকে সাহিত্যিকদের।

নিজের পার্ট বলতে গিয়ে গৌরের জায়গায় গোকুল বললেন। ভুলটি ধরিয়ে দিতে বললেন—কথাটা স্টেজে বললেও ক্ষতি হয় না। মধু মাতাল অবস্থায় বলছে। তারপর স্বীকার করলেন—বয়েস হয়েছে, সব কিছু ভুলে যাচ্ছি। স্মৃতিশক্তিও কমে গেছে।

এর পর মধুসূদনের সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তির প্রসঙ্গে বললেন—সংস্কৃতে মজা হচ্ছে যে, কোথায় গিয়ে ক্রিয়াপদ পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই।

কথা প্রসঙ্গে অতীতের অভিনেতৃবৃন্দের কথা ওঠায় উনি বললেন—১৮৮৯ সালে তারাসুন্দরীর বয়স সাত বছর। তারা প্রথম চৈতন্যলীলা-য় ফ্ল্যাগ ওড়ায়। এগার বছর বয়সে প্রফুল্ল নাটকে প্রথম যাদব করে।

দানীবাবুর সম্বন্ধে বললেন—দানীবাবুর গলা! Wonderful গলা, ও রকম ভগবান যদি আমায় দিতেন! কিন্তু দিলেন না।

এর পর এলেন ২রা জানুয়ারি। প্রথমে সব লোকজন আসেনি, কাজেই রিহার্সাল না দিয়ে নানা রকম কথা হতে লাগল। কি খেতে ভাল লাগে না-লাগে সেই প্রসঙ্গে বললেন—বাঁধাকপি-ভাতে খেতে বেশ ভাল। তবে ঈষৎ কাঁচা থাকা চাই। ফুলকপি নেহাৎই অসভ্য। দাঁতে আর জোর নেই। চারটে দাঁত বাঁধান, তাতে নাকি বেশ শোভা হয়।

অন্য একটি কথা প্রসঙ্গে বললেন—চোদ্দরথীর কথায় আর একটি কথা মনে পড়ল। তখনও মনোমোহন থিয়েটারের possession ছাড়িনি, হঠাৎ বার্মিজ দামী লুঙ্গিপরা এক ভদ্রলোক হাজির। বললেন থিয়েটারের পোশাক করাচ্ছেন,

আমাকে দেখে দিতে হবে। হাতে কোন কাজ ছিল না, রাজি হয়ে গেলুম; ভদ্রলোক রিপন স্ট্রীটের একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তেতলার ঘর, তখনও সাজান হয়নি, সলমা-চুমকির কাজ করবার লোকেরা বসে। চারদিকে অনেক ভেলভেট পড়ে রয়েছে। তখন সবচেয়ে ভালো ভেলভেটের দাম গজ-প্রতি এক টাকা চোদ্দ আনার বেশি নয়। দাম জিজ্ঞেস করতে একশ, একশ একুশ এইরকম যা খুশি বলে গেল। আমাকে অবাক হতে দেখে বললেন—হ্যাঁ, এগুলো সবচেয়ে ভাল পোশাক, পাবলিক থিয়েটারের পক্ষে অত দাম দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। বললুম—সম্ভব তো নয়ই। কারণ সবচেয়ে ভালো ভেলভেট এক টাকা চোদ্দ আনা গজ অত দাম হবে কেন? দর আপনি জানেন না, তা টাকা আপনার যতই থাক। কথাটা তাঁর ভালো লাগল না।

এর পর কথায় কথায় স্বদেশী যুগের কথা উঠল। বললেন—রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন a Prince among men। ১৯০৫ সালের কথা, National University হবে, পাঁচ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। গোলদীঘিতে সতীশ মুখুজ্যে মশায় সুবোধ মল্লিকের টেলিগ্রাম পড়লেন—Another five is to follow.

গান শেখার কথায় বললেন—সন্ধ্যের মুখেই গান গেয়ে নেওয়া ভাল। যার লজ্জা নেই তার যদি শেখবার ইচ্ছে থাকে তো সে ভাল শিখতে পারে।

সংস্কৃতি সম্মেলনের কথা উঠলে বললেন—সংস্কৃতি সম্মেলন এখন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মত পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে। ও সব না করে একটা সংস্কৃতির পত্রিকা বের কর, কাজ হবে। এর পর বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকের নাম করে বললেন, ওকে বলেছিলুম বাঁধা মাইনে দিয়ে একজন ভাল ক্রিটিক রাখ।

মদ খাওয়ার কথায় বললেন—রাম মদ খেতেন, সীতা মদ খেতেন, কেষ্টঠাকুরও মদ খেতেন; আর 'রামরাজ্যে' এঁরা মদ খাওয়া বন্ধ করতে চাইছেন। গান্ধীজির sense of humour ছিল না।

এবার রিহার্সাল শুরু হল। উনি বললেন—লোকের কথা শুনে কথার ওপর কথা বলবে, promptingএর দিকে কান দেবার ততো দরকার নেই।

আবার ওঁর সঙ্গে দেখা হল ওঁর বাসায়—৩১শে জানুয়ারি। একজন কবি-নাট্যকারের নাটক পড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় শিশিরকুমার বললেন—একটা জিনিস হয়ত তুমি লক্ষ্য করেছ, আমি কখনো মেক-আপ করে আয়নায় মুখ দেখি না। ইদু মিয়াকে জিজ্ঞাসা করি—দেখ, সব ঠিক আছে কি না।

হয়! নিজের যা চেহারা আছে তার থেকে মেক-আপ করে, কি রঙ মেখে কী সুন্দর, লাগবে! আমার তো মনে হয় তা লাগবে না। অবশ্য অন্য সবাই থেকে থেকে মেক-আপ করা অবস্থায় আয়নার সামনে মুখটা একবার দেখে নেয়—কেমন হয়েছে নিজেকে দেখতে।

৮ই ফেব্রুয়ারি শিশিরকুমার এলেন গ্রন্থজগৎ-এ। তার ক'দিন আগে থেকে তিনি গিরিশবাবু না অর্ধেন্দুবাবুর শিষ্য, এই নিয়ে খবরের কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছে। তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বললেন—আমি গিরিশবাবুকে জীবনে তিন-চার বার মাত্র দেখেছি সামনাসামনি। কথাবার্তাও বলেছি। অর্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে কোন দিন দেখাই করিনি।

অভিনেতা হিসাবে অর্ধেন্দুবাবু গিরিশবাবুর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু গিরিশবাবুর ছিল realism, ছিল দর্শক-বিচারের ক্ষমতা। আরও একটি কথা, গিরিশবাবুই বাংলা মঞ্চকে লাইফ দিয়েছেন, মঞ্চকে বাঁচাবার জন্যে সবরকম compromise করেছেন।

প্রত্যেক বড় অভিনেতাই অভিনয়কালে gag ব্যবহার করেন, অবশ্য playকে disturb না করে। অর্ধেন্দুবাবু কিন্তু playকে disturb করতেন।

দক্ষযজ্ঞ-তে গিরিশবাবুকে প্রথম দেখি, কিন্তু তখন নাটক দেখার চোখ আমার কোথায়? তবে তাঁর সেই অদ্ভুত চোখ দু'টির কথা আজও মনে আছে।

অর্ধেন্দুবাবু কিন্তু ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত।

এর পর এক বছরের ওপর কোনো কিছু লেখা আপাততঃ পাওয়া যাচ্ছে না।]

১৯৫৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আবার এলেন গ্রন্থজগৎ-এ। সেই সময় পিয়ার্সনের লাইফ অফ ডিকেন্স পড়ছেন। এসেই বললেন—ওহে ডিকেন্স তো লোক সুবিধের ছিলেন না। তারপর নিজেই হেসে বললেন—স্ক্যাণ্ডাল পড়তে ভালই লাগে।

নাটক পড়ার কথা ওঠায় বললেন—এলিজাবেথীয় যুগের নাটকগুলো পেলে ভাল হয়। গ্রীক নাটকও পড়া দরকার। তারপর ইবসেন, ইভাসেন ঐসব সেনফেনের বই পড়ব।

এই সময় রিহার্সালের জন্য লোকজন এসে পড়ল। ক'দিন পরেই বেলেঘাটায় সংস্কৃতি সম্মেলনে আলমগীর হবে। রিহার্সাল শুরু হবার আগে

যে, নিকোলাই মান্নুচির Story of Mughal থেকে আলমগীরের অনেক কিছু নেওয়া। তারপর শুরু হল রিহার্সাল।

একজনকে পার্ট বলতে গিয়ে বললেন—থাম না কেন? Life of acting হচ্ছে pause। জীবনে যতটা থাম, স্টেজে থামবে তার চেয়ে বেশি। নইলে লোকে বুঝবে না। লোককে বোঝাবার জন্তে revive pause।

আবার পুরানো যুগের কথা উঠল। বললেন—দক্ষযজ্ঞ দেখেছি, ভ্রান্তি দেখেছি। আরো বললেন—কথা বলতে বলতে আমার মাথায় ছবিগুলো ভেসে ওঠে। শব্দে চিত্র হয়। অবশ্য সে চিত্র definite হয় না। এক এক রকম চীৎকারে এক এক রকম রঙও ফুটে ওঠে। খুব চীৎকার করলে লাল রঙের effect আসে।

তখনি গিরিশবাবুর কথায় বললেন—উনি তো রামায়ণ-মহাভারত উপরে দিয়েছেন।

আবার আগের কথায় ফিরলেন—কথা দিয়েও ছবি ফোটানো যায়। যাত্রাও তাই, ওয়ার্ড পেইন্টিং।

নিজেদের কথায় বললেন—আমরা যা কিছু করেছি, মনে মনে অর্থাৎ কল্পনায় যা ভেসে এসেছে তাই করেছি। প্রথম open sky ব্যবহার করি সীতা-তে। আলোতে shadow পড়াও বন্ধ করি। কেবল নাচের সময় shadow পড়ে।

ইংলণ্ডের অভিনেতাদের সম্বন্ধে বললেন—অলিভিয়ার ছাড়া সত্যি সত্যি নামকরা ভাল অভিনেতা কেউ নেই। ১৯২২ সালের পর ভাল অভিনেতা আর কেউ হয়নি।

দেশী অভিনেতাদের সম্বন্ধে—গিরিশবাবু, অমৃতবাবু আর দানীবাবুর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কত বড় অভিনেতা ছিলেন তাঁরা। অমৃতবাবুর বই সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একজনের বিরূপ মন্তব্যের উত্তরে বললেন—রঙ্গমঞ্চকে ঘৃণার চোখে দেখলে রঙ্গমঞ্চ আপনাকে দেবে কি?

তারপর বললেন—অমর দত্তের জীবনী তাঁর ভাইপো লিখেছেন, তার মূল্য আছে, যুগটাকে ভালো করে চেনা যায়। অমৃতবাবু খুব খারাপ নাট্যকার ছিলেন না। গিরিশবাবুকে তাঁর যুগ দিয়ে বুঝতে হবে। ওঁরা যদি যাত্রাকে উন্নত করবার চেষ্টা করতেন, ইংরেজি নাটকের মোহে চোখ ঝলসে না যেত তাহলে বাংলা নাটকের চেহারা অন্ত রকম হত।

সিরাজদ্দৌলা প্রসঙ্গে বললেন—গিরিশবাবুর সিরাজ হিরো নয়। রানী নিতান্ত ছেলেমানুষ।

পরের দিন আবার রিহার্সাল। বইটা তখনও শেষ হয়নি। এসেই বললেন —ডিকেন্স মানুষটা ভাল ছিলেন না। স্ত্রী সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তবু এদিক-ওদিক ছিল। ঐ যে কে একটি অভিনেত্রী, তার সঙ্গে খুব গভীর প্রণয় ছিল।

তারপরেই বললেন—রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধীয় অধুনা প্রকাশিত একটি বই সম্বন্ধে— আসল কথা কিছু নেই, তবে কন্টিনেণ্টাল নাট্যকার, ইবসেন থেকে শুরু করে আজকালকার আমেরিকান নাট্যকার, আমার আবার নাম মনে থাকে না, পর্যন্ত সবায়ের কোটেশন-কণ্টকিত, অনুবাদ অংশটাই ভালো হয়েছে। তবে ছোকরার ক্ষমতা আছে, অতগুলো বই তো পড়েছে!

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের কথা উঠল, বললেন—আমাদের সময় ইনস্টিটিউটের কি দিনই ছিল! আমি আর নরেশই ছিলাম best actor আর আমরাই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলুম।

আমাদের মধ্যে আর একজন ছিল, তার নাম ছিল জ্ঞানপ্রিয়। আমরা বলতাম গুরু। বড় মিষ্টি ব্যবহার ছিল। কখনও দলাদলি হতে দিত না। তার অপূর্ব কণ্ঠ ছিল। খুব যে একটা সাধা-গলা ছিল এমন নয়, তবে শুনতে ভাল লাগত। একবার সেক্সপীয়রের নাটকের আগে মঙ্গলাচরণ গেয়েছিল, তাই শুনে ও-দেশের এক ভদ্রলোক বললেন—ও ছেলেটি কে? এখানে পড়ে আছে কেন? ও-দেশে গেলে হপ্তায় একশ' কুড়ি ডলার পাবেই।

রবীন্দ্রনাথের তপতী-র কথা উঠতে বললেন—তপতী করে আমার কোন দুঃখ নেই। কবি অভিনয় দেখেন নি, তবে নাটক পাঠ শুনেছেন। সাজ-পোশাক কেমন হবে তা নিয়ে খুড়ো-ভাইপোয় ঝগড়া; কবি বললেন—এই তো ওঁদের জন্যে ঐ রকম পোশাক পরতে হলো। তাতে অবনবাবু বললেন—তুমি যা দেখ তাই পরবে বল ত কি করব, বল?

দৃশ্যপটের কথা জিজ্ঞেস করতে কবি অবনবাবুকে দেখিয়ে বললেন—এঁদের জন্যেই দৃশ্যপট বাদ দিয়েছি। এঁদের তো ধারণা অজন্তার পর পৃথিবী আর এগোয় নি। তোমরা নিশ্চয়ই দৃশ্যপট করবে, আমি এসে দেখব।

তা জহর এমনই দৃশ্যপট করেছিল যে, কি বলব। শেষ দৃশ্যের দৃশ্যপট এমনি এঁকেছিল যে শীত করত। আমায় এসে বললে—বড়বাবু, আখরোট গাছ তো দেখি নি, তাই আপেল গাছ এঁকেছি। অথচ দেখ, তার আঁকার হাত

কেউ দেয়নি এদেশে। তার সীতা-র ভাঙাচোরা দৃশ্যপট দেখেই আমেরিকানরা অবাক হয়েছিল, বিশ্বাসই করতে চায়নি যে কোন হিন্দুর আঁকা। বলেছিল—এ নিশ্চয় কোনো পশ্চিমী শিল্পীর আঁকা। কিন্তু তারা অত্যন্ত সহজ কথাটি ভুলে গিয়েছিল যে, তাদের দেশে যখন শুধু সমুদ্রের ঢেউ আর জঙ্গল, আমাদের দেশে তখনও ছবি আঁকা হচ্ছে।

তবে একটা কথা বলব, ওদের উৎসাহ আছে। সীতায় চল্লিশ ডলার নিয়ে অনেকগুলো মেয়ে নাচতে এসেছিল। রাধাচরণ আর—(নামটা বুঝতে পারা যায়নি) শেখাত। ন'টার সময় আসার কথা, ন'টা বাজতে পাঁচ পর্যন্ত কারো দেখা নেই, আর ন'টা বাজতে না বাজতে ঝপাঝপ বাথরুমে পোষাক খুলে ছোট পোষাক পরে নাচার জন্যে তৈরী। আবার বলত—নাচ শিখব কখন এঁদের এক-একজনের সিগারেট খেতে বিশ মিনিট, বাকি সময় দু'জনে ঝগড়া করবেন তো শেখাবেন কখন, আর আমরা শিখবই বা কী?

ধনগোপাল ভারতীয়, অথচ মেলাতে দেখা হতে বললে—আপনার খোঁজ পাইনি বলে দেখা করতে পারি নি। দেশে ফেরার পর অমৃতবাজারে লিখেছে দেখলুম—শিশিরবাবু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বা পরিচালক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছিল বলেই তাঁর নাটক সার্থক হয়নি।

ভারতীয়দের কাছে বিশেষ কোন সাহায্যই পাইনি আমরা। Crowd sceneএ যারা অভিনয় করেছিল, তাদেরও দু' ডলার করে দিতে হয়েছিল, অথচ চীনা অভিনেতা (মী ল্যান ফাঙ) যখন এসেছিল, তখন ওখানকার চীনারা কী সাহায্যই না করেছিল!

ওদের দেশে জাপানীদের তাড়ালেও চীনাদের অবস্থা ভালই। যে জিনিস কোথাও মেলে না, তাও China townএ পাওয়া যায়।

কলকাতার China townএরও সেই একই অবস্থা। Canton Hotel ১৯০৮ সালে প্রথম আবিষ্কার করে আমাদের শিবু বড়াল।

এবার আলমগীরের রিহার্সাল সুরু হ'ল। ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্বন্ধে বললেন—ক্ষীরোদবাবুর লেখার balance বড় ভাল, একটু ছোট হলেই কানে লাগে। তিনি লিখতে শিখেছিলেন।

তবে ওঁর একটু অসুবিধে ছিল, শরীরে কিছু ক্ষীণ ছিলেন তো, তাই বীরত্বের কল্পনা কিছু প্রখর ছিল। একজন লোকের ক্ষমতা পাঁচ লক্ষগুণ না বাড়ালে তাঁর আনন্দ হয় না। রত্নেশ্বরের মন্দিরে রত্নেশ্বর এক দলকে ঠ্যাঙাল, তার পর

ছ'জনকে ছ'বগলে, ছ'জনকে ছ'হাতে, আর একটাকে দাঁতে করে ধরে চলল!

তার পর রূপনগরের রাজসভায় শ্যামসিংহ যেখানে রামসিংহকে 'কছোয়া' বলে টিটকারী দিচ্ছে সেখানটা বোঝাতে বললেন—কছোয়ারা আসলে কচ্ছ থেকে এসেছিল, হয়ত রাজপুতই নয়। তবে রাজপুতরাও mixed জাতি; কালোও আছে, ফরসাও আছে। ওরা বোধ হয় শকদের (Scythian) বংশধর।

২৩ তারিখেও রিহার্সাল দিতে এলেন। প্রথমেই কে একজন বুঝি বলেছে, আমাদের গভর্নমেণ্টকে দেশের কেউ দেখতে পারেন না।

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলেন—কেউই যদি দেখতে পারে না ত গভর্নমেণ্ট জেতে কি করে?

আর একজন বললে—বোধ হয় রাস্তা করেছে বলে গ্রামাঞ্চলের লোকদের সুবিধে হয়েছে, তাই তারা সরকারকে জিতিয়েছে।

সায় দিলেন, তাই হবে, স্রেফ রাস্তা করেই জিতছে ওরা। তার পরেই প্রসঙ্গান্তরে গেলেন, Picturegoer বড় ভাল কাগজ ছিল, তবে আজকাল সে ফর্মাও নেই, সে জিনিসও নেই। আবার দুঃখ করে বললেন—আজকাল নিউ মার্কেটে সেক্সপীয়রের বড় বড় প্রডিউসারদের ২১।২২টা দৃশ্যের ছবিওয়ালা বই পাওয়াই যায় না।

বাংলার কোনো ভালো থিয়েটার-সম্বন্ধীয় পত্রিকা ছিল কি না প্রশ্ন করাতে বললেন—একটি পত্রিকা কিছুদিন বড় ভালো চলেছিল, নাট্যভারতী। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চালিয়েছিলেন। ওতে (হরপ্রসাদ) শাস্ত্রীমশায়ের লেখা ছিল, গিরিশবাবুর লেখার reprint ছিল।

দুঃখ করে বললেন—আমরা বেশি ইংরেজি শিখে বিপদে পড়েছি! গিরিশ-বাবুদের মাটির সঙ্গে যোগ ছিল; সমালোচনা-টমালোচনা পড়েন নি; সেকেলে এডিশনে সেক্সপীয়র পড়েছিলেন, কাজেই বুঝে পড়েছিলেন। ম্যাকবেথের অপূর্ব অনুবাদ করেছিলেন। তবে শিক্ষিতরা তাঁকে চেপে দিয়েছে। প্রমথ চৌধুরী মশায় প্রফুল্ল দেখে বললেন—এই সব 15th class বই নিয়ে শিশির কেন যে মাতামাতি করছে। রবিবাবুই তাঁকে চেপে দিলেন।

পুরানো কোন্ কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় দেখেছেন প্রশ্ন করায় বললেন—পুরানো দিনের মধ্যে তিনকড়ির অভিনয় দেখেছি জনা আর সুভদ্রার ভূমিকায়। আর ক্ষেত্রমণি—ইতিহাসে তার নাম নেই, কিন্তু অমন গয়লা

বৌ—অমন করে 'বুক জ্বলে যায়' বলা আর দেখি নি। বিনোদিনীর অভিনয় দেখি নি।

অপরেশবাবুর গলা বড় মিষ্টি ছিল—সুরও ছিল।

আমাদের দেশে convention বড্ড বেশি চলে। তারাসুন্দরীর গলায়ও সুর ছিল, তবে বয়স হতেই মিষ্টত্ব গেল। হাড় বেরিয়ে লাবণ্যও চলে গেল। আমি বলতুম—তারা মা, ও-সব ছাড়।

তা বলত—বাবা, আমি সেকেলেই থাকব, (মুস্তাফি) সাহেব যা শিখিয়েছেন তাই বলব।

আমি বলতুম—সাহেব তো শেখায়নি, শিখিয়েছেন গিরিশবাবু।

তারার সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছি। থিয়েটারের বাইরে তাকেই সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছি, মরবার সময়ও টাকা দিয়েছি। তবে মেয়েরা বলবে কিনা জানি না। তারা খুব বুদ্ধিমতী ছিল, বাংলা বই পড়েছিল, আর problem তুললে এমন সব কথা বলত যে অবাক করে দিত।

ইনস্টিটিউট প্রসঙ্গে বললেন—ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে আগে গোলমাল করলেই কলেজে রিপোর্ট পাঠান হত, নাম কাটানর জন্যে। আশুবাবুকে বললুম,—থিয়েটার, খেলাধুলো করতে আসে এখানে, তার জন্যে যদি কলেজ থেকে নাম কাটা যায়, ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ত আর কি মেম্বার পাওয়া যাবে?

উনি বললেন—তবে যে ওরা বললে এতে ভাল হবে?

যাদের বাঁচালুম তারা কিন্তু কোমর বেঁধে আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে লেগে গেল।

শেখানর কথায় বললেন—এখন আর আমার মনের জোর নেই, অথচ একদিন অনেককেই তো তৈরী করেছিলাম।

সীতা কত দিন রিহার্সাল দিয়েছেন প্রশ্ন করায় বললেন—মাসের পর মাস। মাঠে রিহার্সাল দিতে গিয়ে বই চুরি গেল। লোকে যোগেশবাবুকে দোষ দেয়, জানে না তো কত অসুবিধের মধ্যে বই লিখেছেন। পুরানো কাঠামোর মধ্যে রাখতে হয়েছিল, তবু যা লিখেছিলেন অপূর্ব! শাস্ত্রীমশায় বলেছিলেন—লবকে আনা খুবই সুন্দর হয়েছে!

হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে পড়লেন, বললেন—একটি জায়গা দাও, আর বছর তিনেক বোধ হয় বাঁচব, পুরানো সত্তর বছরের কথা ভুলে নতুন উদ্যমে কাজ করি।

আবার প্রসঙ্গান্তরে গেলেন—আমি, আজাদ আর জহরলাল একবয়সী জহর আমার চেয়ে এক মাস কুড়ি দিনের ছোট আর আজাদ ক'মাসের বড়। কাশ্মীরীরা হল কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতকের জাত। হরিশঙ্কর কাউল আর তার ভাই—দেওয়ান হয়ে নানা রাজ্যের খবর দিয়েছে। আর হরি সিংকে মেয়ো কলেজে কেউ দেখতে পারত না। সে ছাত্রদের কথা মাষ্টারদের বলত। কল্হনের রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদ দেখ, বুঝবে আমার কথা ঠিক কি না।

Prompting সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল, বললেন—মণিমোহন বড় ভালো prompter ছিল, অভিনেতা তৈরী করতে পারত। অথচ কি পেল? কী কষ্টে মরল, কী রকম বাড়ির কী রকম ঘরে! তার আত্মীয় তাকে দেখলে না, অথচ থিয়েটারে প্রথম নাববার সময় মণিমোহনের পেছনে পেছনে ঘুরেছে। —কথাগুলো বলেই কি রকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

উনি যখন চুপ করে বসে আছেন আমরা ক'জন একপাশে বসে তখন ফিসফাস করে কথা কইছিলাম, তারই একটি কথা কানে যেতে চমক ভাঙল ওঁর, প্রশ্ন করলেন—মিতা শ্রীকান্তে কমল করছে? তারপর নিজেই বলে চললেন—মেয়েটা অভিনয় তো ভালই করে, তবে বাপ স্বীকার করবে কি না জানিনে। ওর একটি মাত্র দোষ, অভিনয় হৃদয় থেকে করে না, মুখস্থ বলে। approachটা বড় মেকানিক্যাল। ত্যাখ, জীবনরঙ্গ-এ নিভার ভূমিকা করেছিল বন্দনা, বড় ভালো করেছিল। জীবন সম্বন্ধে, বিশেষ করে হৃদয় সম্বন্ধে জ্ঞান যে খুব বেশি। বাইরের মেয়েরা জীবন সম্বন্ধে জানে ভাল। কর্নেল ক্রফোর্ড বলতেন, লেখাপড়া না জেনে অভিনয় করে কি করে। তাতে বলেছিলুম, They have drank from the fountain of life and not through conduit pipe।

ওঁর পুরানো দলের কথায় বলেছিলেন—আমাদের টুর বড় ভালো হত। দলটা ভাল গড়ে উঠেছিল, মৃত্যু আর অন্যান্য কারণে ভেঙে গেল।

এর পর হল বিদেশি নাট্যকারদের সম্বন্ধে আলোচনা। উনি বললেন—বার্টল্ট ব্রেক্‌ট্ অনেক কিছু করছেন, মায় বিনা স্টেজে অভিনয় করান পর্যন্ত। আমাদের কিন্তু ওটা ট্রাডিশন—বিনা স্টেজে, বিনা সিনে অভিনয় আমরা চিরকালই করেছি। তারপরই দুঃখ করে বললেন—বাড়ি পেলুম না, experimentation করতে পেলুম কই! যাত্রাকে জাতে তুলে থিয়েটারকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু exit-entrance হবে কি করে? যাত্রায় আসরে বসে পড়ত, কিন্তু সকলের মাঝখানে বসে রাধা হুঁকো খাচ্ছে, চোখে লাগত।

হঠাৎ বিনয়দা'কেই জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গিতে বললেন—গ্রীক নাটকের রূপ কেমন ছিল? কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই বলে চললেন—যাত্রার প্যাঁচগুলো এক ধরনের আর লম্বা লম্বা হত। এই দুর্বলতার জন্যই অ্যাপীল করলো না। সীতা-তে গিরিশবাবু তো সীতা বিসর্জনের পর গান ধরলেন। যাত্রা ধরনের বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল পাণ্ডবগৌরব, harmonious বই।

গিরিশ-প্রসঙ্গেই বলে চললেন—গিরিশবাবু নাটক লিখবেন কখন ভাবেন নি, কিন্তু বঙ্কিম আর দীনবন্ধু দিয়ে চলল না, তাই লিখলেন. তবে গান ভালই বাঁধতেন।

আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরলেন—চারদিক খোলা হয়তো চলবে না। তবে তিন দিক খোলা রেখে কেমন হয় পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী। উঁচুটাকে নিশ্চয়ই নাবানো যায়, অতো উঁচু রাখার দরকার কি?

স্টেজের কথায় বললেন—একটিও নতুন বই হচ্ছে না। যা ষ্টেজ আছে তারও ত উন্নতি করা যায়। এই তো অডিটোরিয়ামকে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত করল, অথচ ভেতরে আর্চ দিয়ে স্টেজকে ছোট করে দিলে।

আমি যা কিছু innovation করেছি লোকে নিল না, আর অন্যদের চেঞ্জ সবাই নেয়। একবার রেল লাইনের ধারে একজনকে খুঁড় সাজাতে দেখেছিলুম, বলেছিল, শোভা করছি। এরাও শোভা করছে।

শ্রী-র ওপেনিং আর ডেপথ সবচেয়ে বেশি। দিগ্বিজয়ীর মত বই কী আর হবে?

কোন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকের কথা উঠতে বললেন—They are hardly educated.

তার পর নির্মল চন্দ্রের কথা বললেন—নির্মলের frustration—যাদের জন্যে এত করল, কংগ্রেসের জন্য এত করল অথচ তারা সবাই তাকে ঝেড়ে ফেলত। দেনার দায়ে মাথাপাগল। যাদের মানুষ করলে তারা ডাকলে আসবে কি না এ সন্দেহ ছিল তার। ওর মত অমন হৃদয়ের বিস্তার অল্পই দেখেছি। আগে খুব স্মার্ট ছিল, কিন্তু বড় ছেলে মারা যেতেই গেঁতোমি আর আলবোলা নিয়ে পড়ল। অত দিন কাউন্সিলে ছিল, ইকনমিক্স আর পলিটিক্যাল ইকনমিতে অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু কখনো বক্তৃতা দেয় নি। বিজয় ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিল. সে আবার থিয়েটার দেখতে পারত না, ভাবত আমিই নির্মলকে ডুবিয়েছি।

আমাদের দেশে কোন কিছু মন-প্রাণ দিয়ে করতে গেলে পেছনে লোক পাওয়া যায় না। গিরিশবাবু তাই ছেলেকে বলেছিলেন—প্রোপ্রাইটর হসনে। ছেলের কথা ভেবে সিরাজে বড় বড় বক্তৃতা ঢোকালেন। দানীবাবুর অনেক দোষ ছিল, কিন্তু কমেডি ভাল করতেন, বোধগম্য হলেই ভাল করতেন, তবে ভক্তদের তোষামোদে ডুবলেন।

রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রশ্ন করেছিলুম—বাংলা দেশের নাটক বাঙালীর মতো করতে গেলে কেমন ফর্ম হবে? তাতে বলেছিলেন, তোমরা দেবে, নয়ত এসেছ কেন? নিজে কিন্তু এলিজাবেথান স্টেজকে ফলো করলেন, তাঁর সাংকেতিক নাটক মেতারলিংক প্রভৃতির অনুসরণ করে।

বার্টল্ট ব্রেক্‌টের নাটক অপূর্ব—Exception and the rule কী সুন্দর! আজকাল তো আর মেয়েছেলে নিয়ে আড্ডা নেই, তাই এখন চাই একটা বাড়ি আর কিছু এনডাওমেণ্টস—যাতে সবাই কিছু পায়।

সিনেমা ভাল কি থিয়েটার ভাল, জানতে চাওয়ায় বললেন—গত পঞ্চাশ বছরে সিনেমায় ক'টা ভালো বই হয়েছে। বছরে লাখ-লাখ নায়ক-নায়িকা হচ্ছে অথচ তিনকড়ি আর তারাকে সকলে মনে রাখবে। প্রভার মত অভিনেত্রী আর হয়নি।

দানীবাবুর সঙ্গে প্রফুল্ল যত বার করেছি understanding ছিল যে উনি যখন অভিনয় করবেন আমি কিছু করব না, কারণ নরেশ একবার ভুঁড়িতে হাত বুলিয়েছিল। (নরেশ কাত্যায়ন হলেই চাণক্যকে মারবার তাল করে।) দানীবাবুর গলা ছিল অপূর্ব। উদারা-মুদারা-তারা—তিন গ্রামেই গলা চলত: তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিল প্রখর আর তার জোরেই চলত। বিলেত হলে বিপদে পড়তেন, তবে গলার জন্যে হয়ত ও-দেশেও দাম পেতেন।

কথার জের টেনে চললেন—গিরিশবাবু আর অমৃত বোসের দু'দল না হলে হয়তো ভালো হত। ভুবন নিয়োগী, অর্ধেন্দুবাবু, অমৃতলাল তো ছিলেনই, কিন্তু সবার ওপরে ছিলেন গিরিশবাবু। গিরিশবাবু ছাড়া থিয়েটার তো কেউ রাখতে পারলেন না। ষোল হাজার টাকা দিলেন (আজকালকার এক লাখ ষাট হাজার টাকার মতো) অথচ পার্টনার না করে তাড়িয়ে দিলে। থিয়েটার থেকে পেতেন কি? মাসে একশ' টাকা মাইনে আর দৈনিক চার পয়সার তামাক—ছিলেন Dramatic director। রোজ রোজ সেই ষোল হাজার টাকা দেবার কথা বলতেন, তাই তাড়িয়ে দিলে।

থিয়েটারে দলাদলি চিরকাল। ক্ষেত্রমণিকে ভাল পার্ট না দিয়ে starve করিয়ে করিয়ে নষ্ট করে দিলে। দলাদলিতে থাকতেন না অর্ধেন্দুবাবু। খুব ভাল লোক ছিলেন তিনি। সব দলেই মিশতেন। খুব দরাজ দিলও ছিল ওঁর। অমন লোক আর হবে না।

তাঁর থিয়েটারের পুরানো খাতাপত্র কিছু আছে কিনা জানতে চাওয়ায় একটু যেন বিরক্ত হলেন, বললেন—খাতাও কী আমি রাখব? বিশ্বেশ্বর যতদিন ছিল ততদিন করেছে। অশিক্ষিত লোক, যতটুকু পেরেছে ততটুকু করেছে। সে মারা যেতে হীরালালবাবুকে বললুম, আপনি খাতা রাখুন। তাতে বললেন—ওই নিয়ে অমর দত্তর সঙ্গে ঘুঁষোঘুষি হয়েছিল। বললুম, আমার সঙ্গে হবে না। তবু বললেন—ও ভার আর আমার ওপর চাপাবেন না।

পরের দিন ২৪শে ফেব্রুয়ারি আবার এলেন। তখনও ডিকেন্সের কথাই ঘুরছে মাথায়। ঢুকতে ঢুকতে বললেন—ডিকেন্স বড় ভাল লোক ছিলেন হে! তবে পরিচিত আত্মীয়দের সবাইকেই লেখায় ঢুকিয়েছেন। আর কি অপূর্ব গলা! খুব ভালো অভিনয় করতে পারতেন, নিজের লেখা পড়ে প্রচুর পয়সা পেয়েছেন, বিশেষ করে আমেরিকায়। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের গলাও ওই রকম ছিল, উনিও ইচ্ছে করলে ওই ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।

ডিকেন্সের স্বভাবচরিত্র খুব ভাল ছিল না। লিটল্ অ্যানের সঙ্গে খুব ভাব ছিল, বইও পড়তেন খুব। লিটল অ্যানের মৃত্যুর পর বই-ই হয়েছিল একমাত্র সঙ্গী, পড়তে পড়তেই চোখ গেল।

হেস্কেথ পিয়ার্সনের লেখা জীবনীটা বেশ বেশী ভালই লাগছে। ওতে বহু literary allusion আছে। ফিসাবের ইতিহাসেও আছে আব '—' কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে সেক্সপীয়ার কোট করে বেকুব বনে গেলুম। হ্যামলেট পড়েনি তা স্বীকার করতে রাজি নয়, অথচ যা বোঝালুম তা বুঝল বলে মনে হয় না।

কোন এক অভিনেতা সম্বন্ধে বললেন—ওর যা দাম তা কী পেল? বড্ড লাফায় যে! শৈলেনেরও ওই দোষ ছিল, দু'পয়সা পেলেই ছুটত। অথচ একটু ভেবেচিন্তে অভিনয় করলে ওই তোমাদের কি কুমার—তার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করতে পারত। অথচ মরবার সময় কী আর রেখে যেতে পেরেছে? ওর একটা কিন্তু মস্ত বড় ক্ষমতা ছিল—সমস্ত চরিত্রের সংলাপ মুখস্থ থাকত! ও ক্ষমতা রবিরও ছিল; আর একটা

মজার ব্যাপার ছিল সকলের আগে এসে মেক-আপ নিতে বসত অথচ কখনো মেক-আপ নিয়ে খুশি হত না।

এর পর রিহার্সাল শুরু হল। বললেন—আগের দিন মোটেই রিহার্সাল হয়নি, আজ আর কোনো কথা বলব না।

২৫শে ফেব্রুয়ারি বোধ হয় রবিবার ছিল, সেদিনটা বাদ দিয়ে ছাব্বিশে এলেন। ডিকেন্সের জীবনী পড়ার রেশ তখনও কাটেনি, তাই সেদিনও ঢুকেই প্রথম বললেন—ডিকেন্স মস্ত বড় অভিনেতা ছিলেন, ছিয়াত্তর রাত্রিতে বিশ হাজার টাকা রোজগার করেছেন।

এই সময় সম্ভবতঃ বিনয়দা'র সঙ্গেই কথা উঠল, নাটকে কথার দাম কি? উনি বললেন—নাটকে কথা দরকার বই কি। আলো নিবে পর্দা উঠল, সবাইয়ের মনে যখন ঔৎসুক্য তখন প্রথম কথাটার দাম কতখানি বল তো? প্রথমে ঢুকে বাজে কথা বললে কী ভালো হত? তবে আমাদের দেশে নাটকে কথা একটু বেশি। বার্ণার্ড শ'র লেখাতেও এই দোষ আছে। আসলে তিনি ভাল নাট্যকার নন, his characters are so many pegs to hang his ideas on! তবে গল্পটা সব সময়ই বলেছেন। যে যে বইতে গল্প সব চেয়ে ভালোভাবে বলেছেন সেই সেই বই-ই মানুষ ভালোভাবে নিয়েছে।

নির্বাক ছবিতে কথা না বললেও তো গল্প বলতে পারা যায়। যেখানে সেইভাবে বলেছে সেখানে sub-title ছাড়াও বুঝতে অসুবিধে হয় না।

এই সময় পার্সিভাল সায়েবের কথা উঠল, বয়স্কদের মধ্যে কারা তাঁর কাছে পড়েছেন, তিনি কেমন পড়াতেন ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে বললেন—পার্সিভাল সায়েবের কাছে তো আমরাও পড়েছি, তাঁর কাছে পড়েছে এমন বহু লোক আজও আছে। তাঁর লেখা বইপত্তর সমস্ত প্রফুল্লবাবু নিয়েছিলেন, ওঁর জ্বালায় পার্সিভাল সায়েবের ওপর রাগ ধরে যেত আমাদের।

প্রফুল্লবাবু খেটেখুটে পড়া তৈরী করে নিয়ে আসতেন, তবে প্রথম দিকে খুব ভাল রিসেপসন পাননি বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন, পার্সিভাল সায়েব আবার ওঁকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন, খেটে পড়াতেন তিনি, কিন্তু তা তো আর ভালো পড়ান নয়। পড়াতেন ভাল এম. ঘোষ। তাঁর পড়ান শুনলে জ্ঞানরাজ্যের দ্বার খুলে যেত, পড়ান যে ভাল জিনিস তা বোঝা যেত।

এবার রিহার্সাল শুরু করলেন। উদিপুরীর তাঁবু থেকে রূপকুমারীকে মেবার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্যে কামবক্স যখন রাম সিংয়ের সঙ্গে যে কথা আছে—ভয় মেবারীর অস্ত্রে নয়, ভয় দৃষ্টিতে। আগের দিন সেটা রামসিংয়ের ভূমিকাভিনেতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে বুঝতে পারেনি। প্রথমেই সেই কথা বললেন—কথাটা ও না বুঝেই বলছে। কথাটার ভেতরের অর্থ হল Traitor has now turned upon himself। একটা মেয়ের জন্যে সমস্ত দেশ আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত, অথচ এত বড় গৌরবের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবার কোনো অধিকারই নেই তার। সেই দুঃখের আভাসই তো কথায়। লোকটার মাথায় কিন্তু তা ঢোকে না।

নাটকে গান থাকা ঠিক কিনা জানতে চাওয়ায় বললেন—বাংলা নাটকে গান থাকা দরকার, এ বিষয়ে আমি রবিবাবুর সঙ্গে একমত। গান যদি নাটকের moodকে অনুসরণ করে, তবে আপত্তি কিসের? তা ছাড়া আলমগীরে বাণীবাবু অপূর্ব সুর দিয়েছিলেন। 'অতিথি এসেছে দ্বারে'তে প্রথম দরবারী কানাড়া লাগিয়েছিলেন, বললুম, ভালো লাগল না। শুনে তো চটেই আগুন! শেষ পর্যন্ত বোঝাতে বললেন—কি রস? বললুম, বি-রস!

আবার রিহার্সাল শুরু করলেন, তবে হঠাৎই থেমে গিয়ে বললেন—একটা নতুন বই কর। এই বই রিহার্সাল দিতে কুইনাইন গেলার মতো লাগছে।

রিহার্সাল বন্ধ করে ডিকেন্সের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন আবার, বললেন—হেস্কেথ পিয়ার্সন ডিকেন্সের জীবনের স্ক্যাণ্ডাল বাদ দিয়ে indomitable spiritটাই দেখিয়েছেন। ডিকেন্স কাগজ চালিয়েছেন, সিরিয়াল লিখেছেন, আবার নাটকও প্রোডিউস করেছেন। ম্যাকরেডি খুব বন্ধু ছিলেন, ডিকেন্সের গল্প শুনে পিলে চমকে গিয়েছিল তাঁর, বলেছিলেন—আমার কাজ যাবে।

কাব্যনাট্য সম্বন্ধে কথা হল, বললেন—নাটক কবিতায় না নিয়ে গেলে কিছু হবে না অথচ মজা দেখ, কবিতা কেউ পড়তেই পারে না। স্কুলে যারা পড়ে, তারা মাইনে বেশি দেয় অথচ নোট ছাড়া চলে না। বাড়িতে অভিধান কিনিয়ে বিপদে পড়েছি। ছেলেরা দেখে না, আমার কাছেই পড়ে থাকে।

নোট আমিও লিখেছি ফোর্থ ইয়ারে পড়তে পড়তে। জিতেনের দোকানের ধার শোধ দিতে চার-পাঁচজন মিলে ফর্মা-পেছু দশ-পনের টাকা নিয়ে লিখে দিয়েছি।

আমাদের দেশে পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটের ওপর ডিগ্রী দেওয়া উচিত।

আগেকার দিনের মাষ্টার মশায়রা ভালো ছেলেদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়াতেন। আজকাল তাঁদের প্রাইভেট টিউটরি করেই দিন কাটছে; ভালো ছেলেদের পড়াবেন কখন?

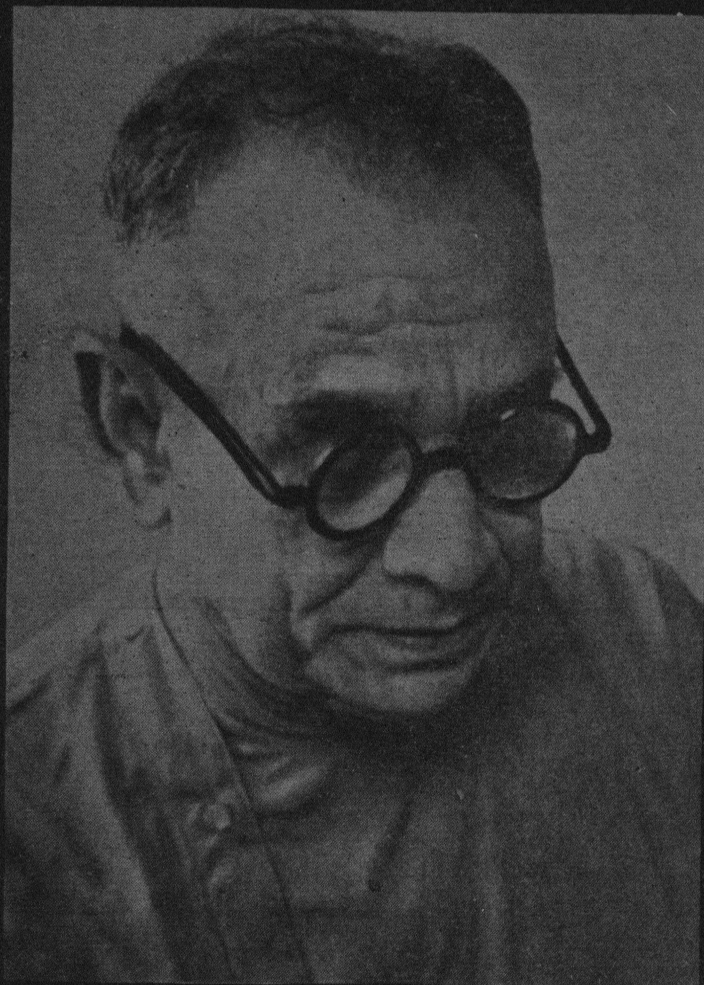
২৭ তারিখেও এলেন। সেদিন গোড়াতেই রিহার্সাল শুরু হল। দয়াল শা'র সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বলবে, বোঝাতে গিয়ে বললেন—দয়াল শা'কে একটু খাতির দেখান দরকার। আজকালকার মন্ত্রীদের যেমন খাতির করা হয়, পাতিয়ালা ইত্যাদি রাজাদের কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি মন্ত্রীদের খাতির করতে হত। রাজদরবারের অবস্থা মুঘল দরবারের মতই ছিল, সবাই খুব মাথা নোয়াত। দেওয়ানের ক্ষমতা কত ছিল, ইচ্ছে করলেই রাজাকে রাজ্যচ্যুত করতে পারত। অথচ সামনে কি বিনীত, কথায় কথায় গরীব পরোয়ার, অন্নদাতা বলেই চলেছে।

দোল এসে পড়েছে, সেদিন আবার দুপুর পর্যন্ত ট্রাম-বাস বন্ধ, তাই নিয়ে কথা ওঠায় বললেন—দোলের একটা barbarous ভাব আছে, বড়বাজারের দোল খেলা বন্ধ করা উচিত। গান যা গায়, সে ছোটদের শোনবার অযোগ্য; মনে একটা খারাপ ইম্প্রেশন হয়। কনস্টেবলরা কিন্তু খুব ভদ্রভাবে দোল পালন করে। দোলে আবীর আর লাল রঙ দেওয়াতেও খারাপ কিছু নেই। তবে আলকাতরা, বাঁদুরে রঙ, ছাপ—এগুলো বিকৃত রুচির পরিচায়ক।

থিয়েটারের সাজ-পোশাক প্রসঙ্গে বললেন—পোশাক ঠিক রুচিমাফিক হয় না! লোকে পোশাকের দোকান করে না কেন? তাতে তো লাভ হয়। থিয়েটারে এমনিতে সবাইকেই এক রকম সাজিয়ে দেয়। আমরা স্টারে খুব চেষ্টা করে উন্নতি করেছিলুম, রাখালবাবু (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) নিজে এসে সবাইকার আলাদা আলাদা রকম পাগড়ী বেঁধে দিতেন, অবনবাবুও হরদম আসতেন। তখনকার দিনে পণ্ডিতরা সংস্কৃতিবানরা প্রায়ই থিয়েটারে আসতেন।

ইংরেজের সার্টিফিকেট ছাড়া আমাদের এখনও চলে না, আমি দর্শন-টর্শন বুঝি না, থিয়েটার বুঝি। আমাদের দেশে যাত্রা ছিল, এখনও আছে। আর আমাদের ভরত মুনির সময়কার নাটক আর ইংরেজদের নাটকে অনেক মিল ছিল।

নাটককে যাত্রা-আইজড করতে হবে, তার জন্যে দরকার লেখক। যোগেশবাবু থাকলে পারা যেত। তবে এখনও লেখক পাওয়া যেতে পারে। আসলে চাই কিছু আগ্রহশীল যুবক-যুবতী, বসবার জায়গা, সতরঞ্চি, তামাক খাবার জায়গা আর কিছু অর্থ। বাজে কথা বলতে বলতেও বই রিহার্সাল হয়।



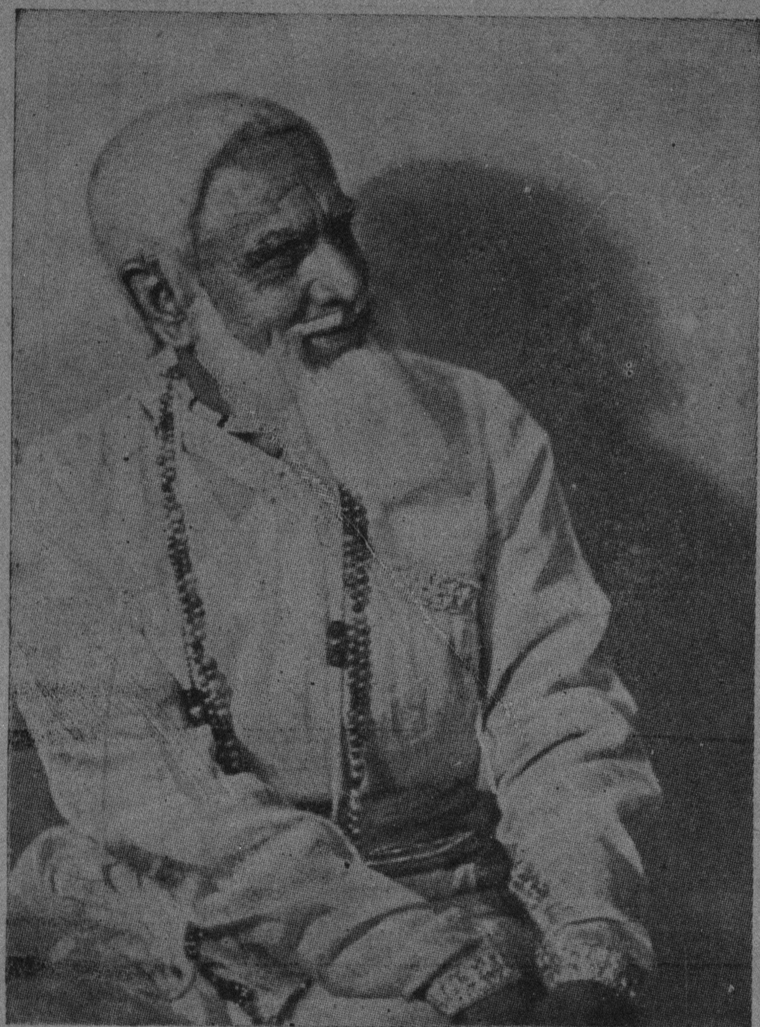
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার



জীবানন্দ · শিশিরকুমার
ষোড়শী : রেবা দেবী



নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, বিনয় বসু, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায়, সিতেন চৌধুরী, নিবেদিতা দাস, দেবকুমার বসু প্রভৃতি



আলমগীর . শিশিরকুমার

আমেরিকান vice দেশে খুবই আসছে, আমেরিকান ছবি বোধ হয় আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি আসে।

Sacrilege করতে আমরা ভয় পাই না। আমাদের দেশে যাত্রায় দর্শন, aesthetics ইত্যাদি সম্বন্ধে এমনভাবে আলোচনা করা হত যে সাধারণ লোক বুঝতে পারত এবং কিছু খারাপ convention ছাড়া এর ফল ভালই হয়েছিল।

আমার মনে হয়, একজন মহাপুরুষ আসা দরকার, যিনি আমাদের মনের অন্ধকার তাড়িয়ে দিতে পারবেন।

এর আগে নাটক নিয়ে experimentation করেন নি কেন জানতে চাওয়ায় বললেন—experimentation করার জন্যে martyr to the cause হবার রাস্তা পেলুম কোথায়, বাপের অর্থ না থাকলে কিছু করার উপায় নেই। I am not man enough to do it (*i.e.* to change the trend), তবে থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

নাটক আজকাল প্রগতিশীল হচ্ছে মন্তব্য করায় বললেন—আজকালকার দিনের নাটকে পথ দেখাবার মত কিছু আছে কি? প্রগতিশীল তো বলছ, কিন্তু কোন্ দিকে প্রগতিশীল? অর্থ না বুঝেই কথা বল কেন? রেডিও অভিনয়ধারা এমন কি পাঠ করার পর্যন্ত খুব ক্ষতি করছে, পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে, তাই গড়গড় করে বলাটা অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

গান বুঝতে হলে সুরজ্ঞান থাকার কি দরকার জানতে চাওয়ায় বললেন—আমার নিজের মনে হয় সুরজ্ঞান না থাকলেও বেসুরো গান শুনতে কানে লাগে। আমারও ঐ জ্ঞান নেই, অথচ বেসুরো গান শুনে চঞ্চল হই এ কথা অন্য লোকে বলেছে।

ছবি কে কেমন আঁকে, কার ছবি ভাল দেখায়, কেন, এই নিয়ে কথা শুরু হল, তখন বললেন—ছবি সম্বন্ধে কেউ কোনো উৎসাহ দেয় নি আমাদের। অথচ ইউরোপ বা আমেরিকার ছোট ছোট সহরেও আর্ট গ্যালারী থাকে। ছোটরা তা দেখতে যায়, ছবি আঁকতে শেখে, পারিপার্শ্বিকের গুণে ছবি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়। আর আমরা এসব বিষয়ে বিশেষরূপে অজ্ঞ।

আমার মনে হয়, জাত হিসেবে আমরা ছোট, তবে আশা করি ভগবান আমাদের দুরবস্থা ঘোচাবেন।

আটাশে ফেব্রুয়ারি আর পয়লা মার্চ দু'দিনই এলেন। প্রথম দিন স্টেজে

কী পরিবর্তন করা দরকার এই নিয়ে কথা উঠল, বললেন—আমার মনে হয় বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রোসেনিয়াম পাল্টান উচিত। এসব কথা তোমাদেরই তো ভেবে দেখা দরকার, তবে আর কিছু করার আগে কাজ শুরু করা দরকার। তিন-চার হাজার টাকা হলেই তো শুরু করা যায়। তারপর বললেন—দেশের লোকের রুচি কি রকম খারাপ হয়ে যাচ্ছে তা বলবার নয়। আর্টের অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় না আজকাল, হয় ফ্যাশন! পনের নম্বর পার্ক ষ্ট্রীটে দল বেঁধে সবাই ভিড় করে যাচ্ছে, কিন্তু বোঝে ক'জন? তাছাড়া বোঝাবার লোকও তো নেই, লোকে বুঝবে কী করে?

আমার দুঃখ হয় বেঁচে আছি অথচ শক্তি নেই, গ্রুপ ফিলিং অর্থাৎ সবাই মিলে গড়ে তুলব, এই ইচ্ছেটা তো দরকার! দেশে কোন্ Organisation-টা কাজের? কাজের Organisation অত্যন্ত rare। আসলে willing young men দরকার।

একজন প্রশ্ন করল, গান শেখেন নি কেন, উনি উত্তরে বললেন—গান শিখলে বোধ হয় ভালই হত। সুখের হত ভবিষ্যৎ। তবে গাইয়েদের জীবনও খুব একটা সুখের কিছু নয়। অনেক বড় গাইয়ের কথা জানি যাদের জীবন বড় দুঃখের। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম দু'-চারজন বাঈজী। তাদের ভাবটা don't care, লোকের সঙ্গে যা'তা ব্যবহার করে অথচ সবাই হাতজোড় করে বসে থাকে।

আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল কলকাতার সংস্কৃতি-সম্মেলনের বিষয়ে। একজন বলল, যে হারে কলকাতায় বেড়ে চলেছে সম্মেলন। একমাত্র শুধু বেলেঘাটাতেই দেখুন না, কতগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে! এতে যে সংস্কৃতি যাবে! শুনে হাসলেন, সংস্কৃতি যাবে কেন? বেলেঘাটা তো ভাল জায়গা, আমি প্রথম ওদিকে যাই উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালে। সেই সময়েই নস্করবাবুদের সঙ্গে পরিচয় হয়। হেমবাবু মানুষ বেশ ভাল, neutral লোক। ওঁকে পলিটিক্সে আনেন দাশ মশায়। তিনি যে সি. আর. দাশ আর অন্য পক্ষ যা তা একথা কখনও ভাবেন নি। তাঁর বুকটা যেমন দরাজ ছিল, মনটাও ছিল তেমনি; তবে মানুষ-টানুষ বিশেষ চিনতেন না। সুভাষবাবু কিন্তু মানুষ চিনতেন ভালো, যার যা দাম তাকে তাই দিতেন। তবে একটা ভুল ওঁরা করেছিলেন, (অবশ্য বিপ্লবীদের কেউ কেউ বলতে পারেন, তুমি শিশির ভাদুড়ি দেশের জন্যে কি করেছে যে, স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা জীবন-পণ করেছেন তাঁদের

কাজের ভুল ধর!) কর্পোরেশনে ঢুকে তাঁরা যেভাবে কন্‌ট্রাক্টরদের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছেন তাতে ভবিষ্যতে তাঁদের শিষ্যরা যে অপব্যবহার করবে এই কথাটাই ভেবে দেখেন নি।

বিপ্লবীদের টাকা উঠেছিল ডাকাতি করে। ঢাকার লোক খুলনায়, খুলনার লোক ঢাকায় ডাকাতি করত। তার পর সেই টাকা দিয়ে দল করত। তবে তার ফলে কতো নিরীহ লোক যে কষ্ট পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিপ্লবীদের মত ছিল end justifies means। সেই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে কতো ভালো ছেলেও immoral কাজ করেছে।

আকাদেমী প্রসঙ্গে বললেন—সরকার একটি স্কুল খুললেন, কিন্তু কী হয় সেখানে? বিলেতে একাডেমি আছে, বার্ণাড শ'র সব টাকা পাচ্ছে। খুব কাজ করছে। একজন ডিরেক্টর আছে, বছরে আড়াই হাজার পাউণ্ড মাইনে পায়। কেনেথ ক্লার্ক বুড়ো হয়েছেন বলে রিটায়ার করেছেন। অন্য একজন আছেন, লিভারপুল ম্যাঞ্চেষ্টারে অনেক কাল অভিনয় করিয়েছেন।

আমাদের দেশে নাটক পড়তেই বা পারে কে? গিরিশবাবুর শতবার্ষিকী হল, অথচ ক'জন তাঁর ক'টা বই পড়েছে আর পড়ে মানে বুঝেছে? তাঁর নাটক তো খুব খারাপ কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের মোটে দু'খানি সফল নাটক আছে। তপতী আমাদের আগে কেউ বোঝাবারই চেষ্টা করেনি কারণ রবীন্দ্রনাথ বইটা পড়তেই পারেন নি। রাজা-রাণীতে যে সংঘাতের ইংগিত ছিল তপতীতে তাই পূর্ণতা পেয়েছে।

(সরকার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে দু'বছরে ষোল লক্ষ টাকা খরচ হল অথচ হল না কিছু। জনসংযোগ বিভাগেও তো কত খরচ হচ্ছে, সবায়েরই কিছু না কিছু হচ্ছে আর আমি মোটে দু'লাখ টাকা পেলে একটা কিছু করতে পারতুম।

পরের দিন যখন এলেন দেখলাম বেশ ক্ষুব্ধ, কিছুদিন আগে কোথায় পুরানো কি একটা বই অভিনয় করেছিলেন, লোক তার দুর্নাম করেছে। তক্তাপোষে বসে বললেন—বুড়ো বয়সে জাত খোয়ালুম। ও সব পুরানো বই কোন মতেই করা উচিত হয়নি। পরিচিত একজন তো বললে, ও সমস্ত পুরানো বই ছাড়ুন, দেখেছেন তো পুতুল খেলা করে বহুরূপী কত নাম করেছে। আপনি তো আবার কাগজ দেখেন না।—তা দেখ, নাম তো কতলোকেই করলে, আবার কত লোকেই গেল, ছত্রিশ বছরে অনেক তো দেখলুম! পাথর ওপরে উঠলেও শেষ পর্যন্ত মাটিতে নেবে আসে।

অভিনেতাদের মধ্যে কার গলা ভালো, এই প্রসঙ্গে বললেন—গলা আমার খুব খারাপ নয়; আজকালকার দিনে আমার মত গলাও তো দেখি না কারোরই। কিন্তু দানীবাবু, অমৃত মিত্র কি গিরিশচন্দ্রের মত গলা আমারও নয়।

আবার বললেন—অনেকে বলেন, চিরকুমার সভা একটি ভয়ানক নাটক; কেন যে অভিনয় হচ্ছে না! চিরকুমার সভা যদি নাটক হয়, তবে আমরা এতদিন বৃথাই নাটক করেছি।

Prostitution প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের দেশে prostitution আছে বলে আমরা ছোট জাত। লণ্ডনে দেখিনি, তবে শুনেছি, সন্ধ্যের পর Picadillyতে বাপ-ছেলে একসঙ্গে পথ চলতে পারে না। নিউইয়র্কে মেয়েরা কেমন করে পুরুষদের pester করতে পারে তার প্রমাণ পেয়েছি। ওদের দেশের মেয়েরা কিছু নির্লজ্জ। দু'-চার হপ্তায় পোস্ট আপিসে কাজ করে, কি নতুন রুমানিয়ান বা ঐ ধরনের মেয়ের সঙ্গে খাইয়ে-দাইয়ে ভাব করা যায়।

আমাদের দেশের বেশ্যাদের মধ্যেও একটা শ্রী আছে। সারা রাত হুল্লোড় করে সকালবেলা গঙ্গাস্নান সেরে ঠাকুরপ্রণাম করবার সময় চোখ দিয়ে জল পড়ছে দেখা যায়। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও ঠিক ওই ভাবটি দেখা যায়।

আমাদের দেশে moral যে ভাঙছে poverty is the cause, কিন্তু only cause নয়। মেয়েরা যদি নিজেরা রোজগার করে তো এ অবস্থার বদল হয়।

বিদেশী নাট্যকার ও নাটুকে দলের প্রসঙ্গে বললেন—ব্রিয়ো লেখে ভাল, কিন্তু বড় বস্তুতান্ত্রিক। বিদেশী দলের ভাল হচ্ছে drilling। নিউইয়র্কে ভাল লেগেছে নিগ্রো বই—Green Pastures। নাটক দাঁড় করাতে হলে দরকার প্রাণ। নিগ্রোদেরই প্রাণ আছে। আর কি গান! অমন গানের গলা এদেশে নেই।

ও'নীলের Desire under the Elms-এ আছে—যীশু এস, নয়তো দেশটা গেল। ওদের মেয়েদের আঠারো বছর বয়স পার হলেই কাউকে যদি খুব ভালবাসে তো বলে, Come on, my honey, I will manage.

বিয়ে আর সার্বজনীন উৎসবে আমাদের যে রকম waste হয়, তা দেখে মনে হয় এ জাতের কিছু হবে না।

আবার (পুতুল খেলার কথায়) বললেন—নোরা আমাকেও করতে বলেছিল, তার উত্তরে আমি বলি, ইবসেন আঠারো শ' আঠষট্টি সালের, এখন নোরা পুরান হয়ে গেছে, তার চেয়ে অনেক শক্তিমতী নারী এখন রণক্ষেত্রে এসেছে।

ইবসেনের নাটক dated হয়ে গেছে। সেক্সপীয়রের সঙ্গে তার তফাৎও সেখানেই। সমাজ একটু বদলালেই problem ও বদলে যায়।

॥ ৪ ॥

কুড়ি-পঁচিশদিন পরে আবার আসবেন বলে গেলেন। মাঝে কথা ছিল 'চন্দ্রগুপ্ত'-তে চাণক্য করতে যাবেন বর্ধমানে। বর্ধমান যাবার পথে হাওড়া স্টেশনে পড়ে গিয়ে ডান হাতটি ভাঙলেন এবং তার ফলে দু'তিন মাস তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হল। এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও কথা হয়নি কিছুই।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যেয় আমরা কয়েকজন বসে গল্পগুজব করছিলাম এমন সময় বিনয়দা' এসে হাজির। বিনয়দা'র আসাটা অত্যন্ত আকস্মিক বলে রীতিমত অবাক হলাম। প্রশ্ন করতে হল না, উনি নিজেই বললেন—ভাদুড়ি মশায় আজ ডেকেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে একটি দল খোলা, যেখানে পুরানো নাটক পড়া, আলোচনা করা নাটকের বিষয়ে, নতুন আর পুরানো নাটক রিহার্সাল দেওয়া, অভিনয় করার ব্যবস্থা থাকবে। তা তোমরা যদি দায়িত্ব নাও তো এ কাজ করা সম্ভব।

চোর চায় ভাঙা বেড়া! এমনিতেই থিয়েটারের সুযোগ পেলে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে একপায়ে খাড়া, আর স্বয়ং শিশিরকুমারের নেতৃত্বাধীনে অভিনয় শেখার আর অভিনয় করবার সুযোগ পাব, নতুন বই হবে, এ তো অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য। চটপট রাজি হয়ে গেলাম। আমাদের দু'জনকে যুগ্ম সম্পাদক করা হল। সভাপতি হলেন অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সহ-সভাপতি হলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও কুমারেশ ঘোষ। ভোলাদা' দলের নামকরণ করলেন—নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ। স্থির হল আপাতত প্রতি বৃহস্পতিবার নাটক পাঠ হবে, পরে সুযোগ-সুবিধে মত পুরানো বা নতুন নাটক (যখন যেমন পাওয়া যাবে) রিহার্সাল দিয়ে অভিনয় করা হবে।

সেই অনুযায়ী ২৪শে জুলাই তিনি প্রথমে এলেন ও তারপর থেকে মাঝে এক-আধ হপ্তা বাদ দিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবারে এলেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন, নাটক পড়লেন। নভেম্বরের শেষে যখন ডিসেম্বরে নাট্যোৎসব করার কথা স্থির হল তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এসেছেন।

দৈনিক ওঁর বাসা থেকে ওঁকে নিয়ে এসেছি এবং পৌঁছে দিয়ে এসেছি আমরা, আসা-যাওয়ার পথেও অনেক কথা হয়েছে ওঁর সঙ্গে। পরবর্তী পাতাগুলোতে সেই সময়কার কথাই লিপিবদ্ধ করছি।

২৪শে জুলাই এলেন কি নাটক পড়বেন, কিভাবে কি করা হবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে। প্রথমে বললেন—যাত্রার চলন হয়েছে আমাদের দেশে ৭ম-৮ম শতাব্দী থেকে। তখনকার নাটককে যাত্রা বলত। যাত্রাটা চারদিক খোলা জায়গায় হবে না তিন-দিক-খোলা জায়গায় হবে সে কথাটা ভাবতে হবে। চারদিক খোলা জায়গায় অসুবিধে হবে এই যে, ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে হবে। মাইক ব্যবহার করলে অসুবিধেই হবে।

একাজ করতে হলে রাষ্ট্র বা কর্পোরেশনের সাহায্য নিতে হবে এ কথা ঠিকই, কিন্তু অভিনয় করবে কারা? আজকালকার অভিনেতারা তো অভিনয় করতেই জানে না, সিনেমায় অভিনয় করতে গেলে অনেক নাবিয়ে অভিনয় করতে হয়, কারণ সিনেমায় মুখটা দুশ' গুণ বাড়ে—কাজেই সূক্ষ্মভঙ্গীও অত্যন্ত বিকৃত লাগে।

আমাদের দেশে অভিনেতার মূল্য নেই, তাই গিরিশবাবুও কোথাও যেতেন না; অন্য অভিনেতাদের ধমকাতেন—রঙ মেখে সামনে দিয়ে বেরুবি কেন? তাঁর বলার কারণ এ রকম করলে অভিনয়ের মায়াটা ক্ষুণ্ণ হয়।

এবার কি নাটক পড়বেন প্রশ্ন করা হল, একজন বললেন—ইংরেজি নাটক পড়ুন। উত্তরে বললেন—ইংরেজি নাটক পড়তে হলে সেক্সপীয়র পড়তে হয়, কিন্তু তাতে অসুবিধে অনেক, তার চেয়ে দিশী বই পড়াই ভাল। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী খুব ভালো বই, টডের সাহায্য নিলেও অনেক কিছু বদলেছেন, বিদেশী এলিজাবেথীয় নাটকের ওপর নির্ভর করেই পদ্মাবতী নাটকটি লিখেছেন অথচ সংস্কৃতেরও কত সাহায্য নিয়েছেন।

গিরিশবাবুর বেশির ভাগ বইই হয়ত অপাঠ্য, কিন্তু যে ক'টি ভালো বই আছে তা এতই ভালো যে বাংলা ভাষায় অমন নাটক প্রায় দেখাই যায় না।

প্রাদেশিকতার প্রশ্ন উঠলে তখন বললেন—জাতীয়তাকে এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ দোষ দিয়েছেন, কিন্তু জাতীয়তার দোষ কী? এতো ভুল ধরনের জাতীয়তা!

আগেকার দিনে লোকে তীর্থভ্রমণে বেরোলে দেশের কোথাও কোন রকম বিপদে পড়তে হত না, অথচ তখন হয়ত এই দুই দেশে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় কথা বলা যায়, এ কথাটা প্রথম আমাদের বুঝিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পাবলিসিটি খুব ভালো ছিল, ঠাকুরবাড়ির অন্যদের অত ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথের কোথায় ছিল? দ্বারকানাথ একজন মহৎ লোক ছিলেন।

অভিনয়ের প্রসঙ্গে বললেন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা দেশের মঞ্চে প্রথম অভিনয় ঢোকালেন। (বোধ হয় বলতে চাইছেন বাস্তবানুগ অভিনয়।) দানীবাবু চাণক্য আর আওরঙ্গজেব না করলে দেশে অভিনয় আসত না, নয়ত দানীবাবু বা অমর দত্ত ভালভাবে অভিনয়ই বা করলেন কোথা? শুধু 'এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল'।

গিরিশবাবু পরমহংসদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন কিন্তু পরার্থপর হলেন কই? ছেলের কথা আর নিজের নাটক ছাড়া অন্য সব বিষয়ে careless ছিলেন। তবে অনেক পড়াশোনা ছিল। কত যে পড়েছিলেন তা কেউ জানে না। সে সময় সামগ্রিক চিন্তা আর drill-এর অভাব ছিল, ব্যক্তিগত জিনিয়াসই ছিল প্রবল।

গিরিশ-প্রসঙ্গ থেকে স্বামীজীর কথা উঠল, বললেন—বিদেশে রবীন্দ্রনাথ খুবই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছেন স্বামীজী।

সমসাময়িক (অর্থাৎ আজকালকার) মঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলে বললেন—সমসাময়িক মঞ্চ সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত।

বাংলা দেশের মাসিক পত্রের কথা উঠল, বললেন—একটা ভালো মাসিকের জায়গা এখনও বাংলা দেশে আছে। ভাল বলতে পুরানো প্রবাসী আর ভারতী-র মত। প্রবন্ধ প্রথমত লেখাতে হয়। লিখতে লিখতে কাঁচা লেখা পাকে। সে চেষ্টা যে করবে সে খাবে কি?

বঙ্কিমবাবুর লোকের ক্ষমতা বিকাশ করানর অপূর্ব দক্ষতা ছিল, কিন্তু বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী অতুলনীয়, বিবিধ প্রবন্ধের মূল্য দেয়ই বা কে? জানেই বা কে?

সব মানুষের মনোবৃত্তি এক; কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা এলানো ভাব আছে। আমাদের থিয়েটার শুরু হতেই দু'ভাগ হল। একটা হলে যা মহৎ হতে পারত তা ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে দু'ভাগ হয়ে কিছুই হল না।

কথা শেষ হবার পর কি বই পড়বেন সবাইকে প্রশ্ন করলেন, অনেক তর্ক-বিতর্ক করার পর ঠিক হল গিরিশচন্দ্রের জনা পড়া হবে। বাংলা মঞ্চের নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নাটক দিয়ে নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হওয়া যে আনন্দের কথা তা সবাই স্বীকার করলেন।

৩১শে জুলাই উনি এলেন, পরিচিত মহলে ইতিমধ্যেই খবর রটে গেছে যে, শিশিরকুমার পুরানো সব নাটক পাঠ করবেন। কাজেই ঘরের মধ্যে ছোটখাট জনতা। এসে তক্তাপোষের ওপর বসলেন। দু'একজন তখনো আসেন নি বলে বই পড়া কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত রেখে অন্য সমস্ত আলোচনা সুরু করলেন।

প্রথমেই বললেন নাট্য সমালোচক কেমন হবে সেই কথা—প্রকৃত নাট্য সমালোচনা হয় না, কারণ সমালোচক হতে গেলে নাটকের সঙ্গে নাড়ীর যোগ থাকতে হয়, নয়ত ভালবাসতে হয় নাটককে। বাংলা নাটক ভালো করে পড়া থাকা দরকার, তা ছাড়া নিয়মিতভাবে রিহার্সাল আর অভিনয় দেখতে হয়। নয়ত leader লেখার মত লেখা লিখিয়ে তো সহজেই কাগজওয়ালারা নাম করিয়ে দিতে পারে। মৃতব্যক্তিদের মধ্যে অমর দত্ত আর দানীবাবু এক সময়েই অভিনয় করতেন। কিন্তু অমর দত্ত কাগজকে কাজে লাগিয়ে খুব পপুলার হয়ে উঠেছিলেন, দানীবাবু কিন্তু অত পপুলার ছিলেন না। অমর দত্তর মত অক্লান্ত কর্মী বাংলা নাট্যশালায় খুব কম ছিল, কিন্তু অভিনেতা—সে কথা না বলাই ভালো।

দানীবাবুকেও দাঁড় করালেন গিরিশবাবু। অভিনেতাদের একটা ভোল বা conventional mode of acting ঠিক করে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি সেই অনুযায়ী লিখে ছেলের সুবিধে করে দিলেন।

আমাদের দেশে আগে থিয়েটারের দাম ছিল, ভরত কালিদাসের আগেই লেখা হয়েছিল আর রাজশেখর বসুর রামায়ণের অনুবাদের উনিশ পাতায় লেখা আছে যে, অযোধ্যার অলিতে-গলিতে থিয়েটার ছিল।

ইতিহাসে bias একটু থাকবেই, কিন্তু তা establish করা চাই।

কালিদাসের ভৌগোলিক জ্ঞান খুবই ভালো ছিল; শাস্ত্রীমশায় জিনিসটা ভাল করেই শিখিয়েছিলেন। শাস্ত্রীমশায়ের লেখা সব এক করে বার করা উচিত। উনি বড় গোঁতো ছিলেন, জোর করে লেখাতে হত। তবে তাঁর সঙ্গে কথা বললেই কত জ্ঞান বোঝা যেত।

গিরিশবাবুকে আমার প্রহেলিকা মনে হয়। একদিকে পরমহংসদেবের শিষ্য, অথচ কখনও ঠকেন নি। মিথ্যে মকদ্দমাতেও জিতেছেন। গাড়িতে চড়বার সময় বলেছেন—আজ অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলব, লোকটা বড্ড জ্বালিয়েছে। তবে থিয়েটার উনি না হলে চলত না। ভুবন নিয়োগী, অমৃতলাল আর অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফি কি থিয়েটার চালাতে পারতেন নাকি?

অর্দ্ধেন্দুবাবুর কথা ছেড়ে দাও, মরবার সময় বলেছিলেন, সর্বাঙ্গে বেশী মদ ঢেলে

স্তবে যেন পোড়ান হয়। মানুষ বড় ভালো ছিলেন, রিহার্সালে আমারই মত ঝোঁক ছিল, দশ-পঁচিশবার বলতে কষ্ট পেতেন না। রিহার্সাল আরম্ভ করলে আর শেষ করতে চাইতেন না, তা লোকে মরুক আর তরুক।

মানুষটি খুব দুঃসাহসী ছিলেন। 'দস্তাবক্রে' শৌরীন্দ্রমোহনের নকল করে তাঁর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলেন। তবে কালীকেষ্ট ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। শিখিয়েছেন কিন্তু পাত্র-অপাত্র ভেদ না করে।

গিরিশবাবু কিন্তু কাউকে শেখাতেন না; রিহার্সালে বসতেন এক ডাবা পান, আর ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কির বোতল নিয়ে, চাকর সোডার বোতল নিয়ে তৈরী থাকত। দু'তিনবার বলেই বলতেন—ঠিক হয়েছে, তোমার বয়সে অমন আমি পারতুম না, এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল, তাহলেই হবে।

তিনকড়িই একমাত্র অভিনেত্রী যাঁকে গিরিশবাবু খাতির করে চলতেন। একবার মহেন্দ্র মিত্রকে যা বলেছিল, তা (সধবার একাদশী) নাটকেই লেখা আছে। মীরকাশিমে তাবার ভূমিকায় অভিনয় করছে, কে বুঝিয়েছে, অন্য দু'জন, সুশীলা আর তারা, খুব ভাল পোশাক পরছে আর তোমার বেলা শুধু গেরুয়া! তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে দাঁড়াল, ভাল পোশাক ছাড়া নাবৰে না।

গিরিশবাবু বললেন তিনকড়িকে কোন অনুরোধ করতে পারবেন না। কে যায় বোঝাতে? শেষ পর্যন্ত চারআনি মালিক মহেন্দ্র মিত্র সাহস করে বোঝাতে গেলেন। তিনকড়ি সাফ মুখের ওপর বলে দিলে—তুমি আর টকখাই-টকখাই কর না বাপু, যাও আর ওকালতি করতে হবে না। তোমার মত উকিলের শামলায় আমি হুঁকোর জল ঢেলে দিই।

মহেন্দ্রবাবু পালিয়ে বাঁচলেন, শেষ পর্যন্ত একজন বুদ্ধিমান লোক (ভোলাদা' বলেন—সমস্তটাই রসিকতা আর তা মিটমাট করান অর্দ্ধেন্দুবাবু) গিয়ে বোঝালে—আরে, তোমায় কি এমনি গেরুয়া পরাব, একেবারে খাঁটি সিল্কের গেরুয়া। তখন ঠাণ্ডা হল তিনকড়ি।

ডাঃ অধিকারী মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে কথা বার করতে চাইতেন। বললেন—তারার কিন্তু খুব দম্ভ ছিল। বললেন—থাকবে না কেন, এক সময় থিয়েটারের মালিক পর্যন্ত ছিল।

পাণ্ডব গৌরব দু'বার করেছি, কিন্তু ওর ওপর আমার কোন **sympathy** নেই।

এই দিন জনাব আধাআধি পড়ে শোনালেন।

৭ই আগস্ট এলেন। প্রথম কথা হল—সেদিন আমি ভুল করেছিলুম, মাইকেলের শর্মিষ্ঠায় আছে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আর গ্রীক নাটকের প্রভাব আছে পদ্মাবতীতে। তার পর বললেন—একজন অভিনেতা অনেককাল অভিনয় করছে, মহতী আকাঙ্ক্ষা মানে জানে না। বলে—যুদ্ধ হবে আর কি? তখন আমি বললুম—কথাটার মানে হল পৃথিবীশ্বর হবার ইচ্ছা। বিজিগীষা মানে জানে না।

পুরানো দিনের অভিনেতাদের সম্বন্ধে বললেন—গিরিশবাবু একটা ভোল করলেন, ছেলেকে বড় করবার জন্যে কতকগুলো বড় বড় পার্ট লিখে গেলেন। দানীবাবু অবশ্য লেখাপড়া জানতেন না, তবে তখন তাঁরা স্বীকার করতেন যে, লেখাপড়া জানেন না। কুসুম বড ভাল বলেছিল। একটি ছেলে না মেয়েকে শেখাচ্ছি, পার্টটা বোঝানর জন্যে গোটাকতক ইংরেজি sentence বলেছি, তা দেখি সে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে আছে। কুসুম বলল—ও তো খুবই বুঝেছে। যে ভাষায় বললেন ও ভাষায় সে ও পণ্ডিত!

রামকৃষ্ণের কাছে গিরিশবাবু গিয়েছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। পরমহংস-দেবের শিষ্যরা খুব সাহায্য করেছিলেন। স্বামীজী ছিলেন পেছনে। স্বামীজীর অপূর্ব জনপ্রিয়তা ছিল। পশ্চিমেও স্বামীজীর যা জনপ্রিয়তা ছিল, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না। কিন্তু এদেশে স্বামীজীর নাম হল আমেরিকা থেকে নাম করে এসে।

ওদের দেশে কতকগুলো গরীব লোক থিয়েটার খুললেন, তারপর মিস হর্নিম্যান টাকা দিতে দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের দেশেও গরীব লোকেরাই থিয়েটার খুলেছিলেন। গিরিশবাবু ছাড়া কারো কিছু ছিল না। অর্ধেন্দুবাবু ছিলেন অন্নদাস। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে থাকতেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যত্ন আত্তি করতেন, পঞ্চাশ টাকার বেশি কখনও একসঙ্গে চোখে দেখেন নি। শীতকালে ওভারকোট আর গরমকালে ড্রেসিং গাউন পরে কাটিয়েছেন। খাবার মধ্যে খেতেন দিশী মদ। দিশী ছেড়ে বিলিতিতে কখনও উঠতে পারেন নি। দিশী মদ বোধ হয় তখন চোদ্দ আনা বোতল ছিল।

এবার এলেন জনার প্রসঙ্গে, বললেন—জনা বলা হয় লেডি ম্যাকবেথের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কিন্তু পড়লে তো তা মনে হয় না। কাব্য হিসেবে খুবই ভাল বই। ওঁর আর একটা ভাল বই পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত। নাটকটির দুটি কেন্দ্র—কীচকবধ আর উত্তর গো-গৃহযুদ্ধ। অবশ্য এরকম

দু'টো কেন্দ্র জনাতেও কিছুটা আছে। প্রবীরের মৃত্যুর পরের অংশটাও নতুন। ওঁর নাটক গ্রীক বা সেক্সপীয়রের নাটকের ছকে নয়, একেবারে সম্পূর্ণ নিজস্ব। মার্চেন্ট অব ভেনিস-এ শাইলকের ব্যাপার সেক্সপীয়র পোর্শিয়া আর তার রিং নিয়ে একটা বাড়তি অংক লিখতে পারেন তো গিরিশবাবুই বা পারবেন না কেন?

আইন হয় পরে। আরিস্টটল আরিস্টোফেনিস আর ইসকাইলাস-এর কত পরে আইন বাঁধলেন। তাছাড়া বিখ্যাত লেখকরা আইন পুরো মাত্রায় কখনই মানেন না। জেন অস্টেনের লেখার সঙ্গে ডিকেন্সের লেখার যেমন অনেক তফাৎ।

ইংরেজ লেখকদের কথায় বললেন—আর্নল্ড বেনেট তো ভাল লিখতেন। আনা অব ফাইভ টাউনস খুব ভাল বই। ওল্ড ওয়াইভস টেলস-ও বেশ ভাল লেখা। ওয়েলসও ভাল লিখতেন। মিঃ পলি পড়েছি।

কথায় কথায় মহাপ্রস্থান নাটকের কথা উঠল। বললেন—মহাপ্রস্থান দু'টি লোক লিখতে পারতেন—ক্ষীরোদ পণ্ডিত আর গিরিশবাবু। গিরিশবাবু লিখলে ভীষণ ট্র্যাজিক হত। অবশ্য এর চেয়ে ট্র্যাজিক আর কি হতে পারত! তবে উনি বোধ হয়, মহাপ্রস্থান পর্যন্ত যেতেন না। অর্জুন যেখানে গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না সেখানেই শেষ করতেন। ক্ষীরোদবাবুকে বলতে উনি লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু একদিন ভেবে এসে বললেন—ভায়া, এখনও ষাট বছর হয়নি, এরি মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের মৃত্যু দেখালে কি আর বাঁচব!

জনার কথা তুললেন আবার, বললেন—জনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কি? ভাল করে পড়ান দরকার, শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ান দরকার। এতে নাটকীয়তাও আছে, কাব্যগুণও আছে। যাঁরা পড়ান তাঁরা ভাল করে পড়ান না। কিছু ভাল ভাল সমালোচনা থাকলেও তাতে এমন অনেক জায়গা আছে পড়লে বোঝা যায়, তাঁরা বইটা ভাল করে পড়েন নি। তা ছাড়া শ্রদ্ধা না থাকলে কী করে বুঝবেন।

মাইকেলের প্রতি গিরিশবাবুর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। আমার যখন সতের বছর বয়স, তখন প্রথম গিরিশবাবুর কাছে যাই ইনস্টিটিউটে রেসিটেশন, কম্পিটিশনে কি ভাবে রেসিটেশন করব শিখতে। মাইকেলের লেখার যে অংশটি নির্দিষ্ট ছিল সেটা পড়ে দুঃখ করে বলেছিলেন, এটা তো মাইকেলের লেখার ভাল অংশ নয়, এর চেয়ে অনেক ভাল লেখা আছে তাঁর, এই বলে নীলধ্বজের প্রতি জনা পড়ে শোনালেন।

তিনি যে নিজে নাটক লিখবেন একথা কখনও ভাবেন নি। কিন্তু খুব ভাল অভিনেতা ছিলেন। ইউনিভার্সিটির উচিত গিরিশবাবু সম্বন্ধে খোঁজখবর

নেওয়া। তাঁর নাটকের genesis সম্বন্ধেও খোঁজ নেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ আমায় বলেছিলেন—গিরিশবাবুর লেখা পড়িনি আর এ বুড়ো বয়সে পড়তে বলো না। তবে তিনি খুব বড় অভিনেতা ছিলেন।

দানীবাবুকে যে দেখতে পারতেন না তার কারণ তিনি তো কেবল ভোলে চলতেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর খারাপ অবস্থার শুরু হয়। এক দেবলাদেবী-তে খিজির খাঁ হয়ে চেঁচিয়েছিলেন কিছুদিন, তবে পয়সা পান নি।

আজকের দিনে যে যাই করুক, publicity conscious সবাই। আমাকে দু'বছর কেউ mention করেনি।

এক বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকের নাম করে বললেন,—ওকে উনিশ'শ সাতাশ-আটাশ সালে বলেছিলুম, সমালোচনার জন্যে একটি ভালো ছেলেকে তিন-চারশ' টাকা মাইনে দিয়ে রাখ, আমরা তাকে সাহায্য করব। তাতে বললে, এমনিতেই কত লোকে লেখা দিতে চাইছে। আর একটি পত্রিকাগোষ্ঠীর পরিচালকের নাম করে বললেন—সে বললে, কেউ তো কিছু জানে না। যা লেখবার আপনি বরং লিখে দেবেন, কাগজে ছাপিয়ে দেব। আমি তাতে রাজি হইনি।

যাবার সময় ঠিক হল পরের দিন পড়বেন পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

আবার এলেন চোদ্দই আগস্ট। ইতিমধ্যে বার্নপুরে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেই প্রথমে বললেন—বার্নপুরে মেজর জেনারেল পি. চৌধুরীর বাড়িতে ছিলুম। ভদ্রলোক ex.-I.M.S. ওঁর স্ত্রীকে আমার বড় ভাল লেগেছে। কোনো রকম রংচং-মাখা নয়, একেবারে সাধারণ বাঙালী-ঘরের বউ। অথচ যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন সবাই রং-মাখা। আর কী যত্ন! খাইয়েছেও খুব ভাল। তাই তো বললুম, I am feeling quite at home!

চৌধুরী সাহেব আই. এন. এ.-তেও ছিলেন, জীবনে অনেক অ্যাডভেঞ্চার আছে।

অভিনয় খুব ভাল হয় নি। (একজন অভিনেতার নাম করে)—এর অবস্থা খুব স্বাভাবিক ছিল না। একবার ঢুকে আর যখন ঢুকল না তখনই বুঝলুম কিছু গোলমাল হয়েছে। বাঁধা হাততালি পাবার জায়গায় না পেলে এক কথা তিনবার করে বলেছে।

স্টেজটি খুব ভাল, গভীরতা চল্লিশ ফুট, তবে মাঝখানে একটা বাধা আছে (সম্ভবতঃ পিলার), নীচে ছ'শ পঞ্চাশজন লোক ধরে। স্টারেও ধরত না।

জিজ্ঞাসা করলুম—সবই তো তোমাদের ভালো, কিন্তু মাঝখানে ওটা কেন ? স্টারের নকল ? তা উত্তর দিলে—না,আগে ওই পর্যন্তই ষ্টেজ ছিল, এখন বাড়ান হয়েছে। আমি বললুম—ওটা সরিয়ে দিও। আর একটু জিজ্ঞাসাবাদ কর। অভিনয় করতে পয়সা নিই বটে, কিন্তু এসব কথা জানতে চাইলে তো আর পয়সা নেব না।

এবারে কতকগুলো সাধারণ কথা বললেন—আমাদের দেশে জাতীয়তাবোধ এসেছে পরে। আর্যরা যে বাইরে থেকে এসেছিল একথা হয়ত সত্যি নয়, নয়ত এদেশের লোকেরাই নিজেদের আর্য বলে চালিয়ে দেয়। মুসলমানেরা যখন এদেশে আসে আমাদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রসঙ্গে বললেন—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস লেখা হয় 'আঠারশ' বিরাশি সালে। তার আগের বছর লেখা হয় রাবণ বধ। প্রথম দিনে উত্তরা কে করেছিল তার নাম পাওয়া যায় না। অমৃতলাল মিত্র করেছিলেন ভীম ছাড়া আর দু'টো পার্ট। গিরিশবাবু করেছিলেন কীচক আর দুর্যোধন। গিরিশবাবু কীচক খুব ভালো করতেন, কিন্তু প্রথম রাত্রির পর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন করতেন মতিলাল সুর। তাই নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আবার ধরলেন। অমৃতবাবু ছিলেন লম্বা চওড়া দশাসই পুরুষ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস-এর দুটি ঘটনা, এক কীচক বধ আর এক উত্তর গোগৃহ যুদ্ধ। দু'টিকে জুড়েছে উত্তরা-অভিমন্যু বিবাহ আর কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ইঙ্গিত।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস-এ বিদেশী কোন ছোঁয়া নেই। এর মূল হচ্ছে পুরো কাশীরাম দাস। এর গড়নটাও সম্পূর্ণ গিরিশবাবুর নিজস্ব।

সেক্সপীয়রের খুব ভক্ত ছিলেন গিরিশবাবু। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন উনি। যতকাল ছিলেন, নতুন কোন ধারাকে ঢুকতে দেন নি।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু পড়াবে কে ? সেক্সপীয়র বোধ হয় শ্রীকুমার পড়াতে পারে, পার্সিভাল সায়েবের নোট ওর মুখস্থ। প্রফুল্লবাবুও ভাল পড়াতেন শুনেছি। তবে আমাদের যা পড়িয়েছিলেন—ফাইলোলজি—তা ভাল পড়ান নি। ফাইলোলজি জানে সুনীতি, একেবারে সব মুখস্থ।

প্রফুল্লবাবুকে পড়ানর লাইনে আনলেন পার্সিভাল সায়েব। ধমকে বললেন—ডেপুটিগিরি করবে তো আমার কাছে এতদিন পড়লে কেন ?

প্রফুল্লবাবু আগে এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের জ্বালাতনে পালিয়ে বাঁচলেন। পার্সিভাল সায়েব ওঁকে খুব ভালবাসতেন। নিজের সব নোট বই দিয়ে যান।

ওঁর সময় পার্সিভাল আর. এম্. ঘোষ ভাল পড়াতেন। আর একজন ভাল পড়াতেন—বিনয়সেন। উনি ফিল্‌জফি, হিস্ট্রি আর ইকনমিকসের প্রফেসর ছিলেন। কিন্তু কোন দিকে যেতেন না, তাই আশুবাবু পছন্দ করতেন না। তবে দলে টানতে চেয়েছিলেন। বিনয়বাবুকে এক কথায় ইন্সপেক্টর অব কলেজেস করেছিলেন। তিনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন। তাঁকে সবাই নাম ধরে ডাকতে পারতেন না, বাবু বলতে হত।

আশুবাবুর মাঝে মাঝে ওরকম ঠিক ভুল হত, গুরুদাসবাবুর সঙ্গেও একবার হয়েছিল। ওঁর ছেলে হারাণের চাকরি করে ওঁর কাছে ভোট চান। তাতে গুরুদাসবাবু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

ঐ সময়ে পণ্ডিতেরা তাঁদের জ্ঞান দেখাতেন না, নিতান্তই খোঁচা দিয়ে জানতে হত।

তখনকার দিনে থিয়েটার কেমন হবে জানতে চেয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথের কাছে, তিনি এড়িয়ে গেলেন। থিয়েটারের অবস্থা জানতে এসেছিলেন উনি, কিন্তু স্পর্শকাতরতার জন্যে কিছু করতে পারলেন না। অবশ্য তখন থিয়েটারের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। মাতালকে ওঁর ঘৃণা ছিল না, ওঁর বাড়িতেই তো কত মাতাল ছিল। তাছাড়া লোকেন পালিত ছিলেন ওঁর বন্ধু। কিন্তু vulgarityর জন্যেই পারলেন না।

আরে আমার কথাই ধর না। যখন প্রথম চাকরি নিলুম, ম্যানেজার বলে আমার নাম জানান হল, আমার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা, বেশ সাহস নিয়ে গেলুম প্রথম রিহার্সাল দিতে। গিয়ে দেখি কতগুলো মোটা মোটা কালো কালো ঝি (তাদের মধ্যে দু'চারজন যে ভাল দেখতে ছিল না এমন নয়। তবে তাদের সবাইকে দেখলেই মনে হত খুব মুখ-আলগা খোলার-ঘরে-যারা-থাকে তারাই উঠে এসেছে বুঝি।) নতুন ম্যানেজারকে দেখতে মুখ-ভর্তি পান আর গা-ভর্তি গয়না পরে এসে একদিকে বসে আছে : পুরুষেরা অন্যদিকে। দেখেই তো আমার বুক বিশ হাত নেবে গেল। হঠাৎ নৃপেনবাবু বাঁচিয়ে দিলেন, 'মাইরি কু একটা পান দে তো' বলে যেই ঢুকেছেন, আমিও তেড়ে উঠেছি, তুমি কে বট হে? চাকরি রাখতে চাও না চাও না। না চাও ত সরে পড়। ব্যস, ঐ ঘটনার পরই আমার দাম বেড়ে গেল।

দ্বিজুবাবুর সঙ্গে মঞ্চের কারোরই গভীর যোগ ছিল না; কাউকে শেখান নি, শুধু দানীবাবুকে সাজাহান আর চন্দ্রগুপ্ত-এ কিছুটা নড়াচড়া করতে শেখালেন।

বোধহয় ডাঃ অধিকারী বললেন, দানীবাবু বলেছিলেন বাপী তাঁকে শিখিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—দানীবাবু, যদি বলে থাকেন বাপী শিখিয়েছেন তাহলে ভুলে বলেছেন। বাপের কাছে কখনও শেখেন নি! তবে বাপকে খুব ভক্তি করতেন।

দানীবাবুর একটা মস্ত গুণ ছিল, শিক্ষিত লোক দেখলে মুখ বন্ধ করতেন, কিছুতেই আর খুলতেন না। ওঁর গাঁজা খাওয়া অভ্যেস ছিল। (উনি তখন আমার কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে) বিশুকে চুপি চুপি ডেকে বলছেন, ভায়া আমি ওই কোণে (কোণের urinal-এর পাশে) যাব আর ওই ছেলেটা ধরিয়ে দেবে এখন।

বিশু শুনে বললে, বেশ তো আপনি খান, ঘরেই ব্যবস্থা করে দেব'খন।

তাড়াতাড়ি তখন বলছেন, না ভায়া ওখানে কত শিক্ষিত লোক আসে, কে আবার কি ভাববে। উনি বড় একটা খিস্তি করতেন না, কেবল সামান্য দু'একটা মাত্রা ব্যবহার করতেন। ওঁর নামে বদনাম যে রটিয়েছিল তাকে আমি চিনি। ওই যে মস্ত বড় হাঁ, নামটা মনে পড়ছে না। খেতে পাচ্ছিনা বলে আমার কাছে এসে কাজ নিয়েছিল।

Open-Air Theatre আমাদের দেশে করা সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের উত্তর বললেন—আমাদের দেশে Open-Air Theatre হতে পারে না, আর ওটা তো আসলে বাঁধা Theatre, শুধু দর্শকদের অংশ খোলা। তা ভাতে আলোকের দরুণ যা খরচ হবে তাতে তিনটে থিয়েটার হতে পারে।

অ্যাবি থিয়েটার কোনদিন ফুল না হয়ে যায় নি। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তাছাড়া, ওদেশের বড়লোকেরা (পেছনে) ছিলেন তো, কাজেই দাঁড়িয়ে গেল।

Experimentation করা দরকার, তবে সেটা যাত্রার Form নিয়ে হলেই ভাল হয়।

থিয়েটার চলে না বলায় উনি বললেন—ভাল থিয়েটার করলে চলবে না কেন? ভাল দৃশ্যপট দিয়ে ভাল অভিনয় করলে লোকে নিশ্চয়ই নেবে, তারপর রুচি বদলাতে হবে।

সংস্কৃত নাটক পড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন—সংস্কৃত নাটক পড়া তো দরকার। নইলে নিজেদের ঐতিহ্য জানব কেমন করে? ভাসের নাটকও বেশ ভালো জিনিস। আমাদের অবস্থা তো ওই জন্যেই খারাপ। আমরা নিজেদের

অতীতের কথা কিছুই জানি না। Wilson সায়েব মৃচ্ছকটিকের প্রশংসা করে আমাদের সভ্য করে দিলেন। অথচ ওটা অনেক পরে লেখা মনে হয়। দশম শতাব্দীর হবে হয়ত। তার আগে 'বেবুশ্যের' বিয়ে বোধ হয় চলত না।

পশ্চিম দেশে sex-এর ওপর ঝোঁকটা বেশি। আমাদের দেশে সমাজের ভয় ছিল। দু'চার জন করে নি এমন নয়, কিন্তু ওদের মতো অত preoccupied হলে আমাদের tradition এতদিন চলতে পারত না। মুনিঋষিদের অপ্সরা-সংযোগ allegory বলেই মনে হয়। সেগুলোর মূল কথা হল, যতই আত্মনিগ্রহ কর না কেন, কামকে জয় করা মোটেই সহজ নয়।

২১শে আগস্ট এসে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস-এর শেষ অংশটা পড়লেন। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস-এর শেষের দিকে যে ব্রাহ্মণকে আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে বললেন—ওকে আনা হয়েছে একটি যুগের শেষ বোঝাতে।

কৃষ্ণ ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূত্রপাত করলেন কিন্তু (যুদ্ধ-শেষে) যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে পারলেন না! ফিরে গিয়ে দেখলেন যত পাপ সব এসে যদুবংশে জড় হয়েছে। সেই পাপ দূর করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনেরও ক্ষমতা গেল। তাঁর চোখের সামনে যদুনারীদের কেড়ে নিয়ে গেল।

যুধিষ্ঠির খবর পেয়ে বললেন, ভায়া, আমাদের সময় আর নেই, এবার অভিমন্যুর ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে সরে পড়ি। তাই গেলেন তাঁরা।

গিরিশবাবুরা চরিত্রের সমগ্রতার ধারণা করে অভিনয় করতেন বটে, কিন্তু (নাটকের) সমগ্রতার ধারণা রাখতেন না, দৃশ্য থেকে দৃশ্যেই অভিনয় করতেন। Production-এর সমগ্রতার ধারণা নিয়ে প্রথম নাটক আমরাই করি—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। অপরেশবাবুর আর্ট থিয়েটার ষাট টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়েছিল; আমি তখন মদনের চাকরি নিয়েছি, রিহার্সাল দেখে ভাল মনে হল না তাদের; দিলেন গোলমাল বাধিয়ে।

আগেকার দিনে গিরিশবাবু, অর্ধেন্দুবাবু আর অমৃত বোস ছাড়া বাকি সবাই চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না ভেবেই হাততালি পাবার জন্যে অভিনয় করতেন। একবার কার benefitএ অমর দত্ত যোগেশ করছেন। আমি আর যতে রায় অনেক কষ্টে দু'টাকার টিকিট কিনে এক টাকার সিটে বসেছি। অমর দত্ত এক জায়গায় সংলাপ বলছেন, ভাবনা আমার…যাদব ইত্যাদি। যাদব বলতে গিয়ে হঠাৎ গলা চড়ালেন। যতেটা ছিল cantankerous, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, মাধব।

তারপর লোকেরা এই মারে তো এই মারে। তাকে বার করে এনে সব ঠাণ্ডা করি।

হাততালি দিলে নটরা হাত তুলে নমস্কার করতেন, তবে ওই আগের তিনজন ছাড়া। নৃপেনবাবুর ওই দোষটা বড় বেশি ছিল।

অমরবাবুর মত দানীবাবুও অভিনয় ভালো করতেন না, তবে কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব। গিরিশবাবুর পরেই তাঁর গলা, অমৃত মিত্র মশায়ের গলাও ভালো ছিল, তবে নড়াচড়া করতেন না। দানীবাবু অবশ্য শরীরটা একটু বাঁকাতেন, তবে সব চরিত্রে একই রকম করতেন বলে মোটেই মানাত না। তাছাড়া পোশাক-পরা সব চরিত্রে—সিরাজ, মীরকাশিম, ছত্রপতি—এক ধরনের অভিনয় করতেন, চরিত্রগুলোর পোশাকও হত এক রকমের। এক শঙ্করাচার্যের বেলায় কিছুটা আলাদা, গিরিশবাবু ওই ভূমিকাটা করার আগে ছেলেকে কাশী নিয়ে গিয়েছিলেন।

গল্প আছে, গিরিশবাবু একবার ছেলেকে বলেছিলেন—কাল কি বই করছিলি রে—ঐ (একটি সামাজিক বইয়ের একটি চরিত্রের নাম করে) না সিরাজ ?

দানীবাবু উত্তর দিলেন, সবাই কী সব পারে ?

তবে অশিক্ষিত দর্শকদের জমিয়ে দেবার কায়দা গিরিশবাবু খুব ভালো জানতেন, দানীবাবুও কিছুটা পারতেন, অশিক্ষিত-পটুত্ব কিছুটা ছিল তাঁর। আর কী দম, একটানা বাইশ তেইশ লাইন বলতে পারতেন !

দানীবাবু অভিনয় করতে শেখেন দ্বিজুবাবুর কাছে, ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে প্রথম। অবশ্য তাঁর (দ্বিজুবাবুর) চরিত্রের conception আর আমার conception-এ অনেক তফাৎ ছিল। চাণক্য করার প্রথম দিন সকালে দু'ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছিলুম, তবে তর্কাতর্কিই হল।

উনি বললেন, কাত্যায়ন একটি fool (হয়ত নাটকের দিক থেকে প্রয়োজন নেই বলে বলেছিলেন)।

তা আমি বললুম, কি করে হবে। চাণক্যই তো বরং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ধরনের। পায়ে কুশ ফুটেছিল বলে একটি বিতিকিচ্ছিরী কাণ্ড করলে, তাকে সভায় নিয়ে এসে অপমান করিয়ে প্রতিহিংসার কথা খুঁচিয়ে তুললে কে ? মুরাকে চন্দ্রগুপ্তের সামনে অপমান করালে কে ? সেলুকাসকে আনালে কে ?

তবে কাত্যায়ন চরিত্রের দুর্বলতা হল, কোন একটি জিনিস শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবার ক্ষমতা ছিল না তার, সে ক্ষমতা ছিল চাণক্যের। আর চাণক্য তো মিথ্যে কথা বলত না, মেয়েকে পেয়ে বললে, আমি চলে যাব, কিন্তু তুমি তোমার

সুযোগ্য মন্ত্রীর সাহায্যে সুখে রাজ্য শাসন কর, ভয় নেই। কাত্যায়ন fool হলে কি বলতে পারত?

দ্বিজুবাবু শুনে বললেন, খুব ভেবে পড় তো! ওঁর শেখান খুব একটা ভাল কিছু ছিল না। মনে একটা ধারণা ছিল, আমার লেখা কেউ বুঝবে না, কাজেই যাতে জমে যায় তাই করাই ভাল।

আমি যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকি, তখন কোনদিক থেকে সাহায্য পাই নি, দলের লোকেরা তাড়াতে বদ্ধপরিকর; কিন্তু ভাগ্য ভাল ছিল, প্রথম রাত্রিতেই জমে গেল।

কাগজওয়ালারা প্রথম দু'তিন বছর আমাকে কোন আমলই দেয় নি, বরং উল্টে গালাগাল দিয়েছে। অন্য থিয়েটারের কর্তারা আমাকে ভাগাতেই চাইত, তাছাড়া মদন কোম্পানী আবার বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিত না।

'হ—' একদিন নেশার ঘোরে একটি ভাল কথা বলেছিল। (ওই যে ভুঁড়িওয়ালা জমিদার, কি নাম যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, গোপিকারমণ, আমরা বলতুম ধোপিকাদমন, তার ওখানে)। ওর তখন বেশ নেশা, বললে—শিশির ভাদুড়ি! তাকে আমরাই তুলেছি, আবার আমরাই নাবাব। কথাটাতে exaggeration থাকলেও কিছুটা সত্যি বটে।

আমায় প্রথম প্রশংসা করে নাচঘর-এ মণিলাল। আর লিখে না হলেও, প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন দীনেশ সেন। অবশ্য ফল তাতে ভাল না হয়ে খারাপই হয়েছিল।

শিবপুরে একটা মিটিংএ (হরিগোপালের ক্লাব—গোবধ ন নাট্য সমাজে) প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে সুখ্যাতি করেছিলেন। প্রথম আমাকে আবৃত্তি করতে বললেন। আমি তখনও আবৃত্তি করা ছাড়ি নি, কাজেই একটা (বোধহয়, পঞ্চনদের তীরে) আবৃত্তি করলুম। তারপরেই উনি বক্তৃতা করতে উঠে রামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলেন। এক জায়গায়—গাভী যেমন বৎসকে লেহন করে তেমনি রাম চোখ দিয়ে লবকে লেহন করেছেন—বলায় খুব হাসির রোল পড়ে গেল। উপমাটা অবশ্য খুব ভুল দেননি।

ওঁর একটা নাটক (নাম ত্রিবঙ্কেশ্বর—ত্রিবাঙ্কুরের এক শিবমন্দির নিয়ে লেখা, বেশ ভালই হয়েছিল। তা' আমি বললুম, বদলে দিন। উনি বললেন, তুমিই নাও না লিখে, তাতে আমি বললুম, সে আমি পারব না।) হারিয়ে ফেলি। উনি কিন্তু শুনে বললেন, ও কিছু নয়, অমন আমার কত গেছে।

দীনেশবাবুর ছেলে অরুণ একটা উপন্যাস লিখেছিল, পড়ে বেশ ভাল লেগেছিল। বললে, ছাপলে পয়সা হবে? বললুম, হবে। তা আমাকে দেয়নি।

অরুণ বোকার মত রিটায়ার করলে। স্কটিশ চার্চ কলেজের সায়েবেরা বারণ করেছিল, বলেছিল, ও কাজ কর না। তা শুনলে না। ওর ছেলে সমর শুনলুম মস্কোয় আছে। এই মস্কোর সঙ্গে জোড়টা ভাঙা দরকার।

লোকে বলে, রবীন্দ্রনাথ নাকি মঞ্চের জন্যে অনেক কিছু করতে চেয়েছিলেন, আমরাই দিইনি। কথাটা সত্যি নয়।

রবিবাবু খুব একজন ভালো অভিনেতা ছিলেন না, ওঁর চেয়ে অবনবাবু অনেক ভালো অভিনয় করতেন, রবিবাবু যে ভূমিকাতেই নাবুন না কেন, সব সময়েই মনে হত রবিবাবুকে দেখছি।

একজন বললেন—কেন, বিসর্জন-এ রঘুপতি? হাসলেন—ও ভূমিকার কথা আর বল না, ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। রঘুপতির পাজামা আর পাঞ্জাবী-পরা চেহারা!

ডাকঘর-এর কথা উঠল, বললেন—ডাকঘর-এর প্রথম অভিনয় দেখেছিলুম বিচিত্রা ভবনের মেঝেয় বসে। অবনবাবুর ঘরোয়া বইটিতে আছে, অবনবাবু নন্দলালকে ঘরের চালে লাউ ঝুলিয়ে দিতে বলেছিলেন, এই বইটিতেই। মোড়লের ভূমিকায় অবনবাবু সত্যি ভালো অভিনয় করেছিলেন, আর রবিবাবু এলেন, কারো বুঝতে ভুল হল না—রবিবাবু এলেন।

সাধারণ ভাবে থিয়েটারের কথায় বললেন—থিয়েটারকে ভালবাসতে পারা চাই তো? সে ভালবাসা ছিল গিরিশবাবুর। অমর দত্তকে সোমবারের মধ্যে আড়াই হাজার টাকা জমা দিতে হবে, নয়ত ক্ল্যাসিক থিয়েটার থেকে উৎখাত করবে। শনিবার পর্যন্ত নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে টাকা আর যোগাড় হল না। খবর পেয়ে গিরিশবাবু ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এত জায়গায় ঘুরেছ আর আমার কাছে আসতে পার নি? এই নাও টাকা, যখন পাব শোধ দিও, না পাব দিও না; কিন্তু সোমবার সকাল দশটার সময়েই যেন টাকাটা জমা পড়ে। থিয়েটারকে আগে বাঁচাও। হীরেন দত্তর ছেলে নাকি কথাটা লিখেছে, কিন্তু লোকের কী নজরে পড়েছে?

গিরিশবাবু সম্বন্ধে এত কথা জানি যে ছ'শ' পাতার একখানা বই হতে পারে। কিন্তু লিখব কখন? বই যা দরকার দেবে কে? আর যে ক'মাস লিখব, সে ক'মাসের খরচ চলবে কি করে আমার?

গিরিশবাবুকে মাতাল চরিত্রহীন বলে, কিন্তু তাতে কী তাঁর বৈশিষ্ট্য যায়? হীরালালবাবুর মুখে গল্প শোনা। একদিন একদল মাতাল থিয়েটারে খুব হল্লা করছে। শুনে গিরিশবাবু বললেন, ডেকে আন তো খানকীর ছেলেদের (মুখ বড় খারাপ ছিল ওঁর: প্রায় কথাতেই একটা মাত্রা জুড়ে দিতেন)। তারা এলে পরে বললেন, আমি মদ খেলে মাতাল, না খেলে গিরিশ ঘোষ। মদ না খেলে তো বেটারা (একটা মাত্রা জুড়ে) কে?

ছবি এবার সম্বর্ধনা পেল, তা ভালোই হয়েছে। অভিনয় ও ভালোই করে। ছবি রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা বলেছে বুঝি! ভাবছে খুব বড় কথা বললুম। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত করলে কোনও জিনিস কি ভাল হয়? রাশিয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত করে ভাল সাহিত্যই মরে গেল! এ সম্বন্ধে আমার একটা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে, কিন্তু ছাপবে কে?

এই সম্মান আমাকেই প্রথমে দিলে। আমি গোড়ায় রাজি হইনি। শেষ পর্যন্ত সতীশের (অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ) কথায় রাজি হলুম, তাছাড়া একটা লোভও হয়েছিল; আর লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মানে তিন চার লাখ টাকা দেবে বলেছিল, সবই প্রায় ঠিক, 'শ্রীরঙ্গম' নাম মেনে নিল, agreement ও ready, হঠাৎ একটি ফ্যাকড়া উঠে সব বানচাল হয়ে গেল।

যাবার সময় শেষ কথা বললেন—আমায় একটি বাড়ি দাও আর কিছু উৎসাহী ছেলেমেয়ে, বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

॥ ৫ ॥

বাংলা নাটকের ঠিক বিবর্তন অনুসরণ করে নাটক উনি পড়তে শুরু করেন নি, গিরিশচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবেই প্রথম তাঁর দু'টি বই পড়লেন। এবার অন্য কারও বই পড়া দরকার, নিজেই বললেন একথা, কিন্তু কার বই?

নানারকম প্রস্তাব উঠল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে, রবীন্দ্রনাথের মালিনী পড়বেন। কথাটা কি করে বাইরে রটে গিয়েছিল, কাজেই আটাশ তারিখে যখন এলেন, ঘরে তখন প্রচণ্ড ভাড়। এসে বসার পর, নজরুলের কথা উঠল, বললেন—কাজীর বিদ্রোহী সারা কলকাতায় পড়ে বেড়িয়েছি। লেখাটা প্রথম বোধ হয় বেরিয়েছিল মোসলেম ভারতে নয় অন্য একটা সাপ্তাহিক, কি যেন নাম—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—বিজলীতে।

তার প্রতিভা ছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যাহ্নে তাঁর গণ্ডীর বাইরে অমন করে কেউ দাঁড়াতে পারেনি, তবে তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হল কই?

সব কিছুই একটু করে করলে অথচ কোনটাই ভাল করে করলে না। বেশ ছিল আমার কাছে, ঝপাক করে গিয়ে ঢুকল প্রবোধের ওখানে। অবশ্য ওর কি অসুবিধে হচ্ছিল তা আমি জানি।

দিল্লীতে আজিজুল হক নিয়ে গিয়ে কোনরকম সাহায্য করলেন না, আমিও চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুই হল না। উত্তরবঙ্গের জমিদার দু'ভাই—কি নাম যেন? (বুড়ো বয়সের সঙ্গে এই হয়েছে দোষ—নাম ভুলে যাই।)

ওদের মধ্যে বেঁটে কে? দু'জনেই অবশ্য লম্বা, তারই মধ্যে বেঁটে যে তাকে সাহায্য করতে বলাতে, বললে, কেন করব? (এক চিত্র প্রতিষ্ঠানের নাম করে) ওরা টাকা দিচ্ছে, ওদের হয়ে করছি।

প্রশ্ন করলুম, টাকা নাও তোমরা?

বললে, সবাই যখন নেয়, আমিই বা নেব না কেন?

দিল্লীর দরজায় দরজায় ঘুরে এই জ্ঞান হয়েছে কিছু জানেনা ওরা, ওদের না সরালে মঙ্গল নেই। তবে 'কমু'দের দিয়েও কিছু হবে না।

দেবুদা'র দেশ মেদিনীপুরে আর মেদিনীপুরে ওঁর মামার বাড়ি। কিছুদিন আগে দেবুদা মেদিনীপুর থেকে ঘুরে এসেছেন। সেখানকার কে ওঁর সম্বন্ধে কি বলেছে বলায়, উনি বললেন—একটানা মেদিনীপুরে কখনও থাকি নি, গরমের ছুটিতে আর পুজোর ছুটিতে দাদামশায়ের কাছে বেড়াতে যেতুম, বাবা মারা যাবার পর মা অবশ্য ছোটদের নিয়ে ওখানে ছিলেন লেখাপড়া শেখানোর জন্যে, তা কারো লেখাপড়াই হল না। তারাকুমার পোস্টাপিসে ঢুকে পড়ল। আমি কলকাতাতেই থাকতুম। আর বিশুও আমার কাছেই ছিল। পনের থেকে সতের সালের ভেতর একটা ওলটপালট হল।

মেদিনীপুরে থাকার সময়েই যোগজীবনদের সঙ্গে খুব ভাব হয়। ক্ষুদিরাম, যোগজীবন, বিনয়ের দাদারা সব অনেক কিছু করেছিল; পর পর তিন-চারজন ম্যাজিস্ট্রেটকে মারল, সবাই ফাঁসি গেল।

বিনয়কে সেদিন দেখলুম, ডেপুটি সেক্রেটারী হয়েছে। তাকে বললুম, তোমরা সব জলো হয়ে গেছ। মেদিনীপুরের ছেলেদের আগে কিছু পদার্থ ছিল, এখন আর কিছু নেই। আবার সব 'কমু' হচ্ছে।

ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকেই নিজের মতামত গড়তে দেওয়া উচিত। আর তার জন্যে প্রচুর বই পড়তে দেওয়া দরকার।

পড়ানর মাষ্টার আপনিই পাওয়া যাবে। আমাদের ছেলেবেলায় একটা cultural atmosphere ছিল। ছোট থেকে কত বই যে পড়েছি! আমারই শেখা হল না, কিন্তু ভায়েরা সবাই গান শিখেছিল। বিশু তো ভালোই গাইত, পুতুও ভালো গাইতে পারত; কিন্তু বাইরের লোকের সামনে গাইত না, বাড়ীর লোকের কাছেই গাইত।

উনিশ থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত খুব পড়েছি। তখন সব রকম পত্রিকা নিতুম আর বইও কিনতুম। Times Literary Supplement থেকে ভালো বইয়ের খোঁজ পেতুম। তারপর থেকে কিছু বিশেষ পড়া হয় নি। অবশ্য ওদেশেও ভাল বই বেরুন বহুকাল বন্ধ হয়েছে।

এবার এলেন মালিনী-প্রসঙ্গে; বললেন—মালিনী রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যেতে পারে। ওঁর আর একখানি ভালো নাটক তপতী। বাকি সব কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রচলিত নাট্যধারার ছাপ তো আছেই। বিসর্জন দেখ, রাজারাণী দেখ।

উনি খুব থিয়েটার দেখতেন, তবু লোকেরা বলবে, উনি কালেভদ্রে থিয়েটার দেখেছেন। শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারে দু'চারবার গেছেন। অথচ তার উলটো প্রমাণ ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে রয়েছে।

বোধহয় চতুর্থ পত্রেই আছে পার্লামেন্ট দেখার কথা। সেখানে উনি বলছেন, আমাদের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্টেজের দু'পাশের দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে পোশাক-পরা দু'চারজন লোক বেরত, তাদের ভাব দেখে মনে হত যেন বলছে, কি হবে তা আমরা জানি। পার্লামেন্টের নফররা অনেকটা ওই রকম ভাব নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

তখন মাত্র ওঁর আঠার বছর বয়েস। কাজেই থিয়েটার দেখতে উনি তখন থেকেই পোক্ত ছিলেন বোঝা যায়। (আবার আমি বলছি বলে কথাগুলো হয়ত পরের সংস্করণে তুলেই দেবে।)

মালিনী বোঝা তো খুব কঠিন নয়, ওই যে 'পরমক্ষণ' বলছে প্রথমেই, ক্ষমা করো ক্ষেমঙ্করে—এখানটাই সেই পরমক্ষণ এল আর তার প্রেমধর্ম জয়ী হল। মালিনীর সুপ্রিয়র ওপর একটু ঝোঁক পড়েছে। ভালবাসা এই কথাটা জোর করে বলতে পারব না, বরঞ্চ মনে একটা ছায়া পড়েছিল এইটুকুই বলা যায়।

সেটারও একটা innuendo আছে মাত্র। তবে যদি বল মালিনী ক্ষেমঙ্করকে দেখে ভালবেসে ফেলেছিল, তবে সেটা ভীষণ ভুল করা হবে।

মালিনী অবশ্য সাধারণবোধ্য নয়। ওর যেটুকু popularity তাও কিন্তু আমার জন্যে। যে অ্যামেচার দল বইয়ের কথা জানতে এসেছে, তাকেই বলেছি দু'টো নারী চরিত্র আছে, তোমরা মালিনী কর, বেশ ভালো বই। উনিশ শ' আটত্রিশ সালেই বর্ধমান রাজ কলেজের মেয়েদের দিয়ে করালুম। উত্তরপাড়া কলেজের ছেলেদের দিয়েও করিয়েছি, তবে public boardএ হয় নি। বড্ড ছোট, দেড় ঘণ্টার বই। সবাই বললে আবার একটা শঙ্খধ্বনি হবে। শঙ্খধ্বনি বই ভাল হলে কি হবে পয়সা দেয়নি যে; তাছাড়া মালিনীর সিন-টিনে হাজার চারেক টাকা লাগবে, তাই সবাই পেছিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন্ বই পড়া যায়, এ সম্বন্ধে বললেন—রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী পড়া যেতে পারে। রক্তকরবী একসঙ্গে সবটা না পড়লে অসুবিধে হয়। ওই বইটার মধ্যে একগাদা idea আছে, বলতে চেয়েছিলেন মাঠে চাষ করে ফসল ফলান, পাঁচিল তুলে মাটি খুঁড়ে তাল তাল সোনা তোলার চেয়ে অনেক ভাল। বইয়ের শেষ কথা হল, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে। কিন্তু লিখতে গিয়ে বুরোক্রেসির ওপর ওঁর যে সব ক্ষোভ ছিল তা পিলপিল করে ঢুকে পড়ল। মালিনী কিন্তু খুব ভালো নাটক হয়, ক'টি ভাল ছেলেমেয়ে দাও, রিহার্সাল দিতে দিতে তোমাদের যার যা প্রশ্ন আছে তার উত্তর পাইয়ে দেব।

বাংলা নাটক অন্ততঃ পঞ্চাশখানা পড়া যায়, গিরিশবাবুরই চল্লিশখানা আছে পড়ার মত বই। ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ খুব ভালো বই। দ্বিজু রায়ের ভীষ্ম মোটেই ভালো বই নয়। ক্ষীরোদবাবুর ভীষ্ম অনেক ভালো, ওঁরটা মোটেই দ্বিজুবাবুর দেখে লেখা নয়। দ্বিজুবাবুর তো অনেক পরে লেখা। একজন প্রস্তাব করলেন—ইংরেজি বই, বিশেষ করে সেক্সপীয়রের বই পড়ুন না।

উত্তরে বললেন—ইংরেজি বই পড়তে পারিনা, প্রথমতঃ দাঁতটা খুলে যায়, তাছাড়া অনেককাল পড়া অভ্যেস নেই, দম পাব না।

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রসঙ্গে বললেন—রচনাবলী আমার মোটেই পছন্দ হয় না, ওটা চারু ভটচাজের করা।

[মালিনী-র পর রবীন্দ্রনাথের আর কোন বই পড়া হল না, বলেছিলেন পরে এক সময় রক্তকরবী পড়ে শোনাবেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর মুখে রক্তকরবী পড়া ও তার বিশ্লেষণ শোনা হয় নি।]

॥ ৬ ॥

এবার ঠিক করলেন পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কোন বই পড়বেন। ওঁর আলমগীর নিয়েই শিশিরকুমার প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেন। কাজেই ওঁর সম্বন্ধে মনে মনে হয়ত কিছু দুর্বলতা ছিল। কিন্তু নাটক পড়ার সময় বললেন ভীষ্ম পড়বেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ভীষ্ম পড়তে এলেন। এই সাত দিনের মধ্যে অনেক দিনের পর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এখনকার সভ্যদের সঙ্গে বিজয়া করেছেন। পুরানো পরিবেশে তাঁর অভিনয় দেখতে ভীষণ ভীড় হয়। প্রথমেই সেই কথা বললেন—ইনস্টিটিউটে খুব ভীড় হয়েছিল, তা দু'তিন হাজার লোক হবে। হাওয়া বেরোবার রাস্তা পর্যন্ত নেই, ভীষণ অবস্থা। বললুম—এ যে death trap করেছ। ঢাকায় একবার ঐ অবস্থায় একদিনে দু'খানা বই করার পর অজ্ঞান হয়ে যাই। শেষ দৃশ্যে শেষ কথা বলার পরই আমাকে তুলে আনতে হয়, ডাক্তারও ডাকতে হয়েছিল। ঢাকায় আমি বেশ ভাল পয়সা পেয়েছি। ওখানকার ব্যবস্থা যিনি করতেন, ভদ্রলোকের নামটা মনে নেই, তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল খরচ খরচা বাদ দিয়ে ৩০—৭০ ভাগ হবে। তা যা দিতেন তাই নিতুম, তবে তাও খুব কম নয়। একবার পাঁচ রাত্রির জন্যে রীতিমত নাটক করতে গেছি, পাঁচ রাত করার পরও করতে বললেন।

বললুম—তা কি করে হয়? শনি-রবিবার কলকাতায় করবার কথা রয়েছে। তাতে বললেন—কত বেশী দিতে হবে?

কলকাতায় তখন মোটে বিক্রী নেই, কাজেই কিছু বেশী দিতেই আরো তিন রাত করলুম।

সেটা ১৯৩৭-৩৮ সালের কথা। তখনও খুব বুড়ো হই নি। একদিনে তিন জায়গায় বক্তৃতা। তার মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও একবার ছিল। তার পর ৬টা থেকে ৯টা, আবার ৯টা থেকে ১২টা দুটো নাটক করেছি। অবশ্য তার ফলে কষ্ট যা আমাকেই পেতে হয়েছে। কমবয়সীদের বিশেষ কিছুই হয়নি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভারি মজা হয়েছিল। আমায় আবৃত্তি করতে বললে। একটা কবিতা দু'চার লাইন পড়ার পর বললুম, এইটে বলব? সবাই সমস্বরে

চেঁচিয়ে ওঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পড়ুন। বললুম—কোন বইতে আছে বল? তা সবাই চুপ। এমনি বার কয়েক হবার পর তখন যিনি ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন—মুসলমান ভদ্রলোক, নামটা বোধ হয় রহমান, হ্যাঁ রহমান, বললেন, তুমি যা হয় আবৃত্তি কর, ওদের আর leg pull কোর না। সেদিনকার উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে মোহিতলাল, সুশীল দে এরা সব ছিল। এদের যে বইগুলো পড়া ছিল না এমন নয়। কিন্তু আসল কথা কি জান, হঠাৎ একটা কথা জিজ্ঞেস করলে সব নার্ভাস হয়ে পড়ে; তাছাড়া যে বইগুলো ছাত্রপাঠ্য সেগুলো ছাড়া অন্যগুলোর ভালো করে চর্চাই থাকে না।

অবনবাবুর স্মৃতিসভায় সভাপতি হল তারাশঙ্কর। তা নামকরা লোক না ডাকলেই বা চলে কি করে! আমাদের আবার এ এক নতুন রোগ হয়েছে, বছর বছর শ্রাদ্ধ করা। ওদের দেশে অমন হয়না, এক সেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে ছাড়া। তা তারও করে টাকা পায় বলে।

ইস্কুলে-পাঠশালে ভালো করে ছেলেমেয়েদের পড়ান দরকার। এখন তো তারা কিছু শেখেনা। গিরিশবাবু নাটক লিখতে শুরু করলেন যখন আর নাটক পেলেন না। তিনি সব কিছু পারতেন তো। বিরাশীখানা নাটকের মধ্যে শেষ ১০ বছরে ৫ খানার বেশি লেখেন নি। বাকি সাতাত্তরখানা ১৮৮২ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে লিখেছেন। তার মধ্যে কতকগুলো অবশ্য ভালো নয়।

একজন মন্তব্য করলে—প্রফুল্ল তো একটা অস্বাভাবিক বই।

বললেন—প্রফুল্ল-কে অস্বাভাবিক বলছ, অস্বাভাবিক কোনখানটা বলতে পার? ঐ যে মন্দা মেয়েটা—কি নাম যেন, জগমণি না চিন্তামণি, হ্যাঁ জগমণি অস্বাভাবিক, রমেশ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যেদোকে তো ও মারতে চায়নি, but the leader is sometimes led, জগমণি কোম্পানীর জন্যেই তো মারতে গিয়েছিল। তাও শেষ পর্যন্ত বললে—দাও, এক ফোঁটা জল দাও।

এই সময় একটু আলোচনা হল, যার মূল কথা হল—সমাজের values যখন rapidly change করছে, তখন চিরন্তন নাটক রচনা সম্ভব নয়। সবায়ের কথা শুনে বললেন—তোমরা বলছ আজকের এই changing values-এর সময় চিরন্তন নাটক লেখা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সেক্সপীয়র আজও popular কেন? ওদের স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন-এ এখনও এত টাকা আয় হয় যে কল্পনাও করা যায় না।

ওঁর অভিনীত জীবনরঙ্গ নাটকটা সদ্য ছাপা হয়েছে, তার কথাতেই বললেন

—জীবনরঙ্গ নাটক হিসাবে খুব ভালো কিছু নয়, কিন্তু অভিনয়ের সময় জমে। নাটকটা যেমন অভিনয় হয়েছিল, তেমন ছাপা হয়নি। ছাপাটা তো আর আমার হাতে নয়। কাটা বইটা আমার কাছেই ছিল, কিন্তু আমাকে তো বলেনি, তা হলে না হয় দেখেশুনে দিতুম। নাটকটা বড্ড বেশী ব্যক্তিগত।

নাটক আর আজকের দিনে লেখা হচ্ছেনা। গিরিশবাবুর নাটক খুব ভালো নয় বটে, কিন্তু দ্বিজুবাবুর সামাজিক নাটক তার চেয়েও খারাপ। অথচ ওরকম নাটকই-বা লেখা হচ্ছে কই?

জীবনরঙ্গ-এ নায়ক শচীন তার স্ত্রী চলে গেছে এই কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলছে বলে একজন অনুযোগ করলে, ওখানটা কি সহজ করে বলা যেত না?

বললেন—বৌ বেরিয়ে গেছে—বলতে পারলে কথাটা খুবই জোরালো হয়। তবে, বলতে না পারাটাও খুবই স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে বৌ-এরা বের হয়ে যায় না, তাদের বের করে দেওয়া হয়। মোহের বশে আমাদের মেয়েরা ক'জন ঘর ছাড়ে? বরং শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে অনেক বেশী মেয়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়।

পশ্চিমের দেশে মানুষ individualistic অনেক বেশি আর আমাদের দেশে family unit অনেক বেশি দৃঢ়। ওদের ছেলেমেয়েরা ১৭।১৮ বছর বয়েস হলে আর বাপের ভাত খায় না। আমাদের দেশের ছেলে সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও বলে, এখানে বলে দাও, ওখানে বলে দাও। না বলে দিলে চলবে কি করে?

একটু থেমে হঠাৎ বললেন—একটা নাটক লেখা উচিত মাঝবয়সী কোন মেয়েকে নিয়ে। সারাজীবন সে ত্যাগ স্বীকার করেছে স্বামী-ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে, এখন আর তার কোন কাজ নেই; সে শুধু দু'টো কথা শুনতে চায়, স্বামী-ছেলেমেয়ের জন্যে যা করেছে তা যে তারা জানে এইটুকুই বুঝতে চায়। আর একটা নাটক লেখা যায়, একটি বুড়ো মানুষের নিঃসঙ্গতা নিয়ে।

নিজের কথায় এলেন এবার—অভিনয় করার ঝোঁক আমার বরাবরের। তখনকার নাটকের production-এর দোষগুলো আপনা থেকেই মনে হয়েছে আর দূর করতেও চেষ্টা করেছি। কিন্তু পেশাদার মঞ্চে নাবব এ ইচ্ছে কখনও হয় নি। পেশাদার মঞ্চে নাবাটা সম্পূর্ণ accidental.

আর একজন নিজে অভিনয় না করলেও অভিনয় বুঝতেন। অভিনয়ের দোষ-ত্রুটি বুঝিয়ে দিতেন, তবে মানুষটি বড় conservative ছিলেন। বিলেত-

বিলেত যাওয়া পছন্দ করতেন না। স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়াও তাঁর পছন্দ ছিল না। অবশ্য রিসেপশনে এসেছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল না।

শরৎদা'র নাটক তো বেশ ভালো চলত। ওঁর একটা নাটক আছে, নাম বলব না—অপূর্ব। তাতে বেশী বয়েসের আমার জন্যে বেশ ভালো একটা পার্ট আছে।

এবার ভীষ্মের প্রসঙ্গে এলেন—ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম দ্বিজুবাবুর ভীষ্মের চেয়ে অনেক ভালো। দ্বিজুবাবুর পৌরাণিক বইগুলো কোনটাই প্রায় আমার ভালো লাগেনি, এক পাষাণী ছাড়া। ঐটাতেই অভিনয় করেছি। ভীষ্ম হিন্দু হোস্টেলে অভিনয় করিয়েছি, আর তখন ভালো লাগেনি বলেই ইনস্টিটিউটে বা মঞ্চে অভিনয় করি নি। মন্টু অনেকবার বলেছিল, তাও করি নি (কারণটা অবশ্য বলব না)। ক্ষীরোদবাবুকে চালাতে পারলে খুব বড় নাট্যকার হতে পারতেন। সংস্কৃত তো বেশ ভাল পড়া ছিল—কালী সিংহির মহাভারত পুরোপুরি কণ্ঠস্থ ছিল, তাই তো বলেছিলুম কৃষ্ণের মহাপ্রস্থান লিখতে।

ওঁর নরনারায়ণ সত্যিকারের ভালো বই। বললে ভাববে গর্ব করছি, কিন্তু নরনারায়ণ সবটা আমার বাড়িতে বসে লেখা। ওখানে খাওয়া-দাওয়া করেছেন, বসে বসে লিখেছেন আর আমরা তিনজনে কেমন হয়েছে বলেছি। ওঁর লেখা পোস্টকার্ড আমার কাছে আছে, বলেছেন—যা ভালো বোঝ কর।

হঠাৎ বললেন,—নতুন কপিরাইট আইনে কি গোলমাল কেটেছে? শরৎদা'র বই করা যাবে?

আবার ক্ষীরোদপ্রসাদ-প্রসঙ্গে ফিরলেন—একবার আমরা পুরুলিয়া যাচ্ছি, উনি বললেন,—আমি তো বাঁকুড়া যাব, আমায় একটা টিকিট কেটে দাওনা ভায়া!

চললেন আমাদের সঙ্গে। গাড়ীতে খাবার হালুয়াটালুয়া চেয়ে খেলেন, তারপর বললেন—এ তো বেশ ভাল ব্যবস্থা, আমিও কেন তোমাদের সঙ্গে পুরুলিয়া যাইনা ভায়া। রাত তিনটের সময় বাঁকুড়ায় আর নামলেন না।

উনি ছিলেন আবার কৌল-তান্ত্রিক। আমারও তখন ঐ দোষই বল আর গুণই বল ছিল। সেদিন রাতে আমার থেকে ভাগ নিলেন। তারপর পুরুলিয়ায় নেবে সনৎকে বললেন—দেখো ভায়া, আমার জন্যে একটু আলাদা নিরিবিলি জায়গা দিও, আর একটা বোতলের ব্যবস্থা কর—একটু মায়ের পুজো করব। তোমরাও ভোগ পাবে।

১১ই সেপ্টেম্বর ভীষ্মের শেষ অংশ পড়তে এলেন। প্রথমে ঘরে ঢুকেই বললেন

—ঘরটায় ঢুকলেই কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ লাগে, অবশ্য হাওয়া বেরোবার রাস্তা নেই তো। পুবদিকে একটা জানলা কর না কেন?

বলা হল পেছনে বাড়ি আছে। একটু আশ্চর্য হলেন—পেছনে বাড়ি? একটা গলি ছিল না?

জানালাম গলিটা বাড়িটার পরেই। আপন মনেই বললেন—তা হবে। রাস্তা সব ভুলে গেছি। অথচ এককালে রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে বহুদিন ছিলুম।

এবার আমাদের বললেন—কলকাতা সহরটা ঠিকভাবে বাড়তে পেল না ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট করে প্রথমেই সাবার্বসে জমি কিনে বাড়ি-টাড়ি বানানো উচিত ছিল। তা নয়, প্রথমেই গেল বড়বাজার অঞ্চলে, সেণ্ট্রাল এভিনিউ তৈরি করতে।

দু'-চারদিন আগে কাগজেই দেখেছিলাম অথবা নিজেদের মধ্যে তর্ক হয়েছিল —মনোমোহন থিয়েটার বর্তমান বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিস প্রাঙ্গণে না সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এর ওপর। ওঁকে এ সম্বন্ধে মধ্যস্থ মানা হল। বললেন—মনোমোহন থিয়েটার ছিল এখন যেখানে সেণ্ট্রাল এভিনিউ মিশেছে বিডন স্ট্রীটের সঙ্গে, তারই উত্তর অংশে, বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিসে ছিল বেঙ্গল ন্যাশনাল থিয়েটার।

ঐটাই একমাত্র থিয়েটার যা গিরিশবাবুকে বাদ দিয়েও চলেছে। ওরা বেশ পয়সাও করেছিল, বিশেষ করে এলোকেশীর গল্প নিয়ে নাটক লিখিয়ে।

ওটা ছিল ছাতুবাবুদের জমি, থিয়েটারটাও ছিল ওঁদেরই। ক্ল্যাসিক যাবার পর অমর দত্ত ওখানে কিছুদিন অভিনয় করেছিলেন। ক্ল্যাসিক ছিল মনোমোহনের পুরানো নাম, তারও আগে ওর নাম ছিল এমারেল্ড থিয়েটার।

আগের দিনই বোধ হয় ট্রাম কোম্পানী ভাড়া বাড়ানর নোটিশ দিয়েছে, তারই প্রসঙ্গ তুললেন,—দেখ দেশাত্মবোধ আমাদের হয় নি। এই দেখ না, ট্রাম ভাড়া বাড়ানর কথায় সরকারের ব্যবহারটা কেমন নীচতার পরিচায়ক। সরকার না জানলে কি ট্রাম কোম্পানী হুট করে ভাড়া বাড়িয়ে দিতে পারে?

আমাদের এই দান-পাওয়া স্বাধীনতার জন্যেই আমরা দেশকে বড় করে দেখতে শিখলুম না। একজন লোককে ডেকে বললে—ওহে আমরা চললাম, ভার নেবে তো নাও, আর ভার নিয়ে নিলে। তাতে কি আর কিছু হয়? স্বাধীনতা যদি বিপ্লবের পথে আসত তো ফল ভালো হত। দু'চার জন 'কমু' বলে তারা বিপ্লব করবে, কিন্তু তারা কিছু করতে পারছে না।

কোন কিছু করতে হলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকা চাই। রাস্কিন না কার কথা

আছে—হাজার বছরে এমন একজন মানুষ আসে যার জন্যে দেশ, সমাজ, ধর্ম, ধর্মনায়ক সবাই পথ করে দেয়—আমার সে ভাগ্য ছিল না। চার্চিলের সে ভাগ্য ছিল। নেপোলিয়ন লোকটা খুবই পাজি ছিল—কিন্তু তাকেও সারাটা জীবন বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে।

ধর্মের চেয়ে দেশ বড়। নিতাই ভটচাজকে বললুম, ঐ নিয়ে একটা বই লিখতে। Religion বলতে যা বোঝায় ধর্ম তো ঠিক তা নয়। ধর্ম অর্থে ধারণ করা। নাটকের কাহিনীটা বলেছিলুম হিন্দুধর্ম-বৌদ্ধধর্মের সংঘাত নিয়ে। একদল ডেকে পাঠাল শক, হুণকে—শেষ পর্যন্ত একজন সেনাপতির মুখে মূল কথাটা বলে দেওয়া। মানে ধর্মের চেয়ে দেশ বড় একথাটা ঠিক বলা হল না, কিন্তু ভাবটা থাকল! তা সে পারল না। একজন সত্যিকারের ভালো নাট্যকার পেলুম না! এক হতে পারতেন ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ—যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল তাঁর, বুদ্ধিও ছিল কিন্তু চালাতে হত। তিনজনের জন্য তা হলনা—ওঁর দুই ছেলে আর মহেন্দ্রবাবু।

মহেন্দ্রবাবু আমার আত্মার আত্মীয় ছিলেন। তাঁর কাছে আমার ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই। খুব ভালমানুষ ছিলেন, মনোমোহন পাঁড়েকে দাদা বলতেন বলে নালিশ পর্যন্ত করলেন না। তাঁর নিমন্ত্রিতার বাড়ীতে গিয়ে আরাম করে আসে নি এমন অভিনেতা তখনকার দিনে ছিল না। কিন্তু হলে কি হবে, নাটকের তিনি কিছু বুঝতেন না।

ওই তিনজনের জোরে ক্ষীরোদবাবু ভাবলেন—কে ভেড়ের ভেড়ে শিশির ভাদুড়ি যে তার কথা শুনতে হবে।

ক্ষীরোদবাবুর আলমগীর পাবার গল্প ভারি মজার। বইটা অপরেশবাবু নিয়েছিলেন। মদন কোম্পানীর ওখানে আমি কোন বই-ই পছন্দ করছিনা, ওরাও আমাকে তাড়াতে তৈরি; এমন সময় মহেন্দ্রবাবু বললেন—ক্ষীরোদবাবুর নাটক প্লে কর।

খোঁজ করাতে উনি বললেন, বই ত আছে, কিন্তু সেটা যে অপরেশবাবুর কাছে রয়েছে। বললুম—পড়াতে পারেন?

তাতে উনি বললেন—লেখা তো আমার কাছেও আছে।

পড়া হল, খুব খারাপ লাগল না। ওঁকে বললুম—কিছু বদলান দরকার।

বললেন—না ভায়া কেটো-টেটোনা।

আমি আর ললিত মিলে বেশ করে কাটলুম। তখন বইটার নাম ছিল

ভীমসিংহ। এখন যা লেখা আছে তাছাড়া আরও চারটি দৃশ্য ছিল—ভীমসিংহ জয়সিংহের ঝগড়ার কারণটা তাতে বর্ণনা করা ছিল। রাজসিংহ যে মহিষীর প্রেমে পড়ে অন্যায় করেছিলেন তারও বর্ণনা ছিল।

যাই হ'ক, অভিনয় করার ব্যবস্থা হল। মহেন্দ্রবাবু পাঁচশ' টাকা দিয়ে right কিনে নিলেন! কিন্তু সবাই বললে—ও বই দাঁড়াবে না। কিন্তু প্রথম দিনেই স্বপ্ন দৃশ্য থেকে বইটা আলোড়ন তুলল।

মহেন্দ্রবাবুর গলা খুব ভালো ছিল। আজকের দিনে আমার ছাড়া অমন গলা কারও নেই। তবে সামাজিক নাটকে খুব সুবিধে করতে পারতেন না। গলা ছিল অমৃত মিত্তিরের। অনেক বয়েসেও গলা একই রকম ছিল। তবে খেলাতে পারতেন না। ওঁর তুলনায় গিরিশবাবুর গলা নিরেশ ছিল। তবে, অমৃত বোস মশায় বলেছিলেন—বয়েস কালে গিরিশবাবুর গলা তো শোন নি ভায়া! অমৃতর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। কিন্তু তিনি যে গলা দিয়ে দিয়েছিলেন। লোকে যেমন জগন্নাথকে ফল বা হাত দেয়, উনি তেমনি গলা দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় অত্যধিক মদ্যপানে গলা নষ্ট হয়েছিল তাঁর।

অমৃতবাবু আবার ঐসব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাস করতেন। গিরিশবাবু ওঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন না, ছিলেন spiritual গুরু। ওঁর হাঁটুতে হাত দিয়ে কি সব যেন ঘটিয়েছিলেন। উনি আবার আমায় খুব স্নেহ করতেন। বলতেন—সব কথা তোমাকেই বলে যাব। তুমিই তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

আমাকে স্নেহ করার কারণ ছিল। আমি ছাড়া তো ওঁকে কেউ ডাকেনি। নাট্যমন্দির খোলার পর, দোল পূর্ণিমার রাতে বসন্তলীলা অভিনয়ে ওঁকে নিমন্ত্রণ করে কপালে ফাগ মাখিয়ে দিলুম স্টেজে ঢুকিয়ে। দানীবাবুকেও ডেকে এনেছিলুম, কিন্তু তিনি স্টেজে নামলেন না। বললেন—আমি কিন্তু থাকব না, আমার কাজ আছে। পেছনে আবার হাফপ্যান্ট দাঁড়িয়ে, বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ ওঁর কাজ আছে। গিরিশবাবুদের সময় গিরিশবাবু, দুই অমৃত আর অর্ধেন্দুবাবু ছাড়াও দু'-পাঁচজন অভিনেতা ছিলেন যাঁদের ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু অশিক্ষিত-পটুত্ব ছিল। আমার ভাই তারাকুমারেরও ঐ পটুত্ব ছিল। একটা ভূমিকা দু'চারবার পড়ার পরেই জিনিসটা বুঝতে পারলে করতে পারত। অভিনেতার কতকগুলি মূল বিষয় জানতে হয়। প্রথম কথাই হচ্ছে, ভূমিকাটার অর্থ ধরা আর সেই অনুযায়ী অভিনয় করা। এর জন্য কিছু লেখাপড়া করা দরকার। আগেকার দিনে লেখাপড়ার চর্চা অনেক বেশি ছিল। আমাদের বাড়িতে এত বেশি ছিল যে

অল্প বয়সেই বেশ পাকা হয়ে উঠেছিলুম। আমার এক মাষ্টার ছিলেন—বি-এর ছাত্র, আর এক দাদা ছিলেন যাঁর কাজ ছিল বি-এ ফেল করা।

শৈলেন (চৌধুরী) ভালো অভিনেতা ছিল। কিন্তু ক্ষমতা চরমে ওঠার মুখেই মারা গেল। বিশুও বেশ ভালোই অভিনয় করত।

ক্ষীরোদবাবুর কবিতা খুবই ভালো। রবীন্দ্রনাথের সমানই প্রায়। রবিবাবু আমাদের দেশের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারা, সমগ্র সৌরমণ্ডল বটে, কিন্তু পৃথিবীর চিন্তাধারায় তাঁর দান কতটা? শেলী আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের যা মূল্য আছে, রবিবাবুর লেখাতে কি তা আছে?

আমার এক আত্মীয়ও খুব ভাল অভিনয় করতেন, অথচ সামাজিক নাটকে সুবিধে হত না। কিন্তু অভিনয়ের প্রকৃত পরীক্ষা হয় সামাজিক নাটকে।

আমার বড়মামা বোলপুরে থাকেন, ওঁর খুব কবিতা পড়ার ঝোঁক। সেদিন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির বই পাঠালুম—তা পড়ে লিখেছেন—কি সুন্দর লেখা, আজকাল তো কই এমন লেখা হয় না!

দ্বিজুবাবুর লেখার দোষের কথা বললে মণ্টু আবার দুঃখ করবে। কিন্তু ক্ষীরোদবাবুর ভীষ্ম মহাভারতের অনুসরণ, কাজেই বেশ ভালো লেখা হয়েছে। লেখাটা যদিও সবটাই কবিতা নয়, তবু মাঝে কিছুটা অংশ সত্যি সত্যি কবিতা হয়েছে। নরনারায়ণ তো আরও ভালো লেখা।

ক্ষীরোদবাবুর রঘুবীর মদন কোম্পানীতে করিয়েছিল। খুব ভালো সাজগোজ করিয়েছিল, রঘুবীরকে মাথায় পালক-টালক পরিয়েছিল, কিন্তু রঘুবীর যে ব্রাহ্মণ সে কথা ভুলে গিয়েছিল।

একজিবিসনে সীতা করার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। বইটা ইনস্টিটিউটে করাবার কথা হয়েছিল। কিন্তু রিহার্সালের দিন তিন-চারজনের বেশী কেউ এল না। ইতিমধ্যে একজিবিসনের কর্তারা এসে বললেন—সাত দিনে চারটে বই করতে হবে। আমি জানি ওসব হবে-টবে না। সীতাই রিহার্সাল দিলুম। স্টেজ কিন্তু খুব ভালো সাজানো হয়েছিল। দৃশ্যপট অপূর্ব হয়েছিল। প্রত্যেক দিন হল ভর্তি থাকত।

স্টেজে ১৯২৪ থেকে ১৯২৮।২৯ পর্যন্ত আমার বোধহয় কোন বই ফ্লপ করেনি। পাষাণীতে শেষ দিনেও সাতশ' (৭০০) টাকা বিক্রী হয়েছিল। কিন্তু অন্য কারণে অভিনয় বন্ধ করতে হয়েছিল।

[আগের কোন বই-ই দুদিনের বেশী লাগেনি, ভীষ্ম কিন্তু তিনদিন পড়তে লাগল। ১৮ই সেপ্টেম্বর পড়া শেষ করলেন বইটা।]

সেদিন প্রথমে এসেই বললেন, হাতটা বড় কষ্ট দিচ্ছে। আমরা বললাম—ডাঃ চন্দ্রকে দেখান না কেন?

বললেন—ডাঃ চন্দ্রর সঙ্গে দেখা করি না, ভদ্রলোককে শুধু শুধু ব্যস্ত করা হবে বলে। উনি মানুষ ভালো, রোজ রাত্তির দশটা সাড়ে দশটার সময় ওপরে ওঠার আগে আমার সঙ্গে গল্প করে যেতেন। এদিকে বিকেলে সাড়ে চারটার সময় কাজকর্ম সেরে ঘুমোতে যেতেন, উঠতেন সাতটা স'সাতটায়; তারপর আবার কাজ শুরু করতেন। কাজ তো খুবই করছেন কিন্তু শেখালেন কাকে? উনি যেমন অন্যলোকের কাছে শিখেছিলেন, তেমনি নিজের শিষ্যশ্রেণী করলেন কই? সায়েব ডাক্তাররা কিছু চেষ্টা এ বিষয়ে বরঞ্চ করেছিলেন। ওদের দেশে এ জিনিসটা অনেক বেশি আছে।

আমাদের দেশে সত্যিকারের বড় নাট্যকার হল না। ক্ষীরোদবাবু হতে পারতেন কিন্তু তাঁর জিনিয়াসরা হতে দিল না। ওঁর ছেলেরা তো নিজেদের জিনিয়াস বলে মনে করত। বোঝাত, এ দৃশ্য লেখ, ও দৃশ্য লেখ; এখানে এ কথা দাও, ওখানে ও কথা দাও; আর তুমি এত বড় নাট্যকার তোমায় কি না ভেড়ের ভেড়ে শিশির ভাদুড়ির কথা শুনে চলতে হবে!

লোকে বলে—আমি সেকেলে পুরানো বইতেই অভিনয় করতে ভালবাসি। কিন্তু আজকালকার দিনে নাটক কই? নতুন নাটক বলতে তো 'কমু'রা বোঝে নীলদর্পণ, কিন্তু নীলদর্পণ ত ১৮৭২ সালে অভিনয় হয়েছে।

গিরিশবাবুর শ্রীবৎসচিন্তা পড়ে দেখ, মনে হবে আজকের দিনের ঘটনা নিয়ে লেখা। অথচ মনে রেখ বইটা লেখা হয়েছে ১৮৮২-৮৩ সালে, ঠিক কোন্ বছরে লেখা হয়েছে মনে নেই, স্মৃতিশক্তি আজকাল বড় কম হয়ে যাচ্ছে।

ছেলেদের পড়াশোনা করান দরকার। তার জন্য মাষ্টার মশায়ের sincerity প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসাররাও sincere নন!

শশীবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন না, এখন রামতনু অধ্যাপক। আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে গেলেন ছেলেদের কাছে কিছু বলার জন্যে। গিয়ে দেখি শম্ভু বসে আছে। তাকে যে আমি আসব এ কথা বলা হয় নি বুঝলুম।

যাই হ'ক, আমি উঠে দাঁড়িয়ে দু'-চারটে বাঁধিগৎ দিলুম—ছেলেদের নাটক পড়া দরকার, যত নাটক পড়বে তত জ্ঞান বাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলার পর শশীবাবু এসে বললেন—চলুন এবার একটু চা-টা খাবেন।

বললুম—শম্ভু যাবে না?

তা ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—না মানে উনি এখন কিছু বলবেন। বললুম—কেন? শম্ভু আমার সামনে বলতে পারে না?

তা শম্ভু কিছু বললেও না। উঠে শুধু বললে—উনি যা বলেছেন তারপর আমার বলা সাজে না। উনি যা বললেন তাই করা দরকার।

এর পর আবার মহাপ্রস্থান-এর কথা উঠল, বললেন—এ বই লিখতে পারতেন ক্ষীরোদবাবু। গিরিশবাবু লিখলে অন্য রকম দাঁড়াত। সত্যেনবাবু যে মহাপ্রস্থান লিখেছেন তার সুরটা ছিল বড় চমৎকার।

আমরা প্রশ্ন করলাম—ওটা লেখাতে আপনি কিছু সাহায্য করেছিলেন কি?

বললেন—সাহায্য করেছিলুম কি না কি করে বলব বল, প্রমাণ কোথায়? বললে আমার কথা কে বিশ্বাস করবে? প্রমাণ অবশ্য সবই ছিল কিন্তু এমন সব লোক দিয়ে চারপাশে পরিবৃত ছিলুম, যে কারুকে দিয়ে কোন কাজই হয়নি। মহাপ্রস্থানের অভিনয়ের সাট আমার কাছে নেই, আর ছাপা বইটা অভিনীত নাটক থেকে অনেক পৃথক।

লীলাবসান করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাইশটা মেয়ে আর পেলুম না। তোমরা আমাকে তিন-চারটি মেয়ে আব সাত-আটটি ছেলে দাও, একটা কিছু করি। এত দিন ধরে কি আর করেছি, কত করবার ছিল। কত দিন আর বাঁচব! একটা বাড়ি দাও, কিছু করি।

পটল প্রথমে গান্ধারী করেছিল, ভালই করেছিল কিন্তু অন্যদের পছন্দ হল না। তাই দ্বিতীয় দিন থেকে নীহারকে দেওয়া হল। নীহার কিন্তু তত ভাল করেনি। প্রথম দিনেই কাপড়ে আগুন লেগে যাওয়ায় কি চেঁচামেচি, বলে—ভগবানকে শাপ দিয়ে, আমার এই দুরবস্থা। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণকে আমায় দিয়ে শাপ দেওয়ালে, কত বড় পাপ করালে।

ডাঃ অধিকারী এতক্ষণ চোখ বুজে সিগারে টান দিচ্ছিলেন—এবার গম্ভীর ভাবে শেষটুকু যোগ করে দিলেন—হ্যাঁ, বলেই হাউমাউ করে সে কী কান্না!

ভীষ্ম পড়া খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছিল। নিত্যকার মত চা খাবার পর কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। ডাঃ অধিকারী বললেন—কবিতা আবৃত্তি করুন না। একটু আপত্তি করে রাজি হয়ে গেলেন। পাশের ঘর থেকে পূরবী এল, তার থেকে সত্যেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতাটি পড়ে বললেন—এই

কবিতাটি অত্যন্ত সুন্দর। এর পর আবাহন কবিতাটি আবৃত্তি করে বললেন—কবিতাটিতে যে মানসসুন্দরীর কথা আছে তা কোন নারীর কথা নয়। কবির inspiration অনেক দিক থেকে আসতে পারে আর তারই রূপ হল মানসসুন্দরী।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় শেলীর প্রভাব বেশ দেখা যায়, কিন্তু গভীরতার দিক থেকে শেলী অনেক বড়। শেলীর Hymn to Intellectualityতে যে গভীরতা আছে রবিবাবুর লেখায় তা দেখা যায় না। লোকে অবশ্য বলে, রবিবাবুর গান আর গীতিকবিতা খুব ভাল, কিন্তু গভীরতার দিক থেকে তিনি পৃথিবীকে কতটা দিয়েছেন সে কথা কেউ বলে না।

রবিবাবুকে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা যত ছোট করেছে অন্যরা কেউ মোটেই অতটা করেনি। অমিয় চক্রবর্তী ত প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন রবিবাবুর লেখায় কিছু নেই।

ওরা আবার অন্য কাউকে সহ্য করতে পারত না। রবিবাবুর অসুখের সময় রাম যেত বলে একজন একদিন বলছে—রাম অধিকারীকে আবার কোথা থেকে জোটালেন? আমি পেছনে বসেছিলুম, ডেকে বললুম—কি হয়েছে তাতে? তা বললে, আপনি শিশির ভাদুড়ি না—বলেই সরে পড়ল।

আবার ভীষ্মের প্রসঙ্গে ফিরলেন—ভীষ্ম প্রথম অভিনয় হয় ১৯২২।২৩ সালে মনোমোহনে। প্রথমে হাম্বা (অম্বা) আর শিখণ্ডী করেছিল চারুশীলা—খুব ভাল করেছিল।

নরনারায়ণ আরম্ভ হয় ১৯২৬ সালের ১লা ডিসেম্বর। বুধবারে শুরু হলেও শনি-রবিবার অভিনয় হয়েছিল। বুধবারে আরম্ভ করার কারণ—প্রথম সপ্তাহে চারটি অভিনয় হতে পারত।

তখন বুধবার, শনিবার আর রবিবার অভিনয় হত। বুধবার আর শনিবার ম্যাটিনিতে অভিনয় হত। বৃহস্পতিবারে অভিনয়টা ত যুদ্ধের পর থেকে চালু হয়েছে। ঐ দিনটায় কাপড়ের দোকান-টোকান বন্ধ থাকে, তাই পপুলার হয়েছে।

নরনারায়ণের ভূমিকাটা ক্ষীরোদবাবুর মেজ ছেলে ভেকুর লেখা। ওতে ঘুরিয়ে আমাকে এক হাত নিয়েছে। ক্ষীরোদবাবুর সংস্কৃত জ্ঞান খুব ছিল, জায়গায় জায়গায় সংস্কৃত কথাগুলো খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছেন।

শচীনরা বলে, আমি ক্ষীরোদবাবুর ওই সব ট্র্যাশ করি আর ওদের লেখা

করি না। কিন্তু ক্ষীরোদবাবুর লেখার মধ্যে কত ভাল জিনিস আছে তা ওরা দেখে না।

থিয়েটার প্রসঙ্গে—স্টেজের ডেপথ থাকা দরকার। মিনার্ভায় আগে ছিল ৪৫ ফুট, এখন কমিয়ে দিয়েছে। অন্ততঃ ৬০ ফুট গভীরতা থাকলে তবে নাটক ভাল করা যায়।

একজন বললে—আমেরিকার ব্রডওয়েতে কোন কোন স্টেজের গভীরতা ১০০ ফুট। বললেন—অতটা দরকার হয় না। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল থিয়েটার প্ল্যানে দেখেছি ডেপথ বোধ হয় ৭০ ফুট। তবে ১০০ ফুটের মধ্যে বোধ হয় ৪০ ফুট একটা রিভলভার (ঘূর্ণায়মান মঞ্চ) রাখবে। তাহলে সামনে ৩০ ফুট, মাঝখানে ৪০ ফুট রিভলবার আর পেছনে ৩০ ফুট খুব খারাপ হবে না। পেছনে অনেকটা জায়গা থাকার সুবিধে হল, সিনারি স্ট্যাক করা যায়।

যাবার সময় ঠিক হল পরের দিন নরনারায়ণ পড়বেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর এসে সুরু করলেন বিজয়ার কথা। বললেন—বিজয়া "মিসট্রেস অব রাজিনা কোর্ট" থেকে নেওয়া বা ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত।

গৃহদাহও খুব ভাল বই। একটা জায়গায় শুধু একটা গোলমাল আছে।

এই যে বড় লোক, বড় বড় বাড়ি ঘরদোর—এর একটা আকর্ষণ আছে, চিরকাল থাকবে—শরৎবাবুর এই কথাটা হিন্দু সমাজের সম্বন্ধে ষোল আনা প্রযোজ্য।

এবার নরনারায়ণ সম্বন্ধে কথা তুললেন—বইটা খুবই ভাল কিন্তু ছেলেদের জন্যে গোলমাল হয়ে গেছে। এই দেখ, আমার কাছে ওরিজিন্যাল লেখা রয়েছে আর এই বই—মিলিয়ে দেখ যেখানে সেখানে দু-চার লাইন ঢুকিয়ে দেওয়া আছে। এমন কি, চোদ্দটা অক্ষর করার জন্যে দু-একটা অক্ষরও ঢুকিয়েছে। এগুলো ওঁর জিনিয়াস পুত্রদের কাজ। যখন যেখানে যা পেরেছে লিখিয়েছে।

নিজের কথা বলতে লজ্জা করে, কিন্তু আমার থিয়েটার না থাকলে ক্ষীরোদদা ও বই লিখতে পারতেন না। উনি তো আরও বই লিখেছেন—আলমগীর, রঘুবীর, ভীষ্ম—কিন্তু কোন বইটাকে মেনটেন করতে পেরেছেন? এর জন্যে দুদিন ওকে আবদ্ধ করে রাখতে হয়েছিল।

এর পর হেনরী আরভিং-এর কথায় বললেন—মার্টিন হার্ভে আর লুই বালা বারো বছর অ্যাপ্রেন্টিস থাকার কথা লিখেছেন, এর মধ্যে পেয়েছেন মাসে ২ পাউণ্ড থেকে ৫ পাউণ্ড। বারো বছর ধরে অ্যাপ্রেন্টিসি করে শিখত কত!

বাইরে বেরোলেই সকলকে বড় বড় পার্ট দিতেন আর নিজে ছোট পার্ট নিতেন। কখনও একদল লণ্ডনে আর একদল বাইরে পাঠাতেন। বাইরের দলে নতুন ছেলেদের বড় বড় পার্ট দিয়ে পাঠাতেন।

আরভিং সত্যি নাটক খুব ভাল বুঝতেন। নাটকের উন্নতির জন্যে অনেক করেছেন তিনি। তাঁকে ফাদার অব ইংলিশ স্টেজ বলা যায়।

এইবার নাটক পড়তে সুরু করলেন—প্রথম দিকের কর্ণের কথাগুলো যেন মনে হয়—you know my mind, come and do your best এই ধরণের।

এর পর আছে বিশ্বরূপ-দর্শন। আমরা প্রথম থেকেই ওটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলুম। বইতে কিন্তু ঠিক ঢুকিয়েছে।

নরনারায়ণ-এ কৃষ্ণভামিনী করত পদ্মা আর চারু দ্রৌপদী। দুজনেই অপূর্ব অভিনয় করেছিল। যেখানে দ্রৌপদী বলছে—

> সেই আমি, এই মুক্ত কেশরাশি লয়ে
> সহিতেছি হে মাধব—নিত্য সহিতেছি
> অগ্নিজিহ্ব সহস্র ফণার
> বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন—

সেখান থেকেই জমে যেত। এর পর দর্শকরা আর নিশ্বাস ফেলতে পেত না।

বিনয়দা তর্ক আরম্ভ করলেন—এত বেশী উপমা ব্যবহার করেছেন যে বুঝতে কষ্ট হয়।

শুনে বললেন—উপমার কথা বলছ, অভিনয়ের গুণে সেগুলো চোখের সামনে দেখতে পাবার মত হবে। দেখবে যেন চোখের সামনে পারা গলে ছড়িয়ে যাবে। তাই যদি না পারল ত অভিনয় কি হল? আর এতেই যদি বোঝার কষ্ট হচ্ছে, বল ত তপতী-র বেলায় কি করবে?

একজন বললেন—নরনারায়ণ-এ আপনি ত কর্ণ করতে পারেন।

হাসলেন—আমি এখনও কর্ণ করলে হয়? কিন্তু কমবয়েসী ছেলে একটি পেলে ভাল হত। এখন দম কমে গেছে। তাছাড়া যৌবনের সে কণ্ঠ পাব কোথায়? এখন তিনটে কি বড় জোর চারটে দৃশ্য পড়ার যে কষ্ট হচ্ছে তাতে পুরো নাটক করতে পারি। পড়াতে তো আর ফাঁক নেই, তাছাড়া pause দিতে পারছি না, তার জন্যে মনের মধ্যে মোচড় দেয়। একজন বললে অপরের কি মনোভাব হয় সেটা তো বোঝান দরকার।

বিনয়দা বললেন—আমাদের কারও তো আপনার মত দম নেই?

বললেন—তোমাদের দম নেই বলছ, তোমরা ত অভ্যেস করনি। আমি যে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস করেছি। যখন যাকে পেয়েছি ডেকে এনে পড়ে শুনিয়েছি। সবাই সেইজন্যে ভয় করত আমায়। বাইরে অবশ্য পারতুম না, সাহস ছিল না। বাড়ীতে অনেক লোকজন ছিল, তাদের সবাইকে পড়া শুনিয়েছি। কত ছোট বয়সে জনা দেখেছিলুম, আর তারপরে জনা পড়ে সবাইকে তিনকড়ির সুর নকল করে শুনিয়েছি।

ডাঃ অধিকারী সাধারণত কিছু না কিছু বলেন, হাসাহাসি করেন। সেদিন একেবারে চুপচাপ। তাই হঠাৎ বললেন—কি রাম, এত বিমর্ষ কেন, শরীর ভাল ত?

তিনি বললেন—হ্যাঁ!

তখন হেসে বললেন—তাহলে একটু লাইট হও। সঙ্গে সঙ্গেই জুড়ে দিলেন—অবশ্য শরীরের দিক থেকে লাইট হতে বলছি না। ডাঃ অধিকারী সমেত সকলেই হেসে উঠলেন।

অপরেশবাবুর কর্ণার্জুন-এর কথা তুললেন কে একজন। সে কথার উত্তরে বললেন—অপরেশবাবু ক্ষীরোদবাবুর অনেক পরে লিখেছেন। তাছাড়া দুজনের তুলনা করাও উচিত নয়। সেক্সপীয়রের কথা বাদ দিচ্ছি, কেননা বড্ড বড় হয়ে যায়; শ'র সঙ্গে সি. এইচ. মনরোর কি তুলনা হয়? ক্ষীরোদবাবুর ড্রামাটিক সেন্স বড় ভাল ছিল, ঠিক জায়গামাফিক প্যাঁচগুলো দিয়েছেন।

নাটক পড়ার কথায় বললেন—নাটক পড়লে লাভও হয়। ডিকেন্সও ঐ ভাবে পড়ে প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন, তবে তাঁর ছিল রীতিমত অভিনয়। রবীন্দ্রনাথও রীতিমত পড়তেন। তাঁর শেষের দিকের বইগুলো পড়েছেন বিচিত্রা ভবনে। কিন্তু প্রথম দিকেরগুলো কখনও প্রমথ চৌধুরীর বাড়ী আর কখনও বা অন্য জায়গায় পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ—বিশেষ করে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলো অপূর্ব!

বিনয়দা আপত্তি করলেন—না রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ভাব আছে, তাছাড়া বড্ড বেশী উপমা ব্যবহার করেছেন।

ওঁর কথা শুনে বললেন—বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলোতে বোধ হয় ধোঁয়াটে ভাব নেই। আর একবার পড়ে দেখ'ত। ভাবার সাহিত্যিক মূল্য ত আছেই—সেদিক দিয়ে উনি অতুলনীয়। আর উপমার কথা বলছ, উপমা না দিয়ে উনি কথাই বলতে পারতেন না। পাঁচ মিনিট কথা বলতে না

বলতে—লতা যেমন সূর্যের দিকে যায়, ইত্যাদি উপমা উনি সর্বদাই ব্যবহার করতেন।

ওঁর সঙ্গে তখন নতুন চেনা, বলেছিলুম (অবশ্য আবদার করে) ওদেশে যেমন critical literary appreciation লেখা হয় তেমনি ২০০।২৫০ পাতার এক একখানা বইতে পুরানো লেখকদের সম্বন্ধে যদি লেখেন—

তাতে বললেন—আমার বই কে পড়বে ?

মণিলালকে চুপি চুপি বললুম—লেগে থাক না।

মণিলাল বলছে—খেয়ালী লোক ! লেগে থেকে কিছু হবে না।

প্রবন্ধ লেখায় অতুলনীয় হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট লিখে লিখেই বোধ হয় লেখাটা এত রপ্ত হয়েছিল।

কে একজন বলে বসল—কই অন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের তো হয়নি ?

হাসলেন—কথাটা অবশ্য বলেছ ঠিক; ভেতরে না থাকলে আর হবে কোথা থেকে !

কথা পাল্টালেন—রবীন্দ্র-ভারতীতে বিজয়া করছি, সঙ্গে সব ইনস্টিটিউটের ছেলেরা। শরৎ-সাহিত্য উৎসবে। ওদের একজন আমার কাছে গিয়েছিল; (ওদের আমি নাম দিয়েছি শরৎশশী।)—বলতেই বললুম—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই করব। কেন করব না ? টাকার আমার বড় দরকার। ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর !

তাতে বললে—শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-উৎসবেও আপনি পয়সা নেবেন ?

বললুম—কেন নেব না ? শরৎদা কি আমায় কিছু ছেড়েছেন কখনো ? একবার কিছু টাকা দিতে দেরি হয়েছিল বলে অনেক কটুকথা বলেছিলেন।

এই সময় বিনয়দা বললেন—আবার দেনা-পাওনা আর ষোড়শী পড়লুম ; নাটকে আর উপন্যাসে তো অনেক তফাৎ। নাটকে অনেক নতুন নতুন কথা বলেছেন যা উপন্যাসে ছিল না।

বললেন—দেনা-পাওনার চেয়ে ষোড়শী-তে জিনিসগুলো গুছিয়ে বলা আছে তা সত্যি, কিন্তু সবই ত ওতে ছিল নইলে আমি পেলুম কোথা থেকে ? ওতে জমিদারি চলে যাবে একথা পরিষ্কার লেখা আছে। জীবানন্দর মৃত্যুর কথাটা অবশ্য আমিই বলি। বললুম—জমিদারি চলে যাবে আর জমিদার থাকবে, তা হয় না।

প্রথমে ত কিছুতেই মানবেন না, তারপর অনেক তর্ক করে অনেক বুঝিয়ে তবে মেনে নেওয়াতে পারি।

বিনয়দা আবার বললেন—ষোড়শীর মনে কিন্তু একটা পরিবর্তন এসেছিল। জীবানন্দ ওকে ধরে নিয়ে যাওয়াতেই বোধ হয় পরিবর্তনটা শুরু হয়।

তখন বললেন, ষোড়শীর মনে কোন পরিবর্তন হয়েছিল কি না সেটা ঠিক বোঝান নি। হৈমবতীকে দেখে তার মনে দুর্বলতা এসেছিল একটু, সংসার করবার সখ হয়েছিল। তবে ওকে ধরে নিয়ে যাবার পর যে পরিবর্তনটা হয়েছিল সেটা জীবানন্দ ওর স্বামী বলে। ওঁর যে ঝোঁক ছিল মেয়েদের সতী করবেনই!

বিজয়াতে নরেন ছবি আঁকে, মাছ ধরে, আবার মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজও করে। এই দেখে তোমাদের আশ্চর্য লাগছে, কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওঁর নিজের মনের ইচ্ছাটাই উনি প্রকাশ করেছেন। ওঁর ধারণা ছিল চেষ্টা করলেই উনি ভাল ছবি আঁকিয়ে বা বৈজ্ঞানিক হতে পারতেন।

ষোড়শী নাটকটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, ওই নৃপেনের জন্যে। আমার ঘরে বসে লিখছেন এমন সময় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল নৃপেন। ব্যস, উনিও উঠে পড়লেন আর লিখলেন না। বললেন, না ভায়া, ওরা গিয়ে বলে বেড়াবে, তুমি বলে যাচ্ছ আর আমি ডিক্টেশান নিচ্ছি, তা আমার সহ্য হবে না।

আমি কত বোঝালুম—ওতে আপনার কোন সম্মানই যাবে না। আপনি যে কি সে ত সবাই জানে।

তা কিছুতেই কোন কথা কানে নিলেন না।

ইনস্টিটিউটের কথা উঠল, বললেন—সায়েন্স সাহেব একবার গোলদীঘিটা বুজিয়ে ওখানে ইনস্টিটিউটের বাড়ী করে দিতে চেয়েছিলেন। গুরুদাসবাবু আর ম্যাকফার্সন সাহেব আপত্তি করাতে শেষ পর্যন্ত হল না। ম্যাকফার্সন সাহেব আমাদের ডেকে বললেন—ঐখানেই একমাত্র তোমাদের স্বদেশী মিটিং হতে পারে, সেটা বন্ধ করবার জন্যই বাড়ি করতে চাইছে। তোমরাও কি তাই চাও?

একটা প্রশ্ন বহুকাল ধরে আমাদের মনে উঠেছে, এই সুযোগে সেটা জিজ্ঞাসা করে বসলাম—গোলদীঘিকে গোলদীঘি বলে কেন, ওটা তো চৌকো?

হেসে বললেন—গোলদীঘি তো আগে গোলই ছিল, '১২-১৩ সালে মাটি ফেলে বুজিয়ে চৌকো করে ফেলেছে। ওখানে আমরা আড্ডা মেরেছি। গোলদীঘির ধারে আমরা কিৎকিৎ খেলতুম।

শুনং বাড়িটা কে যেন বলেছে—কেষ্টবাবুর। বললেন—কেষ্টবাবুর হবে কেন, এটা ডেভিড হেয়ারের। ওপাশের বাড়িগুলো ছিল ঘোষালদের।

ইবসেনের নাটক সম্বন্ধে বললেন—আজকাল যে ইবসেন আর চলে না এই কথাই আমাদের দেশের লোকেরা ভুলে গেছে। ইবসেন কেন, শ'ও চলে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় স্যার চার্লস মেরিয়টের লেখা পড়ে দেখ!

একটা দল করে পুরানো সব বই পর পর করা দরকার। কতকগুলো ছেলে যদি পেতুম। আগেকার দিনে ত কেমন শিখত!

কিছুদিন আগে জেনেছিলাম ২রা অক্টোবর ওঁর জন্মদিন আর সেইজন্তেই ২রা এলে ওঁর জন্মদিনের উৎসব করা হবে তা আমরা ক'জনে মিলে স্থির করে ফেলেছিলাম। এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা তথা উৎসাহী হল লালমোহন দত্ত ও দেবকুমার বসু।

আমরা এটা বেশ ভাল করেই জানতাম যে, জানতে পারলে সমস্ত প্ল্যানটা শিশিরকুমার ভেস্তে দেবেন। তাঁকে নিয়ে নাচানাচি করাটা পছন্দ করতেন না তিনি। তাই সব বন্দোবস্ত চুপি চুপি করতে হল।

অন্যদিনের চেয়ে আগেই তাঁকে আনতে যাওয়া হল, অথচ তাঁর দেখা নেই। আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। যথা সময়ের পরেই এসে পৌঁছলেন তিনি, তবে একা। বললেন, আজ ত দেবু সকাল সকালই গিয়েছিল। আমিও তৈরি হয়ে নিলুম। ব্যস, তারপর পঞ্চাশ মিনিট ওর কোন খোঁজ খবর নেই। বাড়ীর লোকেদের খোঁজ করতে পাঠালুম, তারা গাড়ী ডেকে নিয়ে এল, কিন্তু তখনও দেবুর দেখা নেই। শেষ পযন্ত ওরা বললে আপনি চলে যান। রাস্তায় দেখা হলে তুলে নেবেন। তাই চলে এলুম।

উপস্থিত লোকেদের মধ্যে দু'একজন বললেন, কি হল দেবুর, পুলিসে ধরেনি ত?

হাসলেন—পুলিসে ধরবে? না, তা ধরবে না আর ধরলেও আজকের দিনে ছেড়ে দেবে। আজকে কার জন্মদিন জানত? আজকের দিনে সব কিছুই অহিংস। এই দেখনা আমাদের দেশে মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয় আর আমরা অহিংস হয়ে বসে তাই দেখি। অবশ্য গান্ধীজী অমন কথা বলেন নি। নারীর ওপর অত্যাচার তিনি সহ্য করতে বলেন নি। আর যাই হোক, তিনি কাওয়ার্ড ছিলেন না। মরে সে কথা প্রমাণ করে গেছেন।

এবার নরনারায়ণ বইটা খুললেন। পড়া আরম্ভ করার আগে বললেন—ক্ষীরোদবাবুর ছেলে বইটাতে ঘুরিয়ে লিখেছে, তিনি মস্ত বড় লেখক ছিলেন; কিন্তু অন্য নাটকগুলোতে লেখা তাঁর পূর্ণতা পেতে পারেনি নানা কারণে—এই বইটাতে

পেয়েছে। কিন্তু তোমরা পড়ে দেখ যেখানে সেখানে কত বাজে লাইন ঢুকিয়েছেন। এই খাতাতে যা লেখা দেখছ—এইটাই প্রথম লেখা।

অনেক লেখক আছেন যাঁদের লেখা প্রথমেই ভাল হয়। পরে পরিবর্তিত করলে ফলটা তত ভাল হয় না।

নাটকটা পড়তে শুরু করলেন। সন্ধির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণ হস্তিনা থেকে ফিরে এসেছেন। ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদীর আলাপে রত অংশটা পড়ে বললেন—এখানে দ্রৌপদী আর কৃষ্ণের মধ্যে একটু ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছে। পরস্পর পরস্পরের সখা আর সখী ত।

আগের দিন পড়েছিলুম, মনে আছে বোধ হয়, সন্ধির কথায় দ্রৌপদী বলছে—

অগ্নিশিখা মুখে যদি
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
কোন দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর ?
আমি যাব।……
কৌরববিনাশে নিজে যাব আমি।

এই বলে অভিমন্যুদের নিয়ে বেরিয়ে গেছল। তারপর কৃষ্ণ হস্তিনায় সন্ধির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

তাই দ্রৌপদী ঠাট্টা করে বলছেন—ওরা তোমায় বাঁধতে এসেছিল বলে শেষ পর্যন্ত বিরাট হতে হয়েছিল। এত ভয় তোমার।

কথায় কথায় সন্ধি না হওয়ায় নিজের আনন্দের কথা বললেন।

কৃষ্ণ তখন বলছেন যে, ধর্মরাজের সন্ধি স্থাপনের সব চেষ্টা তোমার উষ্ণ নিশ্বাসে মিলিয়ে গেল।

তারপরের এক জায়গায় পড়তে পড়তে বললেন—এই যে এখানে বলছে—

জাতি যবে মরে অনশনে
সদা হয় নারীর লাঞ্ছনা।

এই কথাগুলো বোধ হয় আজকাল সত্য নয়। জাতি ত অনশনে মরেছে। নারীর লাঞ্ছনা ত অহরহঃই ঘটছে, কিন্তু কই ভগবান তো কিছু বলেন না ?

দ্রৌপদী যখন পুরানো কথা বলছেন, বলছেন কুরু রাজসভায় তাঁর অপমানের কথা, সেই অংশটা পড়ার পর বললেন—এখানে দ্রৌপদীর কথাগুলো কেমন ধাপে ধাপে সাজান দেখ। শেষ কথাটা দ্রৌপদী বলছে—পাণ্ডবসখা! লক্ষ্য কর—পাণ্ডবসখা এই হচ্ছে কৃষ্ণের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সেদিন সোভিয়েট নিউজ এজেন্সি টাস-এর করেস্পনডেন্ট কন্স্রাসভ এসেছিলেন। দেবুদা তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বললেন, ও টাসের করেস্পনডেন্ট, ইংরেজি বোঝে তো? তারপর তাঁকে বললেন—I saw some of your actors—Cherkassov and others. Some I saw in 1952, others later on.

আবার পুরানো প্রসঙ্গে চললেন—চারুর উচ্চারণে কতকগুলো দোষ ছিল, তবে চেষ্টা করলে কি করা যায় দ্রৌপদীতে তারই প্রমাণ দিয়েছিল। "হে কেশব, তুমি নাকি বিরাট হইয়াছিলে কুরু সভাস্থলে," এই কথাগুলোর মূল সুর সে ফোটাতে পেরেছিল।

গুরুকে বিশ্বাস করে যদি দু'টো নাটকও ঠিক ঠিক গুরুর অনুসরণ করা যায় তাহলে ভাল অভিনেতা হওয়া যায়।

তখনকার দিনে অভিনেতাদের সকলেরই অভিনয়ে উচ্চারণের দোষ ছিল। দানীবাবুরও ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব—তারই জোরে দর্শকদের টেনে রাখতে পারতেন। জীবনের শেষ ক'বছর, মানে গিরিশবাবু মারা যাবার পর থেকেই তিনি আর ভাল অভিনয় করতে পারেন নি।

তখনকার দিনের অভিনেত্রীদের একটা মস্ত বড় দোষ ছিল, তারা কোন কিছু চিন্তা করত না। তারাসুন্দরী পড়ত ব্যতিক্রমদের দলে—কিন্তু সেও কতকগুলো বাঁধা ছকের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

তারার সঙ্গে অনেকবার অভিনয় করেছি। মারা গেছে '৫০ সালে তাহলে '৪৬ সাল পর্যন্ত করেছি। শেষের দিকে শুধু রিজিয়া করেছে।

রিজিয়াতে বক্তিয়ার একটি অপদার্থ চরিত্র। আমরা কেটে-ছেঁটে যেমন দাঁড় করিয়েছি, তাতে তবু চলত। রিজিয়াতে অর্ধেন্দুদা বখ্‌তিয়ার করতেন, তাঁর জন্যেই চলত। প্রতাপাদিত্যে উনি দু'টি ভূমিকা করতেন, প্রথম দিকে বিক্রমাদিত্য আর রডা। রডার পোশাক ছিল হাস্যকর। টকটকে লাল কোট আর প্যাণ্ট, তার ওপর একটা অ্যাডমিরালের টুপি। কিন্তু উনি যখন কথা বলতে আরম্ভ করতেন, তখন পোশাকের কথা মনে থাকত না কারও।

এই সময় লালমোহন দত্ত এসে হাজির হল ফটোগ্রাফার নিয়ে। ফুলমালা ইত্যাদি দেওয়া হল ওঁকে, নানাজনে নানা উপহার দিলেন। একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন—ব্যাপারটা কি?

বললাম—আজ যে আপনার জন্মদিন।

বললেন—আমার জন্মদিন ত তারিখ মিলিয়ে মানি না, মানি তিথি মিলিয়ে। সবাই তাঁকে তখন জিনিসপত্র দিচ্ছে, তাই বললেন—কিন্তু এসব কি?

বলা হল—আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে ওরা, জানাতে দিন না।

বললেন—আচ্ছা বলছ যখন দাও। তোমরা শ্রদ্ধা করে যা দিচ্ছ তাই নেব। একটু যেন আনমনা হয়ে পড়লেন—জন্মদিনের সঙ্গে কতকগুলো দুঃখবহ ঘটনা মিশিয়ে আছে, তাই এইসব করলে কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে, তাই যা বলার দরকার তা বলতে পারছি না। তোমরা মনে করে নিও আমি বলেছি।

এমনিতে ছবি তুলতে দেন না। সেদিন এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। প্রথমে ওঁর একক ছবি তোলা হল। তারপর সবাইকে একসঙ্গে টেনে নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তোলালেন। এবার সবাইকে মিষ্টিমুখ করান হল।

এই সময় টাসের করেসপন্ডেন্ট প্রশ্ন করলেন যে, তিনি কখনও দেশের বাইরে গেছেন কিনা? উত্তরে বললেন—No. I have been never out of this country except once when I have been to New York I stayed for six months. সবায়ের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল—ওঁকে আবার পড়তে অনুরোধ করা হল।

বললেন—না, এরপর আর পড়া যাবে না। মনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

নাটক পড়া বন্ধ হয়ে গেল তো, সুরু হল নাটক সম্বন্ধে আলোচনা। বিনয়দা বললেন—নরনারায়ণের সাহিত্যিক মূল্য যাই হ'ক না, নাটক হিসাবে এর মূল্য literary value-র জন্যেই কমে গেছে।

বললেন—বিনয়, তুমিই প্রথম বলছ নাটকের literary valueর জন্যেই তাকে বোঝা যায় না। বোঝাই যদি না গেল তাহলে অভিনেতা আছে কি করতে। অভিনেতার সেইটাই সবচেয়ে বড় গর্ব যে সে দর্শককে নিজের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছে। নিজের ইচ্ছামত তাকে সে নাচাতে পারে, কাঁদাতে পারে।

আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে বললেন—আধুনিক কবিতা আমি বিশেষ পড়ি নি। সত্যিই আধুনিক কবিতা বোঝা যায় না। তবে তোমার ভাল না লাগলেও জিনিসটা যে ভাল নয় একথা বলা যায় কি করে? আমার টেনিসন ভাল লাগত না, লাগত না কেন, এখনও লাগে না। ঐ যে তার ইমেজারি—'মন

জমে বরফ হয়ে গেছে, চাড় পড়ে ভাঙছে' এসব যেন কেমন ধরণের লাগে। কিন্তু তাই বলে টেনিসন খারাপ বলা যায় কি ?

এই সময় একজন বললে—বাংলা সাহিত্য সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছে আজকাল।

বললেন—বাংলা সাহিত্য বলছ সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধিশালী, কোনদিকটায় দেখাও ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে কি শেলী বা কীটস্-এর কবিতার গভীরতা আছে ?

এবার ইবসেন সম্বন্ধে বললেন—ইবসেনের নাটকের আর দিন নেই। আমি তাঁর প্রতিভাকে খর্ব করতে চাই না, কিন্তু তবু বলব তিনি dated হয়ে গেছেন। ইবসেন নাট্যকারই ছিলেন না শুধু, ছিলেন স্টেজ ম্যানেজার আর অভিনেতা। তাঁর নাটকের গঠনে স্টেজ ম্যানেজারের ছাপ পুরোপুরি দেখা যায়। কথা বলা না-বলার ভঙ্গী সব কিছুতেই নাটকের ছক-কাটা ভাবটা দেখা যায়। তাঁর Wild Duok খুব ভাল বই।

একজন বললে—নাটক ভাল না হলে কি অভিনেতার গুণে নাটক দাঁড়ায় ?

বললেন—অভিনেতার গুণে নাটক দাঁড়ায় না? ঐ যে আলমগীর, ওতে নাটকীয়তা কি আছে? আসলে ত ওটা নাটকই নয়। অথচ খুব জমে গেছে, পয়সাও দিয়েছে। ঐ যে ভূতের ভয় আছে। দর্শকরা ঐ ভূতুড়ে দৃশ্য দেখতে যেত। আগে ঐ উদীপুরী আর আলমগীরের দৃশ্যটা ৩৮ মিনিটে করতুম, আজকাল করি ১৩ মিনিটে। রোজ রোজ অভিনয়ের সময় চরিত্রের ভেতর নতুন কিছু দেখতে পেতুম; আজকাল আর পাই না। গত দু' বছরে বিশেষ করে হাত ভাঙ্গার পর থেকে কেমন যেন বুড়িয়ে গেছি।

হঠাৎই প্রশ্ন করলেন—ইনস্টিটিউটে বই করলে বিক্রি কেমন হয় ?

একজন বললে—হলে লোক বোধ হয় খুব বেশি ধরে না।

বললেন—কেন, হলে ত লোক ভালই ধরে। ১১০০—১১৫০ হবে—যে কোন থিয়েটারের সমান। ওখানে আর একবার বিজয়া করবার কথা হচ্ছে। মহাজাতি সদনের হলটা বেশ ভাল হয়েছে। লোকও ধরে ২৫০০ জন। Acoustics খুব ভাল। আস্তে আস্তে কথা বললেও শেষ পর্যন্ত শোনা যায়। প্রম্পট্ করবার অবশ্য অসুবিধে হয়। কিন্তু প্রম্পটার থাকা উচিত নয়। অভিনয় করার আগে অভিনেতাদের পুরো মুখস্থ থাকা উচিত। তাই আমি দু'মাস ধরে রিহার্সাল দিই। আর আজকাল দু'দিন রিহার্সাল দিয়ে বই নাবানো হয়।

কাজেই প্রম্পটারের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু প্রম্পটার কি কম বিপদে ফেলে। বার্নপুরে না কোথায় অভিনয় করছি, সবে বলেছি—আত্রেয়ী মা, এতদিন কোথায় ভুলে ছিলি। দেখত কাত্যায়ন—ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ফু-রু-রু আর কার্টেনস্।

মহাজাতি সদনের হল ভাল, কিন্তু স্টেজ সুবিধের নয়। আড়ে ছোট, ডেপথ্ নেই। ওরা তো যারা জানে তাদের জিগ্যেস করবে না। যাক্, যা করেছে, ভালই করেছে। সুভাষের পুণ্যফলেই ঘটেছে ব্যাপারটা। তবে আটশ' টাকা ভাড়াটা বড্ড বেশী।

আজকালকার অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলতে বলায় বললেন—অভিনয়ের কথা আর কি বলব বল। আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু বলতে লজ্জা করে। সেদিন একজন ডাক্তারকে ডাকতে বাইরে গেল, ঢুকল অন্দরের দিক থেকে। বললুম, এটা কি হল! ডাক্তার কি অন্দরমহল থেকে ঢুকবে নাকি?

তা বললে—ভুল হয়ে গেছে।

এ রকম ভুল কি হয় নাকি?

কান্তিবাবু কাল গিয়েছিলেন। ওঁর ইচ্ছেতেই আবার বিজয়া অভিনয় করছি। উনি দয়াল খুব ভাল করেন না, তবে জমে যায়। বইটার অভিনয় যা হচ্ছে, তা আর কি বলব! তবু কিন্তু জমে। জমে অবশ্য নাটকের গুণে আর শরৎদা'র ভাষায়।

নরেন জানে বিজয়ার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়ে আছে। তার বাবা তাকে পড়িয়েছেন। কিন্তু রাসবিহারীরা অন্য রকম বুঝিয়েছে, তাই ভাবছে হয়ত মত বদলেছিলেন।

বিজয়ার এদিকে রাসবিহারীকে প্রথম থেকেই ভাল লাগে না, তাড়িয়ে পর্যন্ত দিচ্ছে কিন্তু মনের কথাও বলছে না।

দয়াল প্রথম শুনে বলছে—তুমি নলিনীকে ভালবাস শুনে খুব খুশি হলাম। তার পরে বুঝতে পেরে বলছে—ও, বুঝেছি।

এটা বড় সুন্দর করতেন—শীতলবাবু। নিজেকে নিঃশেষ করে মিলিয়ে দিতেন চরিত্রের সঙ্গে।

নিজের সম্বন্ধে বললেন—গিরিশবাবুর চেয়ে আমি বেশি দিন অভিনয় করেছি। সেই ১৯৫৬ পর্যন্ত—৪৮ বছর। প্রথম ক'বছর ইনস্টিটিউটে, তারপর পাবলিক স্টেজে।

এখনও করতে পারি। একটা পাদপীঠ দাও। বাইরে যেতে হলে একটা দল তো চাই। দু মাস অন্তর একটা নতুন বই ধরব, রিহার্সাল দেব, ভূতনাথকে ধমকাব।

ভূতনাথ প্রথমে 'সিন' উইংস থেকে ফাঁক করে লাগাত তারপর আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে উইংসের সঙ্গে লাগিয়ে দিত। ওর ধারণা ছিল উইংসের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই সব চেয়ে ভাল হয়। আবার ধমক দিলেই সরিয়ে নিত।

হঠাৎ কথা বদলালেন, দেবুদাকে বললেন—দেবু, তুমি যদি ভাব ওরা আমায় মস্কোয় যেতে ডাকবে ত ভুল করবে। সাদা চামড়ার কারোর সঙ্গে আমার ভাব নেই ; ওরা কেউ আমার বন্ধু নয়।

পশ্চিমের দেশে তো আমাদের দেশের সভ্যতাকেই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা বলতে বোঝে পশ্চিমী সভ্যতা। তবে ওদের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে রাশিয়ানদের ধারণা একটু ভাল হতে পারে, কারণ—ওদের শরীরে মুসলমান রক্ত (তাতার) একটু বেশী পরিমাণে আছে তো।

কথায় কথায় একজন বললেন—স্টেজে গঙ্গাবতরণ দেখায় প্রথম স্টারে।

বললেন—গঙ্গাবতরণ প্রথম স্টারে দেখাবে কেন, প্রথম দেখায় পার্শি থিয়েটারে! রবি বর্মার ছবির মত গাঁট্টাগোট্টা এক মহাদেব বিরাট জটা এলিয়ে এসে দাঁড়াত স্টেজের মধ্যে আর মাথার ওপর ছরছর করে জল পড়ত। জল জটা বেয়ে স্টেজের ফুটো দিয়ে নিচে চলে যেত, আর ওপর থেকে আবার জল পড়ত।

থিয়েটারের একটা বাড়ি থাকলে অনেক ভাল ভাল লোককে ডেকে আনতে হয়। দু-চারজন ঐতিহাসিক (মানে যাদের মাথায় কিছু আছে), দু-চারজন অন্য ধরণের পণ্ডিত লোক। তার জন্য তাঁদের এক কাপ চা দিতে হবে ; কোনদিন দুটো সিঙ্গাড়া, কোনদিন বা দুটি মুড়ি—মানে কিছু খরচা করতে হবে। তাঁরা রিহার্সাল দেখবেন, ভাল লাগলে দুচার কথা বলবেন।

আজে-বাজে বই হৈ চৈ করে চলে। কেন? না, দর্শকরা নেয়, তাইত। কিন্তু ভাল কিছু করতে গেলে দর্শক তৈরী করা চাইত। সেইজন্যেই তো ঐসব পণ্ডিত আর জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে থিয়েটারের যোগ দরকার।

আমার নাটক দেখে দু-চারজন যে মন্তব্য করেন নি তা নয়। অবনবাবু

আমার সীতা দেখে বললেন—অযোধ্যার সব কিছু ধপধপে সাদা হওয়া উচিত বলে মনে হয় আমার। কিন্তু ভেবে দেখলেন না, সাদার ওপর সাদা আলো ফেললে কি বিতিকিচ্ছিরি জিনিষ হয়।

একজন বললেন—উনি বোধ হয় রঙীন আলো ফেলার কথা ভেবে বলেছিলেন।

বললেন—বেশ ত তাই না হয় মানলুম, কিন্তু আলো ফেলত কে? সতু যে শিখে এসেছিল, কি কাজে লাগল? আমাদের দেশে আলোর imaginative use ত কই দেখি না? ওদের দেশে দশ ডলার হপ্তায় মাইনে নিয়ে কাজে লেগে শিখে আসা উচিত, নইলে ওরা ত শেখাবে না। আমি নিউইয়র্কে এক জায়গায় দেখলুম, ধুলো ওড়ার দৃশ্য দেখাচ্ছে, সত্যিকারের ধুলো উড়ছে যেন। বললুম—কি করে করছ দেখিয়ে দাও ত।

বললে, I will tell you later on. কিন্তু আর বলল না।

অন্য প্রসঙ্গে ফিরলেন—অপরেশবাবুর কর্ণার্জুন ত পার্শি মহাভারতের ওপর নির্ভর করে লেখা। জায়গায় জায়গায় হুবহু অনুকরণ। ওদের যে কায়দায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখান হত কর্ণার্জুনেও তাই। বৃষকেতুর মাথা কাটাটাও ঠিক ওদের মত করেই দেখান হত। এমনি sceneএর পর scene মিলে যায়।

কর্ণার্জুনেতে আমি দু'বার নেমেছি। তখন আমার টাকার খুব দরকার তাই করি। প্রত্যেকদিন তেরশ' করে টাকা দিয়েছিল, করব না কেন? অপরেশবাবুর খুব ইচ্ছা ছিল, আমি ওঁর বইতে পার্ট করি। আমি অপরেশ-বাবুকে বলেছিলাম আপনি যদি দুঃখ না করেন ত করতে পারি। একেবারে তৈরি না হয়েই নাবি। জোড়াতোড়া দিয়ে কোন রকমে চালিয়ে দিয়েছিলুম।

একজন বললেন—ওতে ত সংস্কৃত আবৃত্তি করেছিলেন।

বললেন—হ্যাঁ, তা করেছিলুম, কিন্তু যখন যা মনে হয়েছে বলেছি।

স্ট্যান্ট দিয়ে বই চালানো যায় কি? আর নতুন কি দিচ্ছে? আমার শঙ্খধ্বনি দেখেছ কেউ? ওতে যে বৃষ্টি পড়া ছিল তার চেয়ে ভাল বৃষ্টিপড়া দেখিয়েছে কেউ?

একজন ভাল নাট্যকার চাই—বিদেশী নাটকের সঙ্গে যার পরিচয় থাকবে না। বিদেশী নাটকের সঙ্গে পরিচয় থাকলে অনুকরণ করে বসবে। গিরিশ বাবুর ত ভাল করেই জানা ছিল। ধর ক্ষীরোদবাবুর মত। না, ভুল করলুম,

ঠিক বলা হল না। ওঁরও খানকতক সেক্সপীয়রের বই পড়া ছিল। তখন বোধ হয় বি কোর্সেও ইংরেজী পড়তে হত।

৭ই অক্টোবর যখন এলেন তখন মনে হল অসুস্থ। প্রশ্ন করাতে বললেন—শরীর ত আমার ভালই ছিল, কিন্তু সেই যে তোমরা সন্দেশ খাওয়ালে না তারপর থেকে রোজই সন্দেশ আসতে লাগল, আর লোভের বশে খেয়েও বসলুম। অমল পাঠিয়েছিল চকোলেট কেক, ওটা আবার আমি খেতে ভালবাসি বলে pretend করি, কাজেই চার পাঁচ টুকরো খেয়ে বসে আছি। তার ফলে লিভার ফুলে পেটে ব্যথা হয়েছে।

বলা হল, বোধ হয় হেপাটাইটিস হয়েছে আপনার।

হেসে বললেন—হেপাটাইটিস ত ছিলই। কথাটা ত গ্রীক, লিভার যখন আছে আব তার ওপর যা অত্যাচার হয়েছে তাতে খারাপ হওয়াটা তো আশ্চর্য কথা নয়।

আমার যখন থিয়েটার ছিল তখন বড়দিনের সময় বরাদ্দ ছিল ৪টি করে কমলালেবু আর দুটো করে কেক তবে ভগবানের দয়ায় আর পয়সা আমদানী থাকায় কখনো গুণে খেতে হয়নি, যার য'টা ইচ্ছে খেত। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর দাদা, অমলদা বললেন—তোমাদের যেন কি রকম! ভালো ভীমনাগের সন্দেশ কিনে এনে খেলেই ত পার।

আমি তাতে বললুম—ক্রীসমাসের সময় কেকই ত খেতে হয়।

ক্ষীরোদবাবু নাটক লিখতেনও ভালো, বুঝতেনও ভাল, কিন্তু জিনিয়াই পরিবৃত থাকাতেই গোলমাল হল। নরনারায়ণে দুর্বল লেখা খুব কমই আছে। যেটুকু আছে তাও ঐ ছাপা বইয়েতেই।

নরনারায়ণের ভূমিকায় লেখা আছে, ক্ষীরোদদা নিজেই বইটা লিখেছেন। কি বলব বল, নিজের কথা বলতে লজ্জা করে। কি ঝগড়া ক্ষীরোদা'র সঙ্গে বই নিয়ে।

বললেন—আমি বই লিখে অন্য থিয়েটারে অভিনয় করতে দিতে পারি।

বললুম, নিশ্চয় পারেন।

নরনারায়ণ লেখার সময়কার কথা বলতে পারি, কেউ যদি "রাধেয়" বইটা জোগাড় করতে পার। বাঁকুড়া না বীরভূম কোথাকার এক কাগজে ১৯২৩-২৪ সালে বেরিয়েছিল।

একজন বললেন—নির্মলশিববাবুর কাগজে বেরিয়েছিল।

বললেন—তা হতে পারে। নির্মলশিববাবু ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন।



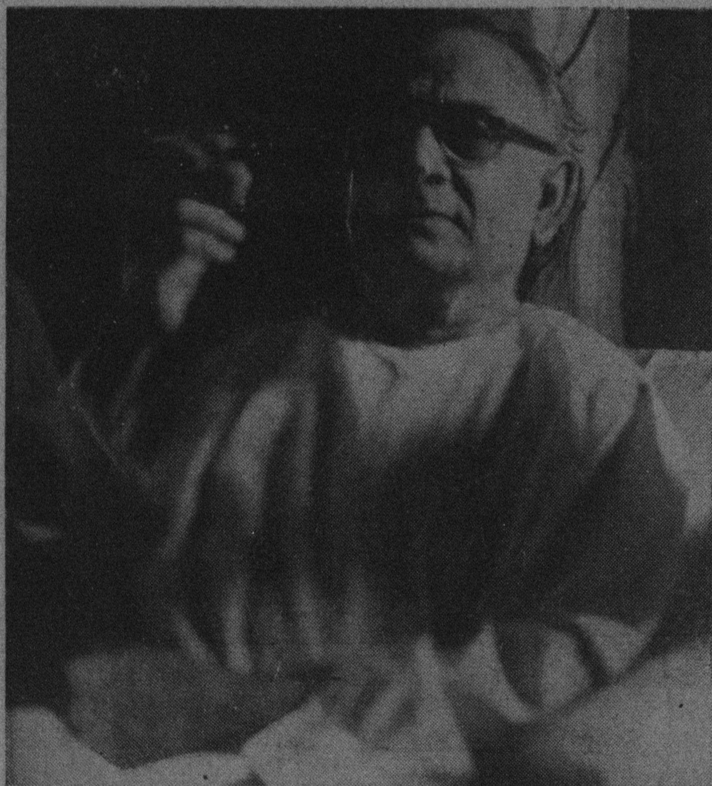
মাইকেল · শিশিরকুমার
অ্যাঁরিয়েৎ · রেবা দেবী



বক্তিয়ার · শিশিরকুমার



আলমগীর • নাট্যাচার্য শিশিরকুমার



২৭৮, বি. টি. রোড-এ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

ডাঃ অধিকারী এই সময়ে এসে ঢুকলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন—এই যে রাম, এস এস। তোমার কিছু avoirdupois বৃদ্ধি হয়েছে দেখছি।

এবার একজন কথা তুললেন মিনার্ভা থিয়েটার লিজ্ নিলে চলবে কি না।

বললেন—চলবে না কেন? তবে লিজ্ তো পাবে না। মাড়োয়ারীর ব্যাপার তো।

বলা হল, ওখানে হিন্দী-থিয়েটার হচ্ছে।

বললেন—করাবে না কেন? এককালে ওরা খুব বাঙলা বই দেখত। আজকাল রাজনৈতিক কারণে হিন্দীর ওপর ঝোঁক দিয়েছে।

বলা হল, হিন্দী-থিয়েটারে মাইনে বেশি দেয়। মুনলাইট থিয়েটারে সীতা দেবী দেড় হাজার টাকা মাইনে পান।

বললেন—ও আর এমন কি বেশি পাচ্ছে। সীতা যখন আমার থিয়েটারে কাজ করতে এল, হিন্দী-থিয়েটারে ও তখনই সতেরো শ' টাকা মাইনে পায়। আর গহর—যার বস্ত্রহরণ দেখে পরে নীহারের বস্ত্রহরণ হল—পার্শী থিয়েটারে কাজ করার সময় সেকালেই সব মিলিয়ে দু' হাজার টাকা পেত!

এবার ক'টা শো দেবার কথা বললেন—ইনস্টিটিউটে নাটক করলে কি বিক্রী হবে? ঠিক করেছি, মানে একটু বাধা আছে, সেটা কেটে গেলেই চারটে অভিনয় করব। কিন্তু কি করব বল তো চারটে পুরানো বই করব না, নতুন বই একটা ধরব। দর্শকরা বসে অভিনয় দেখলে দেখতে পাবে না কেন? এই তো রবীন্দ্র ভারতীর কুড়ি ফুট স্টেজে অভিনয় করে এলুম, সবাই তো দেখতে পেল।

নাটক পড়তে সুরু করলেন। খানিকটা পড়ার পর বললেন—নাটকের এই অংশটা খুবই সুন্দর। তবে সমস্ত সৌন্দর্যটা বোঝানো যায় না, উঠে নড়ে চড়ে বলতে হয়। কিন্তু এখন তো তা পারব না, সব পার্ট করবার দম পাব না।

দৃশ্যটা শেষ করে বললেন—কেমন tamely শেষ হয়েছে দেখ দৃশ্যটা। শেষ কথাগুলো না বললেও চলত। অবশ্য এরকম ইংরেজীতেও আছে। Pineror বইএতেও এই রকম tame ending আছে।

ইনস্টিটিউটের আবৃত্তির প্রাইজ না পাওয়ার জন্যে আমার দুঃখ আছে। প্রথম-বার ইংরেজি, বাঙলা দুটোতেই ফার্স্ট হয়েছিলুম। পরের বার ইংরেজি, বাঙলা, সংস্কৃত তিনটিতেই ফার্স্ট হতুম। কিন্তু বিনয়বাবু যখন কারা কারা আবৃত্তি করবে সেই নাম পড়ছিলেন, তখন আমার নাম পড়ে বললেন—না শিশির, তুমি নয়। ইংরেজিতে ক্যাদারও তাই বললেন।

আমাদের সময় ইনস্টিটিউট খুব জমজমাট ছিল। ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ইনস্টিটিউট সবচেয়ে ভাল চলেছিল। সে সময় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অনেক ভালো ভালো লোক হতেন বিচারক। পোপ পঞ্চাননও হয়েছেন। শাস্ত্রী মশায় হলে খুব ঝগড়া করতেন। গলার আওয়াজ পেতুম, দেখেছি কি আর! সত্যেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) খুব আবৃত্তি করতেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক ভালো। আর কি উৎসাহ, খবর পেলেই আবৃত্তি শুনতে আসতেন। একাশী বছর বয়সে মারা গেলেন, তার দু'বছর আগেও আবৃত্তি করতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য নব্বই পেরোন নি। সেদিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি গেছেন, বোধ হয় যাঁকে তোমরা মহর্ষি বল—অষ্টাশী বছর।

প্রতাপচন্দ্র আবৃত্তি ভালই করতেন, উনি জজ হয়েছেন আমাদের পরে। কেশব বাবুর আবৃত্তি শুনি নি, বিনয় সেনের কাছে গল্প শুনেছি।

বিনয়বাবু আমাদের সম্বন্ধে কতকগুলো খারাপ ধরনের ধারণা নিয়ে এসেছিলেন। বললেন,—হ্যাঁ মশায়, আপনার সম্বন্ধে অমুকে অমুক কথা বললে—কথাটা মিথ্যে কথা। তাহলে তো তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

উনি বুঝলেন না যে, আমাদের মত ছেলেরা যেমন সত্যি কথা বলে, তেমনি দরকার হলে মিথ্যে কথা বলতেও তাদের আটকায় না। তাঁকে মিথ্যে কথা বলার জন্যে লজ্জিত আছি।

পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায় কথায় বললেন—গিরীনের খবর কি? মাঝে তো অসুখ করে হাসপাতালে ছিল। এণ্টালীতেই তো আছে। যাব একদিন দেখা করতে। সত্যি গিরীন সেন বড় ভাল লোক। নরেন সেন এটর্নী অফিসের মালিক ও। ওর অনেক টাকা বন্ধুরাই আটকে দিলে। কিন্তু কষ্টে পড়েছি বলে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কাউকে ও কোনদিন ফেরায় নি। হাতে যদি একটা টাকা থাকে তো কেউ গিয়ে কেঁদে পড়লেই দিয়ে দেবে। অভিনেতাদের অনেককে অনেক টাকা দিয়েছে। দশ হাজার টাকা হ্যাণ্ডনোটে দিয়ে বন্ধু বলে নালিশ করলে না। তবে ভি-কে দেড় লাখ টাকা দিয়েছিল, তার জন্যে নালিশ করলে না কেন, বুঝি না। দেড় লাখ টাকা ছেড়ে দেবার মত অবস্থা ওর নয়। ওইটাই বোধ হয় ওর স্নবারি।

বিনয়দা বললেন, নরনারায়ণ আপনি না করলে জমবে না।

বললেন, বিনয়, কথাটা তোমার ঠিক নয়। নাটক যদি বোঝে আর

চেষ্টা যদি থাকে যে কেউ হ'ক পারবে। তাছাড়া আমও তো আছি, শিখিয়ে দিলে পারবে না কেন? অ্যাবি থিয়েটারের মত ৬০´×৪০ ফুট জায়গাই দাও না দেখি।

আধুনিক ইংরেজী নাট্যকারদের কার লেখা খুব ভালো বল তো? অবশ্য সিঞ্জের কথা বাদ দাও। রবার্টসনের লেখায় নতুনত্ব কই? বেশীর ভাগই jejune। শ'র পরে যাঁরা লেখেন—ককটেল পার্টি, কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক লিখেছেন টি-এস-ইলিয়ট; সেপারেট টেবলস লিখেছেন টেরেন্স র‍্যাটিগান, তাছাড়া ফ্রাই—এঁদের-লেখার মধ্যে গুণটা কি আছে? দিগ্বিজয়ী বা শঙ্খধ্বনিও তো খুব ভালো বই, ওদের তুলনায় তো বটেই। অ্যাবি থিয়েটারের জন্যেই আইরিশ নাটক ভাল হয়েছিল। ওর জন্যে টাকা খরচ করেছিলেন মিস হর্নিম্যান, কিন্তু তার আগে অবশ্য লেডী গ্রেগরী খুব খেটেছিলেন। প্রথম প্রথম টাকা পয়সাও দিয়েছিলেন উনি।

নর-নারায়ণ-এর লেখা বইটার অবস্থা খুবই খারাপ; বাড়িতে এত করে বলছি, একটা কপি করতে তা আর কিছুতেই করবেনা। আরো একটা কপি ছিল, কোথায় যে গেছে পাওয়া যাচ্ছে না। আসল কথা কি জান, যে কাজ আমরা করি তার ওপর আমাদের কোন শ্রদ্ধা নেই, তাই এমনিই ঘটে

॥ ৭ ॥

এতদিন পর্যন্ত যে সব নাট্যকারের নাটক তিনি পড়েছিলেন তাঁরা নাট্যকার হিসাবে তাঁর অগ্রবর্তী অর্থাৎ নাটক লেখা এবং নাট্যকার হিসাবে নাম তাঁরা শিশিরকুমার অভিনয় করতে আরম্ভ করার আগেই করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি এমন একজন নাট্যকারের নাটক পড়লেন যাঁর নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িত।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সীতা নাটক লেখেন দায়ে পড়ে। কারণ পূর্ববিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা শিশিরকুমার অভিনয় করতে পারেন নি। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা সীতার অভিনয় স্বত্ব কিনে নেন। নাটকটির অভিনয় করবার কোনরকম সদিচ্ছাই ক্রেতাদের ছিল না, এ শুধু নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।

শিশিরকুমারেরও গোঁ ছিল ভয়ানক। তিনি ঠিক করলেন সীতা তিনি অভিনয় করবেনই। তাই যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে নতুন করে সীতা লেখালেন। সে নাটকের অভিনয় দেশে আলোড়ন তুলল, কিন্তু বিদ্বজ্জনের মত হল, নাটকটির কোন গুণ নেই। তার ফলে নাটকের সুনাম হল না বিশেষ।

পরবর্তী জীবনে অনেকগুলি সামাজিক নাটক লেখেন যোগেশচন্দ্র আর কতকগুলি সুপরিচিত উপন্যাসের নাট্যরূপও দেন তিনি। এছাড়া বহু নাটকের কঠিন চরিত্রে অভিনয়ও করতেন তিনি। এইটুকুই মাত্র জানতাম আমরা।

শিশিরকুমারের মুখেই যোগেশচন্দ্রের একটি ইতিহাসমিশ্রিত নাটকের খবর পেলাম, নাটকটি নাকি খুবই ভালো। স্থির হল ১৬ই অক্টোবর এসে দিগ্বিজয়ী পড়বেন।

সেদিন যখন এলেন মনে হল অত্যন্ত ক্লান্ত, সে কথা বলতে বললেন—শরীর আমার ভালোই ছিল আবার দুর্বল হয়ে পড়েছি, একটু ক্লান্তি অনুভব করছি। তারপর আমাদের একজনকে বললেন—ডাক্তার, বলতে পার ক্লান্তি দূর করবার মত কোন ওষুধ আছে কি না? অবশ্য মদ নয়; মদের নেশায় ক্লান্তি দূর হয় না, একটু সময়ের জন্যে উপকার হয় মাত্র; তারপরেই একই অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ যে লেখক—আলডুস হাক্সলি—কি ওষুধের নাম করেছেন যেন?

বলা হল—মেস্কালিন। উৎসাহভরে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেস্কালিন! ও তো সিদ্ধিপাতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সিদ্ধি খেলে বোধ হয় একটু ক্লান্তি দূর হয়। আফিং খেলেও হয় বোধ হয়।

আমি একবার খেয়েছিলুম। Whole-night performance শেষ হবার আগেই শরীর আর বইছে না; তা যোগেশদা বললেন—যদি রাগ না কর তো তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। বললাম—দিন।

তা ওঁর আফিংএর বড় গুলিকে তিন ভাগ করে দুটো আমায় খেতে দিলেন। খেয়ে উপকার হয়েছিল, কিন্তু তারপরের দিন খুব ঘুমিয়েছি।

দিগ্বিজয়ী পড়তে শুরু করবার আগে বললেন—দিগ্বিজয়ীর কথা হল—একজন যদি ক্ষমতা পায় তো তার মনে একটা মত্ততা আসে—তা সে যে অবস্থা থেকেই আসুক না কেন এবং শেষ পর্যন্ত তার ফল ভাল হয়না মোটেই।

এবার নাটকটা সম্বন্ধে বললেন—নাটকটা অভিনয় হয় ১৯২৮ সালে, কিন্তু লেখা শুরু হয় ১৯২১ সালে। আমি তখন মদন কোম্পানীতে চাকরি

করি, ওরা একটা blood and thunder নাটক চেয়েছিল; সেই জন্যেই লেখা নাটকটা। তিন সাড়ে তিন ঘণ্টার নাটক, অথচ মোটে ৬টি দৃশ্য। এত কম দৃশ্যে নাটক এর আগে বোধহয় লেখা হয়নি। মন্মথর একটা এক দৃশ্যের নাটক আছে, নাম বোধহয় মুক্তির ডাকই হবে। হরিদাসবাবু বলতেন—বেশীদিনের কথা নয়: (শেষের দিকে, ক'বছর আগে) ঐটাই আগে।

বলা হল নাটকটি ১৯২৬ সালের চব্বিশে ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয়। বললেন—তাহলে হরিদাসবাবু ঠিকই বলতেন।

আবার দিগ্বিজয়ীর প্রসঙ্গে ফিরলেন—দিগ্বিজয়ীর গল্পটা মোটামুটি ইতিহাস-সম্মত। কিন্তু সাদাৎ আলি খাঁ আর চিন কিলিচ খাঁ—এরা দুজনে একসঙ্গে লড়েন নি। সাদাৎ আলি প্রথম দু'দিন যুদ্ধে জেতার পর তৃতীয় দিন সকালে বন্দী হয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৈন্যদের হার হল। অবশ্য প্রথম দু'দিন তিনি জিতেছিলেন বলা ভুল, চেক করে রেখে দিয়েছিলেন। Irvine-এর বইয়েতে সব কথাই লেখা আছে, তবে নাটকটা মর্টিমার ডুরাণ্ডের বইয়ের উপর নির্ভর করেই লেখা।

সালে বেগ একটি historical character, লোকটি ছিল idealist, আলি আকবর হচ্ছে পারস্য-সম্রাট তামাসের ভাগনে। তামাসকেই বন্দী করে নাদির সম্রাট হল। তামাসের যে মেয়েকে উনি বিয়ে করেন আলি হল তারই কাজিন। ঐ যে সর্দারদের ডাকা হত—খোরাসানী, সিস্তানী, আবদাল—আর অমনি তারা স্টেজে আসত। সেই সময় অন্ততঃ ২৮ জন স্টেজে থাকত তারপর দুজন করে বেরিয়ে যেত। তাদের পোষাকগুলো বড় সুন্দর হয়েছিল, খরচও হয়েছিল খুব বেশি।

দিগ্বিজয়ী করবার জন্যে ডেপথ খুব বেশি লাগে। দিল্লী পোড়ানো দেখাবার জন্যে নয়, প্রথম দৃশ্যের জন্যে। দিল্লী পোড়ানো দেখাতে বেশী জায়গা লাগবে কেন? ছোট জায়গাতে মসজিদের মিনার দেখালেই চলবে।

আমরা প্রথম দৃশ্যে স্টেজের ষাট ফুট ডেপথ ছাড়াও তার পেছন বিশ ফুট একটা ঘর, চার পাল্লা দরজা খুলে কানাত লাগিয়ে তাঁবুর দরজা করে তার পেছনের বারো ফুট প্যাসেজ মায় গাছপালা শুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছিলুম। মোট ডেপথ প্রায় একশ ফুটের মত হয়েছিল। সিন উঠলে তাই দর্শকরা হাততালি দিত। আজকে করতে গেলে অবশ্য কোন স্টেজে করা যাবে না, করতে হবে ময়দানে।

পরে স্টারে করেছি কিন্তু এখন আর স্টারের স্টেজের সে ডেপথ নেই, দেওয়াল-টেওয়াল তুলে ছোট করে দিয়েছে।

একজন বললেন—নাট্য-নিকেতনে প্রবোধবাবুর থিয়েটারেও করেছিলেন দিগ্বিজয়ী, পেছনের প্যাসেজ পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলেন।

বললেন—প্রবোধের থিয়েটারে করেছিলুম? পেছনের প্যাসেজ পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলুম নাকি? হবে।

ভোলাদা এসেছিলেন এদিন, তিনি বিরাজ বৌ করার সময় প্রোসেনিয়াম খুলে আর বজরাটা কেমন সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল সেই কথা তুললেন। উনি বললেন—প্রোসেনিয়ামটা খুলে দিয়ে ভালোই করেছিলে ভোলা। বজরার দৃশ্যটাও খুব ভালো হয়েছিল—মাটি আর জলের তফাৎটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল।

এবার বিদেশী স্টেজের প্রসঙ্গে এলেন—ওদের দেশের স্টেজের ডেপথ খুব বেশী দেখা যায় না। ওদের সব চেয়ে বড় স্টেজ ব্রডওয়েতে ডেপথ সাট থেকে সত্তর ফুট; তবে সব স্টেজেরই ওপেনিংটা খুব চওড়া। আরে আমরা যেখানে অভিনয় করেছিলুম—ভ্যাণ্ডারবিল্ট—ছোট্ট স্টেজ, তারই ওপেনিং ছিল আটাশ ফুটের মত।

বলা হল—শ্রীরঙ্গমের ওপেনিংও তো বোধ হয় ঐ রকমই ছিল। হেসে বললেন—শ্রীরঙ্গমের ওপেনিং কোনদিনই আটাশ ফুট ছিল না, বড় জোর চব্বিশ ফুটের মত হবে।

ভোলাদা'র শাস্তি কি শান্তি-র ওপর খুবই ঝোঁক; ও নাটকটার কথা তুলতে উনি বললেন—শাস্তি কি শান্তি গিরিশবাবুর শেষ দিকের লেখা, তখন ওঁর ক্ষমতা কমে গেছে, তাছাড়া সেকেলে কনজার্ভেটিভ ভাব বড় বেশী। নাটকটা উনিশশো দশ সালে লেখা।

অমৃতলাল বোসের কথা উঠল। বললেন—অমৃতলাল বোসের নাটক সবগুলোই ভালো নয়। তবে গ্রাম্য বিভ্রাট যা লিখেছেন, একেবারে হুবহু ইলেকশনে কি হবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

এতক্ষণ চা খাওয়া হচ্ছিল, এবার আবার বই ধরলেন, বললেন—দিগ্বিজয়ী হল মহম্মদ শাহের রাজত্বের কথা নিয়ে লেখা; আর যে একটা করেছিলুম—তখৎ-এ-তাউস, জাহান্দার শাহের রাজত্ব নিয়ে লেখা। মাঝখানে রইল ফররুকশিয়ার জাহান্দারকে যে মেরেছিল, আর পরে রইল আমেদশা আবদালী—এই দু'টো নাটক লিখলেই সুন্দর একটা সিরিজ হয়।

কিন্তু লিখবে কে? পড়াশোনা আছে এমন যুবক নাট্যকার কই? আমি গল্প বলে দিতে পারি, চরিত্র বোঝাতে পারি, কিন্তু লিখতে পারিনা। আজকালকার দিনে পড়াশোনা করবে, খাটতে পারবে এমন একজন নাট্যকার সত্যি দরকার।

নাটকের জন্য কে কি করছে? ওই তোমাদের আকাদমী রয়েছে। কিন্তু তারা করল কি? সবচেয়ে আনসাকসেসফুল নাট্যকারকে পাঠালে ডেলিগেট করে—যেন তার চেয়ে ভালো নাট্যকার এদেশে নেই।

আর ঐ যে স্থূলাঙ্গিনী ভদ্রমহিলা ত তাঁকে দুচার কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, নাটক তো আমি বিশেষ পড়িনি। তাঁর বাবাকে গুলি করে মেরেছিল সেইজন্যে এই চাকরী তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

এবার নাটক পড়তে শুরু করলেন, বললেন—তৃতীয় অঙ্কের এই দিল্লী পোড়ানোর দৃশ্যটা করতে পারলে খুব ভালো হয়। নাদিরের কথা শেষ হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ আর কোন কথা নেই। এই সময়টায় বাইরে থেকে চীৎকার, আর্তনাদ, মেরে ফেললে, মলাম, ইত্যাদি শোনা যাবে আর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশঃ বেড়েই চলবে। এই দু'টোকে ঠিকমত দেখাতে পারলে কথা না বলার জন্য খুব অসুবিধে হয় না।

ভারতনারীর চরিত্রটা একটু মেলোড্রামাটিক তো বটেই; এতক্ষণ পর্যন্ত নাটকটা ছিল এপিসডিক কিন্তু সাধারণ ভারতনারীকে এখানে এনে নাটকটাকে সিম্বলিক করার চেষ্টা হয়েছে। ভালোভাবে অভিনয় করতে পারলে চরিত্রটি কিন্তু ভালোই লাগত। প্রথমে করেছিল কৃষ্ণভামিনী।

অভিনয়ের গুণে চরিত্র তো ভালই ফোটে। এমনকি ঐ যে গিরিশবাবুরা বলতেন 'এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল' তাতেও কি খারাপ হত?

আমাদের দেশে থিয়েটার এল হঠাৎ। তার আগে পর্যন্ত যে যাত্রা হত তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সায়েবদের পুরো অনুকরণে, আমরাও করতে পারি দেখাতে তাঁরা থিয়েটার সুরু করলেন।

যাত্রারও অবশ্য বিকৃতি সুরু হয়েছিল। মতি রায় আর মথুর সাই এই বিকৃতির কারণ।

আমাদের সময় সংস্কৃত ভাল করে শেখান হত। আমি তখনো স্কুলে পড়তে ঢুকিনি—বয়স কত হবে আট নয়, তখন থেকেই মুগ্ধবোধ পড়তে শুরু করি। স্কুলে যে ভাল সংস্কৃত পড়ান হত তার জন্য পোপ পঞ্চাননকে ধন্যবাদ দিতে

পার। আমাদের পাড়ায় পণ্ডিতেরা তখন খুবই আসা যাওয়া করতেন। আমরা তখন রমানাথ কবিরাজ লেনে থাকতুম।

হরিনাথ দের কাছে গিয়ে বললুম—স্যার, ফ্রেঞ্চ শিখতে চাই, কি বইটই পড়ব বলে দিন তো। তাতে তিনি বললেন—Well youngman, it is best to have a mistress speaking the tongue. আমি তখন মোটে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, বয়স আর কত হবে—ওঁর কথা শুনে একেবারে ভেবড়ে গেলুম।

অভিনয় শেখানর কথায় বললেন—সে রকম ছেলে পেলে তো শেখাই। দাঁড়াও আমার থিয়েটার হোক। এই তো একরকম আরম্ভ হয়েছে। এইবার এটাকে বাড়ালেই চলবে।

আমাদের দেশে যার যা কাজ নয় সে তাই করে। এই রাধাকৃষ্ণণ আসছেন জগদীশ বোসের শতবার্ষিকীতে বক্তৃতা দিতে। জগদীশ বোসের উনি কি বোঝেন? অবশ্য জগদীশ বাবুও ঐরকমই ছিলেন। একবার ওঁর একটা লেকচারের টিকিট ওখানকার স্কুলের মেয়েদের মধ্যে বিলোচ্ছেন। পান্নালাল এক স্কুলের সায়েন্সের মাষ্টারের জন্য টিকিট চাইতে গেছে। তাতে উনি বললেন—সে আমার লেকচার কি বুঝবে?

পান্নালালও মুখফোঁড় ছেলে, বললে—উনি স্কুলের মাষ্টার উনি বুঝবেন না, কিন্তু এই যে (মেয়েদের দেখিয়ে) যাদের দিচ্ছেন এরা কি বুঝবে? তখন একটু চুপ করে থেকে দুটো টিকিট দিয়ে বললেন—যাও কিন্তু আর যেন আসে না।

কে একজন বললেন—শিকার ছবির জন্যে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

শুনে বললেন—শিকারের দরুণ চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলছ? আমরা তো টাকা পাই না। টাকা তো দেওয়া উচিত সরকারের।

কে একজন বললেন—সরকারের কাছে মাথা নীচু করলেই টাকা পাওয়া যায়।

বললেন, মাথা নীচু করলেই টাকা পাওয়া যায়? তাও যদি যেত আমি একশ বার মাথা নীচু করতে রাজি ছিলুম। কিন্তু তা তো পাওয়া যায় না। সরকার তো সব কিছুই গোলমাল করে দেয়।

অভিনেতার চেহারা ভাল থাকা একটা সৌভাগ্যের পরিচায়ক। ঐ যে ভদ্রলোক—কি যেন নাম—হ্যাঁ, জন ব্যারিমুর। লোকে বলত একেবারে হ্যামলেটের উপযুক্ত চেহারা। সে তুলনায় আমার একেবারে বাজে—বেঁটে, মোটা, চোখ ছোট তার ওপর আবার ভেতরে ঢোকানো। কিন্তু তাতে দমে গেলে চলবে না। ঢোকা চোখকেই ফুটিয়ে তুলতে হবে।

২৩শে অক্টোবর পুজোর ঠিক পরেই একাদশী না দ্বাদশী। উনি আসতে সবাই প্রণাম করলাম, উনিও কোলাকুলি করে আশীর্বাদ করলেন, তারপর বসে বললেন—শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে, পেটে ব্যথাও রয়েছে। এরপর কি হবে তা জানি! বাইরে যেতে পারলে শরীর ভাল হত, কিন্তু যাব কি করে?

পাশের বাড়ি থেকে কাল প্রণাম করতে এসেছিল, ভদ্রলোকের দশটি মেয়ে! ভাব দেখি কি ভয়াবহ অবস্থা। দশটি মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, যাতে তারা রোজগার করতে পারে, ভালভাবে বাঁচতে পারে। ওদের মাকে দেখলুম। তেরটি সন্তানের জননী কিন্তু কি অপূর্ব স্বাস্থ্য।

দিগ্বিজয়ী পড়তে শুরু করলেন—দিগ্বিজয়ী হল শক্তিমত্ততার মিথ্যাময়ী পরিণামের ছবি। শক্তিমত্ততার ফল কখনই ভাল হয় না। এই সোভিয়েতেই দেখনা। লোকদেব ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে না? তুমি বলতে পার আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু তাই কি সব। তিরিশ বছর একটা প্রচণ্ড পাজি লোক কিনা নিজের ক্ষমতা চালিয়ে গেল, দেড়কোটি লোককে মারলে (ক্রুশ্চেভই বলেছে)।

দেশের লোকে সরকারের নামে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেই কিন্তু ওরা তো তা করে না। আর যারা দেখতে যায় তারা ভালো বলবে বলেই তৈরী হয়ে যায়। আর সবটাই তো আর ভাল নয়। এইত আমার এক পরিচিত লোক মার্কারি ট্রাভেলসকে তিন হাজার টাকা দিয়ে পনের দিনের জন্য ঘুরে এল। দোকানে জিনিসপত্র সাজান আছে তা তারা দেখেছে, কিন্তু সেটাই সব নয়।

দিগ্বিজয়ী প্রথম লেখা হয় উনিশ শ' একুশে। আমি তখন মদন কোম্পানীতে চাকরি করি। লেখাটা পড়ে ওদের পছন্দ হল না, ওরা আমায় আলমগীর করতে দিলে। সেই first draft-এরই সংস্কৃত রূপ দিগ্বিজয়ী। যোগেশদা'র আগে মন্মথ এক দৃশ্যে মুক্তির ডাক লিখেছে বটে, কিন্তু ওটা ঠিক নাটক নয়—আর ওখানে দৃশ্য বদলাবার দরকারই হয় না। এখানে কিন্তু ডেলিবারেটলি সিন কমান হয়েছে।

দিগ্বিজয়ীর প্রকৃত সমালোচনাই হয় নি। রবীন্দ্রনাথ সেই যে বলেছিলেন,—সীতা নাটকই নয়, সেই থেকে যোগেশদা'র নাটক কেউ গ্রাহ্যই করলে না। শুধু যোগেশদা'র লেখা বলে দিগ্বিজয়ীর কেউ সমালোচনাই করছিল না,

এক বুঝি হেমেন্দ্র কবেছিল, বলেছিল—শিশিবকুমার ভালো অভিনয় করেছেন; দৃশ্য ভালো হয়েছিল, কিন্তু নাটকটি তেমন সুবিধার নয়।

আমরা আগের দিন তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত পড়েছিলুম—সেখানে ভারতনারী বুকের রক্ত দিয়ে নাদিরকে অভিশাপ দিয়ে গেল। তারপরেই নাদির ভারতবর্ষ ছেড়ে ইরানে ফিরল।

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যাচ্ছে নাদিব ছেলে বেজাকুলিকে সন্দেহ করছে। সিবাজী সিতাবাকে বোঝাচ্ছে যে, ক্রিশ্চান সাধুব কাছে গেলে তিনি হয়ত নাদিবের মতিগতি বদলাতে পারেন। এরপব নাদির এলে সে কথাটা তাকে বলে দেবে।

রহমনেব চবিত্রটা অনেকটা মহাভারত গান্ধীর মত। অহিংসা বলেই চীৎকার। তিনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন কিনা জানি না; কিন্তু প্রায়ই বলতে হয়েছে আমি ভুল কবেছি—হিমালয়ান ব্লাণ্ডার।

ইংরেজরা কি ভেবেছিল, কোনদিন এদেশে তাদের ছেড়ে যেতে হবে? অবশ্য আঠারো শ' পঁচাশী সাল নাগাদ একটু একটু ভাবনা আসতে আরম্ভ করেছে, তাই রাডইয়ার্ড কিপলিং বলেছে—Lest we forget.

বিনয়দা'ই বোধ হয় এবার জিগ্যেস করলেন—মার্লো তো কবি, তাকে নাট্যকার বলে কেন?

বললেন—বলবে না! ওই তো প্রথম নাটকেব আজকালকার রূপ দিল। Tamburlane, Dr. Faustus, Jew of Malta—সব ক'খানাই তো ভাল। ওর Edward II তো ঐতিহাসিক নাটকের সূত্রপাত করল। সেক্সপীয়ারের Richard II তো ওর থেকেই চুবি।

আবার প্রশ্ন হল—সেক্সপীয়ারকে কবি বলে কেন?

বললেন, কবি তো বলবেই, তবে কবি-নাট্যকারই বলে। থেকে থেকে নাটকের কাব্যাংশ কবিতার চরমে উঠে যায়।

সেক্সপীয়ার পড়াতেন পার্সিভ্যাল সাহেব। কর্কশ গলা কিন্তু পড়ানর ভঙ্গী ছিল অপূর্ব! আমি তো ভাল ছেলে ছিলুম না, তবু পড়ে আসতুম। যারা ক্লাস পালায়, কোন দিন পড়ে-টড়ে আসে না, তারা পর্যন্ত কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করত।

পার্সিভ্যাল সাহেবের মত ঘোষ সাহেবও (M. Ghosh) পড়ানতে একটা আকর্ষণ এনে দিতে পারতেন। কিন্তু নোট নিয়ে পড়াতেন না বলে

এ বছরের পড়ান, আগের বছরের পড়ানর থেকে অনেক তফাৎ হ'ত। নোট না নিয়ে পড়ালে অমন অবশ্য হয়।

বিনয়দা বললেন—নোট না নিয়ে পড়ালে ও-রকম হয়। পড়ানর সময় mood যেমন থাকে interpretationও তেমনি হয়।

বললেন—কথাটা ঠিকই বলেছ বিনয়। মুড যেমন থাকে interpretationও সেই রকম হয়। এই নোট নিয়ে না পড়ানর কথা আমাকেও বলেছে। ছাত্ররা এসে বলত—আপনি কোনও নোট ফলো করেন না, আপনার পড়া ধরতে পারি না। আমাদের তো পাশ করতে হবে। তারা কিন্তু ঠিক বলত না। আসল কথা হল একটু ঘুরিয়ে বললে তারা আর বুঝতে পারত না।

পার্সিভ্যাল সাহেব শুধু যে ভাল পড়াতেন তাই নয়, পড়াশোনা করাবার কায়দাও ভাল জানতেন। তবে ক্লাসে কথা বললে চটে যেতেন। চটে যেতেন বলাটা বোধ হয় ঠিক বলা হল না; মুখ-চোখ লাল হয়ে যেত, বলতেন—Talking in the class is not only an insult to the professor, it is an insult to the class. বলেই আবার পড়াতে শুরু করতেন।

প্রফুল্লবাবু ওঁর সব বই পেয়েছিলেন। বইএতে সাদা কাগজ লাগিয়ে, এপাশে ওপাশে চারপাশে ছোট ছোট করে যখন যা মনে হয়েছে, লিখে রাখতেন।

অনেকে বলে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক লেখা সহজ। আমার তো মনে হয় নাটক লেখাই শক্ত। অবশ্য পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের একটা তৈরী কাঠামো পাওয়া যায়, কিন্তু interpretation দেবার বা চরিত্র গড়বার স্বাধীনতা তো থাকেই। ভালো সামাজিক নাটক লেখা তো খুবই শক্ত।

এরপর কি বই পড়বেন জানতে চাওয়াতে, অনেকেই বললে—রক্তকরবী পড়ুন। বললেন—না ওটা এখন থাক। তখন আবার বলা হল—ষোড়শী। বললেন—হ্যাঁ ওটা পড়া যেতে পারে। নাটকটা নষ্ট করে দিলে নৃপেন চাটুজ্জে। অবশ্য ওরই বা দোষ কি।

একজন নাটকটা শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা কি না জানতে চাওয়ায় বললেন—না ও নাটক শিবরামের লেখা নয়। আসল ব্যাপার হল, দেনা-পাওনার নাট্যরূপ দেবার অধিকার শরৎদা শিবরামকে লিখে দিয়েছিলেন।

সে চারটে দিনে বইটা লিখে আনল। কিন্তু চারটে দিনে কি নাটক দাঁড়ায়? পরে শরৎদা'কে ওর জন্যে একশ' টাকা দিতে হয়েছিল। আমি আসল কথা বলিনি, তাহলে হয়ত শরৎদা'কে বিপন্ন হতে হত।

বিনয়দা বললেন—উপন্যাসে আছে, জীবানন্দ একজন অত্যাচারী জমিদার ছিল।

বললেন—জীবানন্দকে অত্যাচারী জমিদার বলছ, কিন্তু সে তো অত্যাচার for অত্যাচার's sake করত না। তার দরকার টাকার আর টাকা পেলেই সে খুশি। কিন্তু টাকা চাইলেও তার ওপর তার মায়া হয় না। দেখা যায় একটা সোনার ঘড়ির ওপর সে ছাই ফেলেছে, বিছানায় একটা দামী শাল পেতে রেখেছে, একটা ভালো চাদরে হাত মুছছে।

ওর একমাত্র আকর্ষণ ছিল অলকার ওপর। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক করে খুঁজেও ছিল তাকে। তাই ষোড়শীকে দেখে চমকে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মায়াও তার চলে গেল। আর তার পরে তো বাঁচার আর কোন মোহ রইল না তার।

বিনয়দা আবার বললেন—জীবানন্দের ত্যাগী রূপটা আপনার কল্পনা।

বললেন—না, না, জীবানন্দের এই ত্যাগী রূপটা আমার কল্পনা নয়, উপন্যাসে এর আভাস ছিল, নয়ত আমি পেলাম কোথা থেকে?

এবার সাধারণ আলোচনা শুরু হল। যাঁরা হাজির ছিলেন তাঁদের প্রায় কেউই দিগ্বিজয়ী অভিনয় দেখেন নি। ওঁকে অনুরোধ করা হল দিগ্বিজয়ী একবার অভিনয় করতে। বললেন, আজকাল আমার আর এই সব কম বয়সী চরিত্র করতে ভালো লাগে না! তাছাড়া নাদির করতে বোধ হয় দমও পাব না।

কে একজন বললেন—নতুন বই করতে গেলে একটা নতুন দলও দরকার।

বললেন—হ্যাঁ, নতুন একটা দল তো করা দরকার। দেখ চেষ্টা করে যদি কিছু করতে পার।

চাঁদা করে টাকা তোলার কথা উঠল, তাতে উনি বললেন—টাকা পয়সা তুললে আমাদের দেশে হিসেব দেয় না। এই ধারণা আমার অনেক দিনের। আমরা ফেডারেশন হলে মিটিং করে নন্দ বোসের বাড়ি গেলুম। তা সে সময়ে কত টাকা উঠেছিল কেউ জানে না।

নন্দবাবু আমার চেয়ে অনেক বড়। ওঁর বয়স প্রায় ৮০ হল। অবন বাবু ছিলেন রবি বাবুর চেয়ে বছর দশেকের ছোট।

যামিনা রায়কে যোগেশদা অনেক সাহায্য করেছেন। আমাদের থিয়েটারও কত কাল Dooor করেছে। নব নাট্যমন্দিরে তো করেছেই—এমনকি শ্রীরঙ্গমে পর্যন্ত সরমার সমুদ্রের দৃশ্য করেছিল। অবশ্য খুব ভাল করে নি। যামিনী হয়ত আজকাল পুরানো দিনের কথা ভোলবার চেষ্টা করছে।

বাড়ী ফিরতে গাড়ীতে উঠলেন। সেখানে আজকালকার থিয়েটার সম্বন্ধে কথা হল। বললেন—উল্কা দেখতে এসেছিলুম একবার, দেখি সব এমনিতেই হাততালি দিচ্ছে। বড় রাস্তার উপর থিয়েটার হলে বড় অসুবিধা হয়। কর্নওয়ালিসে সীতা করার সময়, ভালো একটা জায়গায় ঘড়ঘড় করে ট্রাম চলে গেল। শ্রীরঙ্গমের মত জায়গায় তো খুবই ভাল হয়। পনের বছর ছিলুম ওখানে।

দিগ্বিজয়ী কবে শেষ হয়েছিল জানতে চাওয়ায় বললেন—উনিশশ তেত্রিশে দুরাতের জন্যে শেষ অভিনয় হয় দিগ্বিজয়ী। ওতে সিতারা করেছিল রাধা।

বলা হল—যিনি কীর্তন গান করেন।

বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে কীর্তন গায়। আমার ওখানে চাণক্যে ছায়া করত। শিখেও ছিল আমারই ওখানে।

ওঁকে আবার অনুরোধ করা হল—একবার অন্ততঃ দিগ্বিজয়ী করুন।

বললেন—দিগ্বিজয়ী করতে বোধ হয় পারব না। অতগুলো চরিত্রকে তৈরী করান, বড্ড খাটনী পড়বে। তাছাড়া excitementও আছে তো।

হঠাৎ এমনি এমনিই বললেন—তারাশঙ্করের রাইকমল পড়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন—বইটা আমার বেশ ভালো লাগল, ওটা তুমি থিয়েটারে করতে পার। কথাটা তারাশঙ্করকে আমিই বলি। ও বেশ ভালো লোক।

॥ ৮ ॥

আজকের দিনে বাঙলা রঙ্গমঞ্চ তথা চিত্রজগতের অধমতারণ, অগতির গতি শরৎচন্দ্রকে শিশিরকুমারের চেষ্টাতেই জনসাধারণ নাট্যকার হিসাবে চিনতে পারে। শরৎচন্দ্রের ষোড়শী নাটকে জীবানন্দরূপী শিশিরকুমারের অভিনয় নৈপুণ্যই ভাস্বর হয়ে থাকবে চিরকাল।

তিরিশে অক্টোবর সেই ষোড়শী পড়বার জন্য এলেন। আগের সপ্তাহের চেয়ে শরীরটাও ভালো মনে হল, নিজেও বললেন—শরীরটা ক'দিন পরে একটু ভালো। তবে ফুলোটা এখনও কমে নি। ডাক্তার এসেছিল, কারণটা বলতে পারলে না।

রাজনীতির কথা তুললেন—গান্ধিজী বাঙালীদের একেবারে দেখতে পারতেন না। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বাঙলা দেশে কোয়ালিশন হতে না দেওয়া। বললেন—কোয়ালিশন করা পাপ। অথচ সেদিন শরৎ বোসের সঙ্গে ফজলুল হকের কোয়ালিশন হতে দিলে বাঙলা দেশে মুসলীম লীগের নাম-গন্ধ পর্যন্ত থাকত না। বাঙলা দেশে মুসলীম লীগের সৃষ্টি হল একটি আলিঙ্গনে—পশ্চিম আর পূর্বের মিলনের জন্য জিন্না আর ফজলু চাচার আলিঙ্গন ঘটানর ফলেই মুসলীম লীগের জন্ম হল। ফজলু চাচাকে তখন লেখাপড়াজানা লোকরা খুবই খাতির করত; তাদেরই বিশেষ অনুরোধে ফজলু চাচা শেষ পর্যন্ত জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন।

পাকিস্থান ইসলামের গৌরবের জন্যে তভটা হয় নি যতটা হয়েছে হিন্দুবিদ্বেষের জন্যে। মুসলমানদের দিয়ে কিছু হবে তা আমি আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিছু হলেও হতে পারে। ঐ যে ঈজিপ্টের নাসের—ওকে দেখেই মনে হচ্ছে কিছু হতে পারে। ওর দেশে তো কিছুই পাওয়া যায় না তুলো ছাড়া, Long-staple Cotton না? সেই তুলো যখন কিনবে না বললে, তখন তার উত্তর দিলে আরব ফেডারেশন করে। প্যান-আরবের কল্পনা বোধ হয় প্যান-ইসলামেরও আগেকার! প্রথম মহাযুদ্ধের আগেরই হবে হয়ত।

এই সময় বরিস পাস্তারনাকের ডঃ ঝিভাগো নিয়ে তুমুল আলোচনা চলেছে। তাই জানতে চাইলেন—ডঃ ঝিভাগো কেমন বই হয়েছে? কলকাতায় পাওয়া যাচ্ছে? শুনছি নাকি টলস্টয়ের মত ভাল লেখা হয়েছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

একজন বললেন—বইটাতে কিছু উল্টোপাল্টা কথা আছে বলে ওঁর দেশে কেউ পছন্দ করে নি।

বললেন—ওই তো ওদের দোষ, একটু এদিক ওদিক হতে দেবে না। বড্ড মিছে কথা বলে। (এখানে আবার কমু নেই তো কেউ, তাহলে তারা আবার চটে যাবে।) রাশিয়ানদের মধ্যে একটা blood-thirsty ভাব আছে। ঐ দেখ না বলগা—কোথায় গেল সে? উলান বাটোরে তিন মাস তার খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

বলা হল—সে মলোটফ। বুলগানিন স্টেট ব্যাঙ্কের গভর্নর হয়েছেন।

এবার ষোড়শী নাটক ধরলেন—ষোড়শী নাটকটা incomplete রয়ে গেল, complete করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একটা দুর্ঘটনার জন্যে হল না। এখন যা আছে তাতে অভিনেতাদের চেষ্টাতেই দাঁড়ায়।

বইয়ের শুরুতেই এই যে detailed directions এটা সব কিছু বেঁধে দেয়। এতে অভিনেতাদের করবার কিছু থাকে না। আগে কিন্তু এমন ছিল না। ঐ Second Mrs. Tancred লিখেছে পিনেরো না কে—মানে যে ইংরেজী নাটকে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল তার সময়েও এত বেশি থাকত না। এটা ইবসেনের সময় থেকেই শুরু বলা যায়, আর সবচেয়ে বেশি বলেছেন শ'।

জীবানন্দের কোনও কিছুর ওপরই লোভ নেই তা বেশ বোঝা যায়। বিছানায় একটা দামী শাল পাতা, সোনার ঘড়ি ছাইদানি, হাত মুছচে ঢাকাই চাদরে।

এই যে বিষ দেওয়ার কথা এইটাই বার বার বলেছেন উপন্যাসে। আমরা অবশ্য ওটা বাদ দিই। চোখ বুজে ওষুধ খাওয়ার কথাটাও ঠিক রাখিনি। ষোড়শী এসে মুখে ঢেলে দিত, জীবানন্দের মুখের ওপর আলো পড়ত, আর তাতেই তার মুখের আঁচিল দেখতে পেয়ে ষোড়শী চিনতে পারত।

জায়গায় জায়গায় এমন ভুল ডাইরেকসন দেওয়া আছে যে হাস্যকর। অবশ্য সবটাই শরৎদা'র দোষ নয়।

আজকাল নাটকের উপাদান আমাদেরই আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। সেইগুলো গুছিয়ে লিখলেই হবে, তবে কোন নারায়ণ-টারায়ণ দিয়ে কিছু হবে না।

তারকদা' বললেন—নাটুকে রামনারায়ণও কি ঐ দলে পড়েন?

ব্যস্তভাবে বললেন—না, না, সে রামনারায়ণের কথা বলছি না? তিনি নমস্য লোক ছিলেন। তাঁর নাটক সত্যিকারের ভালো নাটক। কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকটা কাটাকাটি করছিলুম কিন্তু ও আর এখন প্রকাশ করব না, তাহলে আবার অন্য কেউ ব্যবহার করে ফেলবে।

ষোড়শীর কথাতেই এলেন আবার—ষোড়শীর সময় থেকেই শরৎদা'র সঙ্গে বিরোধ বাধল। নৃপেন না জেনে আমার কতটা ক্ষতি করেছে! না, ও বোধ হয় জানেও কিছুটা।

আমি ওঁর কথাগুলো একটু ডায়ালগের মত করে বলেছি বলে উনি বললেন (আমাকে অবশ্য সরাসরি বলেন নি)—আমার কথা কুকুরের মুখে দিলেও জমে যায় আর শিশির সেগুলো বদলায়।

তাতে আমি বললুম—কই দাদা জমেনি তো। পল্লীসমাজ ঝগড়া করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে স্টার থিয়েটারকে দিলেন কিন্তু চলল না। তখন আবার আমার কাছে এনে দিয়ে বললেন—যা ভালো বোঝ কর।

আমি বললাম—এখন একটা ছাঁচ করে ফেলেছেন আর কি করব বলুন।

পানিত্রাসে যেতে হলে কোন স্টেশনে নামতে হয় যেন—কুলগাছিয়া, একবার কুলগাছিয়ায় যাবেন, হাওড়া স্টেশনে নাবিয়ে দিতে গেছি। তা আমায় বললেন—তুমি চল।

গাড়ী ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে চললুম। যেতে যেতে দেখি খালি একটা থার্ডক্লাস কমপার্টমেণ্টে আমার দুই বন্ধু বসে, বললুম—শরৎদা বেশ ভাল সঙ্গী পাওয়া গেছে, চলুন এটাতেই ওঠা যাক, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

উঠলেন, কিন্তু তারপরেই গাড়ী ছাড়ার মুখে মুখে বললেন—না ভায়া, আমি ওদিকেই যাই। বলে সেকেণ্ড ক্লাসে গিয়ে উঠলেন।

আমি বললুম—আচ্ছা, স্টেশনে পৌঁছে আপনার সঙ্গে দেখা করব, এখন এখানেই থাকি।

শরৎদার মনোগত ধারণা ছিল সব মেয়েই সতী সাবিত্রী। তাই তাঁর সব নারী-চরিত্রই সতী, এমন কি সাবিত্রী পর্যন্ত। শরৎদা'র সঙ্গে আমার বিরোধের আর একটি কারণ—বঙ্কিমচন্দ্র। আমি তখন কৃষ্ণকান্তের উইল রিহার্সাল দিচ্ছি, হঠাৎ একদিন শরৎদা এসে হাজির। দেখে বললেন—এইসব 15th rate বইগুলো যে কেন কর বুঝতে পারি না।

তাতে আমি বললুম—দাদা, আপনি আর এর চেয়ে ভালো লিখলেন কোথায়? আজও তো আপনি সেই রোহিণী আর হীরার চরিত্রেরই অনুকরণ করছেন। ওদের চেয়ে ভাল একটা চরিত্রও কি আঁকতে পেরেছেন? শুনে রাগ করে চলে গেলেন, আর সেই থেকেই বিরোধের শুরু।

রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ সালের আগে চোখের বালির ভূমিকায় লিখেছিলেন—আজকের দিনের অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী যা করত তাই বিনোদিনী আর কৃষ্ণকান্তের উইল চোখের বালি। চল্লিশ সালের পর সেটা উড়িয়ে দিয়ে উপদেশপূর্ণ ভূমিকা জুড়ে দেন।

রবিবাবু উপন্যাস এমন কিছু ভালো লেখেন নি, এক গোরা ছাড়া। গোরাতেও বিশ্বমানবতা ইত্যাদি ঢুকিয়ে দিলেন। ললিতা চরিত্র ভালো, বেশ ভালো কিন্তু সুচরিতার প্রেমের অপূর্ব বেগ। চতুরঙ্গও ভালো উপন্যাস।

বিনয়দা বললেন—কিন্তু এতে দামিনী যে ভাবে বেড়ে গেল তাতে উপন্যাসের structure ধ্বসে পড়ে।

বললেন—জীবনে অমন হয়।

নাটকও উনি খুব ভালো লেখেন নি, তবে লিখতে পারতেন। কিন্তু মঞ্চের সঙ্গে তো মেশেন নি না সেটাও ঠিক নয়, মেশবার চেষ্টা করেছিলেন। অমর দত্তর সময় স্টার থিয়েটারে প্রায়ই আসতেন, তা ছাড়া ওঁদের বাড়িতেই তাঁরা অভিনয় করেছেন। কিন্তু উনি ছিলেন স্পর্শকতর, তাই মিশতে পারেন নি।

আমাদের বিদেশীরা কি বলেছে তার ওপর খুব শ্রদ্ধা আছে। সেদিন শ্রীমান এসেছিল, আমায় বললে—রাশিয়ানরা আমাদের অভিনয় দেখে কি সব যেন বলে গিয়েছিল; আপনার কাছে কি লেখা আছে নাকি?

রবীন্দ্রনাথেরও এক সময় এই রকম ধারণা ছিল। তারপর কেম্‌ব্রিজের History of literature-এ ওঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য বেরুল—তখন উনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তারপর থেকে বিদেশীদের মন্তব্যের উনি আর কোন মূল্য দেন নি।

রবিবাবু সম্বন্ধে ওদেশে অন্যরকম ধারণা ছিল। আমেরিকা যখন গেছেন—ক্ষিতীশ সেন বলেছেন—ওর লম্বা দাড়ি আর flowery robes দেখে লোকের ধারণা হয়েছে উনি বোধ হয় prophet। উনি নিজেও ভাবতেন, উনি একজন prophet।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা বলছি না। ওঁর কবিতার Lyrical qualityর তুলনা হয় না, বিশেষ করে শেষ সাতটি বই—রোগশয্যায় ইত্যাদি। তবে মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এই Lyrical qualityর সূত্রপাত হয়। অবশ্য তখন তাঁর লেখায় বৈচিত্র্য খুব ছিল না।

বলা হল, অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শৌভনিকের অভিনয়ে বলেছেন যে, থিয়েটারে লেখাপড়া জানা কেউ অভিনয় করতে আসে নি।

শুনে হাসলেন—অহীন্দ্র বলেছে বুঝি? তা না হয় বললে।

তারপর রসিকতা করে বললেন—অহীন্দ্র বলবে না কেন? তোমরা ওর নাম দিয়েছ নটসূর্য। এখন নটসূর্য বলছেন—আমি কর প্রসারণ করছি, তোমরা ধারণ কর।

মাইকেলের নাটক অপূর্ব রচনা। কৃষ্ণকুমারীর মত নাটক তো দেখি না। একেই কি বলে সভ্যতা-ও খুব ভাল প্রহসন। দীনবন্ধুর সধবার একাদশী একেই কি বলে সভ্যতা-র উল্টো দিক। দীনবন্ধু বলতে চেয়েছিলেন, সভ্যতা তোমরা পাওনি, তাই সধবার একাদশী।

দীনবন্ধুর সধবার একাদশীতে নিমচাঁদের চরিত্র কেউ কেউ বলে মাইকেল, কিন্তু মোটেই তা নয়। তাছাড়া নিমচাঁদের চরিত্রে তো খারাপ কিছু নেই, বরং

বেশ ভালো ভালো কথাই বলেছে। নিমচাঁদ মদ খেত বলেই কিছু করতে পারত না। মৈনাকের মতো—দুই পক্ষ ছিন্ন তার পারে না উড়িতে।

তখনকার দিনে কাগজে লেখা বেরুলে আর কেউ অবিশ্বাস করত না। মুদির দোকানে বলত—বঙ্গবাসীতে বেরিয়েছে। তখন মুদির দোকানে খুব বঙ্গবাসী পড়ত। মাইনর পড়া একজন পড়ত আর বাকিরা বসে শুনত।

তখন মুদির ছেলেরা মাইনর পড়ত, আমি চার বছরের মত মাইনর স্কুলে পড়েছি, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সেকরার ছেলে, মুদির ছেলে পড়ত। তখন মাইনর পাস করলেই থার্ড ক্লাসে ওঠা যেত। তবে ঐ সব ছেলেরা বড় একটা পাস দিত না। দু' তিন বছর পড়ে মোটামুটি শিখে নিয়ে ছেড়ে দিত।

একজন বললেন—খাতা লিখতে শিখেই ছেড়ে দিত আর কি!

বললেন—হ্যাঁ, খাতা লিখতে তো শিখতই। মাইনর স্কুলে দু'বছর পড়লে শুভঙ্করী একেবারে তৈরী হয়ে যেত। তখনকার দিনে স্কুলে লেখাপড়া খুব ভাল করেই শেখান হত আমি তো কোন ভাল স্কুলে পড়ি নি, বঙ্গবাসীতে পড়েছি। সেখানে আমাদের এক মাষ্টার ছিলেন, নাম বরদাবাবু—এম-এ নয় শুধু বি-এ পাস, কিন্তু ইংরেজি যা পড়াতেন তার তুলনা হয় না। সেকেণ্ড ক্লাসে আমাদের কম্পোজিশন পড়াতেন, এক একটা কম্পোজিশনে বেশ খানিকটা সেক্সপীয়র পড়িয়ে দিতেন। দৃষ্টান্ত বোঝাতে একটার পর একটা পড়ে শোনাতেন!

অবশ্য তখন একটা সুবিধে ছিল। ক্লাশে আমরা ছেলে ছিলুম মোটে আটত্রিশ জন। কলেজে অবশ্য আমাদের সময়েও ছেলে বেশি হত—থব ফার্স্ট ইয়ারে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমরা ছিলুম একশ উনিশ জন।

ওদের দেশে যাওয়া উচিত ঘুরেটুরে দেখবার জন্যে। তাছাড়া দলবল নিয়ে ঘুরে আসা উচিত।

গাড়ীতে ফেরার সময় কথা হল, গিরিশবাবু সম্বন্ধে বললেন—গিরিশবাবুর উপযুক্ত দাম দেওয়া হয় নি। ওঁর কতকগুলো বই সত্যি ভালো যেমন শ্রীবৎস-চিন্তা—পড়লে মনে হয় আজকের কথা লিখেছেন। তবে দোষও কতকগুলো ছিল। কিছু কিছু বই একেবারে খারাপ লিখেছেন। অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। থিয়েটারে অভিনয় করাতে হবে অথচ বই নেই। তাছাড়া সাধারণ দর্শকের রুচির ওপর বড় বেশী জোর দিয়েছেন। অথচ উনি ইচ্ছা করলে দর্শকদের রুচি উন্নত করতে পারতেন। থিয়েটারের জন্যে হাজার হাজার টাকা দিয়েছেন অথচ থিয়েটারের ওপর কখনো মায়া পড়ে নি। ছেলেকে বলেছিলেন—কখনো থিয়েটারের মালিক হ'সনে।

ওই নভেম্বর যখন এলেন শরীরটা আবার খারাপ মনে হল, বললেনও—শরীরটা ক'দিন থেকেই খারাপ যাচ্ছে। নিজেই আবার বললেন—সেদিন দেখেছিলুম কাগজে, মিসেস সামথিং. অ্যালেন ৩ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে আমেরিকান র‍্যাপের্টরি থিয়েটারকে (তিন মিলিয়ন ডলার মানে আমাদের দেশের দেড় কোটি টাকা)। থিয়েটারকে কি পরিমাণ ভালবাসে বোঝ ; আর টাকাও কি পরিমাণ আছে ভেবে দেখ।

একজন বললেন—ওদের সবচেয়ে নামকরা মিলিওনেয়ার বোধ হয় রকফেলার।

বললেন—রকফেলার তো মিলিওনেয়ার নন, বিলিওনেয়ার। ওঁর কত টাকা নিজেই জানেন না। রকফেলারের কাছে যে-ই যেত তাকেই এক ডাইম করে দিতেন। না নিলে আবার তাঁকে অপমান করা হত। আমরা যখন নিউ ইয়র্কে যাই ১৯২০-৩০ সালে, তখন slump, কাগজে খবর বেরল যে তিনি এখন slump বলে এক ডাইমের জায়গায় ৫ সেণ্ট করে দিচ্ছেন। (বোধ হয় উনি একটু ভুল করেছেন, কারণ ১ ডাইম—৫ সেণ্ট। হয়ত নিকেল বলতে ডাইম বলেছেন।)

এই সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, বললেন—ও, আপনি? আপনার ত বেশ কম বয়স বলে মনে হচ্ছে, চল্লিশ হবে?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে জানালেন, না। বললেন—হবে না। তাহলে তো বেশ কম বয়স।

ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে ১৯৬৩ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজে নিয়ে গিয়েছিলাম।

বললেন—তা হবে।

ভদ্রলোক আবার বললেন—আপনি বলেছিলেন, নাটক লেখার অপরাধে একদিন এই কলেজের কেমিস্ট্রীর প্রফেসারকে তাড়ান হয়েছিল।

বললেন—বলেছিলুম? তাও হবে!

এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো বলছিলেন তাতে খুব অন্তরের যোগ ছিল না এবার আপনা থেকেই পুরানো কলেজ-জীবনের স্মৃতিকথা বলতে সুরু করলেন। কামরাঙা মানে ক্যামেরন আর মাকু মানে ম্যাকলীন। এরা আমাদের সময়েই আসে। এই এডিনবরা ইউনিভার্সিটির মানে আশুবাবুর সময়কার বি-এর চেয়ে কোন অংশে ভালো নয়, বরং নিরেশ।

মাকু যখন প্রথম আসে আমরা তখন ফোর্থ ইয়ারে—আমাদের ১০।১২ জনের

Tutorial নিতে এল। আমাদের সঙ্গে শ্রীকুমার, সুকুমার, শহীদ সুরাবর্দি (স্পেনে পাকিস্থানের রাষ্ট্রদূত) পড়ে। তাছাড়া আমিও ছিলুম। তা প্রথম দিন ক্লাসে এসে বললে, তোমরা কি পড়তে চাও?

তা বলা হল, আমরা অনার্সে মোট তিনখানা সেক্সপীয়রের নাটক পড়ি, সেগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোন একটা সেক্সপীয়রের বই পড়াও। কি একটা খুব পরিচিত বইয়ের নাম করা হল—তাতে বললে, দেখ, ও বইটা আমি পড়িনি।

এসে টেসে করাও। তাতে বললে—My English composition is not very good. এদিকে সরল খুব ছিল। তা ক'দিন পরেই ওকে 1st yearএ পড়াতে দেওয়া হল——আর অন্য প্রফেসাররা বলে দিলে ওরকম করে সব কথা খুলে বলো না। তা কিছুদিন পরে দেখলে সুবিধা হচ্ছে না, তখন কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

কামরাঙা ওর চেয়েও খারাপ পড়াত। একজন একবার ওর পড়ান লিখে নিয়ে গিয়ে ল্যাম্ব সাহেবকে বলেছিল—দেখ কি ভুল পড়ায়। ওর কাছে আবার পড়ব কি? আর সেই শেষ পর্যন্ত হল প্রিন্সিপ্যাল। কাউকে বলতে শুনেছি—ও নাকি খুব ভাল পড়াত। কি পড়াত? Economics!

মংকু মানুষটি খুব সরল ছিল আর থিয়েটারের ওপর ওর ঝোঁকও ছিল। সেক্সপীয়রের যে ক'টি নাটক ও অভিনয় করেছিল সে ক'টি খুব ভাল জানত। নরেশের সঙ্গে অভিনয় করেছিল—নরেশ সাইলক আর ও অ্যান্টোনিয়ো।

এডিনবরা বা এবারডীন ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটরা যে কিছু শিখত না একথা ওয়ান সাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন, বলতেন তোমরা কি ভাব তোমাদের শেখাতে এসেছি আমরা? ইংরেজী তোমাদের যেমন আমাদেরও তেমনি বিদেশী ভাষা।

এই সময় আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। জিগ্যেস করলেন, কার ভাই বললেন? পঞ্চানন দাস?

ভদ্রলোক বললেন, পঞ্চানন দাস মুখার্জির ভাই।

বললেন--হ্যাঁ হ্যাঁ, পঞ্চানন দাস মুখার্জির কথাই বলছি। ইকনমিকসে অনার্স ছিল।

ভদ্রলোক বললেন—চেনেন তাঁকে?

উত্তর দিলেন—চিনি বৈ কি! ওর ভাই পান্নালাল তো ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পঞ্চাননের মত ওরকম ভালো ছেলে আমি খুব কমই দেখেছি। পান্নালাল

আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ছিল। ও শুধু আমার বন্ধুই ছিল না, ছিল ভায়ের মতো। ১৯১২ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত এমন রাত খুব কমই আছে যেদিন আমরা একসঙ্গে থাকিনি। বাড়িতে লোকজন কেউ না থাকলে আমি ওদের বাড়িতে যেতুম আর বেশীর ভাগ দিন রাত্তিরে ও আমার বাড়িতে খেত। রাত্তিরে দুজন বেড়িয়ে ফিরতুম রাত বারটার আগে কোনদিন নয়—তখন বি-এ পাস করেছিল, —তারপর বাড়িতে এসেছি জানান দিয়ে আমরা আবার বেরতুম।

আমি তখন বাদুড়বাগান সেকেণ্ড লেনে থাকি। ওখান থেকে সাকুলার রোডে পড়ে গ্রীয়ার পার্কে—সেখান থেকে তখন পুলিশের তাড়া খেতে হত না—এধার ওধার ঘুরে চারটে নাগাদ এসে শুতুম। এই সময় নানা রকম আলোচনা করতুম আমরা, মানে পলিটিক্স থেকে সুরু করে, নাটক মায় সাহিত্য পর্যন্ত।

নাটকের কি ভাবে উন্নতি করা যায় এ নিয়ে অনেক কথা বলত সে। বিজ্ঞানের ওপরও ঝোঁক ছিল তার। বোধ হয় অনেকদিন আগে আমাকে বলেছিল, হাউইএর মত কোন যন্ত্রের সাহায্যে আমরা চাঁদে পৌঁছতে পারব।

বুদ্ধি ওর খুবই বেশী ছিল; কিন্তু কেমন একটা বৈরাগ্যের জন্যে কিছু হল না। মাইনর পরীক্ষায় ও হল ফার্স্ট আর আমি ওর ন'জনের নীচে টেনথ। এন্ট্রান্সে ও হল থার্ড না ফোর্থ, আর আমি শুধু পাস করলুম। ফার্স্ট আর্টসে ও বোধ হয় আরো উঁচুতে, না বোধ হয় সিক্সথ, তারপর বি-এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স, কিন্তু এম-এসসিতে কোনরকমে পাস করলে। তাও ওর মাষ্টার মশায় চন্দ্রভূষণবাবু বললেন, ও ফেল করলে only chemist in the batch ফেল করবে। শুনে ওকে পাস করায়।

ওর কেমিষ্ট্রি অনার্স কোশ্চেন either or ছিল, তার একটা অংশ ছিল এতই শক্ত যে কেউ চেষ্টাই করেনি। সেটা বোধ হয় প্র্যাকটিকাল। এক্সপেরিমেন্ট ও আরম্ভ করেছিল ভালোই, প্রফেসার, ডিমনেস্ট্রেটর সবাই সাহস দিচ্ছে। হঠাৎ মাঝপথে কি হল সিগারেট ঝাড়তে গিয়ে যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে সব তছনছ।

ও পরীক্ষার আগে বড় নার্ভাস হয়ে যেত। একবার দুটোর সময় পেপার আরম্ভ—ও গোলদীঘিতে সিগারেট খাচ্ছে আর ছড়ি হাতে পায়চারী করছে। পনর মিনিট হয়ে গেছে এমন সময় কে একজন দেখতে পেয়ে বলছে—পান্না আজ পরীক্ষা না?

তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলছে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ তো পরীক্ষা। ভেবে পাচ্ছিলুম না কি কাজ আছে। চল যাই।

ওর এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে কোন বিষয়ে তর্ক করতে পারত।

এবার ষোড়শী পড়তে শুরু করলেন। প্রথমে বললেন—ষোড়শীর দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটা বেশ বড় আর খুব ভালো লেখা কিন্তু কেমন যেন দরকচা মেরে গেছে।

ষোড়শী-জীবানন্দের কথোপকথনের অংশটা পড়ে বললেন—জীবানন্দ এখানে বলতে চাইছে তুমি আমায় স্বামী বলে স্বীকার কর কি না?

এর পরের দৃশ্যে নির্মল জীবানন্দ আসার পর যে সব কথা বলেছে সে সম্বন্ধে বললেন—নির্মলের কথাগুলো অস্বাভাবিক নয়। এখানে সে একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে—caught with the Jampot in hand.. ষোড়শীর এটা deliborate। নির্মলকে ধরে এনেছে জীবানন্দকেও ডেকে পাঠিয়েছে। অবশ্য জীবানন্দ এসে পড়ায় নির্মলের অস্বস্তিকর অবস্থা হয়ই আর অভিনয়ে সেই অস্বস্তিকর অবস্থাটাই তো ফুটিয়ে তুলতে হবে। এখানটা একটু খাপছাড়া লাগে, কিন্তু কি করব বল! এই দুটো সিনের আগে ছোট্ট একটা সিন যদি লিখে দিতেন তাহলেই হৈমর কি দেখে ষোড়শীর লোভ হয়েছিল সেটা বোঝা যেত।

বাংলাদেশে দুজন সত্যিকারের নাট্যকার হতে পারতেন—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ মিশতে পারলেন না বলে হলেন না, আর শরৎদা হলেন না চেষ্টা করলেন না বলে। ওঁকে কতবার বলেছি—লেখার ভাষায় অভিনয় করা যায় না বলেই কথা বদলাই, আপনাকে অশ্রদ্ধা করে নয়।

তা কথাটা উনি বুঝলেন না। ওঁর লেখার মধ্যে ঐটাই দোষ হয়ে দাঁড়ায়। তবে ওঁর লেখায় ছিল রিয়েলিজম্। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে কেবলই তত্ত্ব আর উপমা—অবশ্য সাধারণ ভাবে কথাও তিনি অমনি করেই বলতেন।

এই সময় বিনয়দা বললেন—শরৎচন্দ্রের নাটকে নায়ক-নায়িকারা একই ধরনের, তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের বড় অভাব।

বললেন—শরৎদা'র নাটকের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব আছে, একথাটা কিছুটা সত্যি। রবীন্দ্রনাথের নাটকে হাটুরে লোকের কথা, মেয়েরা যাচ্ছে তাদের কথা, এমন কি ভাণ্ডারীর কথা পর্যন্ত উনি সুন্দর তুলেছেন; কিন্তু ভদ্রলোকের কথায় এলেই উনি বৈচিত্র্যহীন। সে যদি বল, একটি মাত্র লোকের লেখাতেই বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশবাবুর লেখাতেই নায়িকা বা নায়কের বৈচিত্র্য দেখা যায়।

এবার চা এল, বই বন্ধ করে চা খেতে খেতে অন্য গল্প জুড়লেন—আমাদের থিয়েটার ঠিক মত বাড়তে পেল না। প্রথম দিকে নাটক ছিল যাত্রা-ঘেঁষা, অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু হঠাৎই সেটা একেবারে পশ্চিমীদের নকল হয়ে গেল। ওরকম থিয়েটারও তো আমাদের প্রাচীনকালে ছিল, থিয়েটারের উন্নতি করতে হলে যাত্রার সঙ্গে মিল ঘটিয়ে অভিনয় করানো দরকার; তবে তার জন্যেও তো পরীক্ষা করা চাই। যাত্রার ঢোকা-বেরোনোটা আমার ঠিক ভালো লাগে না—হয় দূর থেকে ঢুকে আসা, নয়ত আসরের এক পাশে বসে থেকে টুপ করে উঠে পড়া। জাপানে এর জন্যে টানেলের ভেতর দিয়ে আসার ব্যবস্থা আছে। জাপানে অবশ্য হয় খুব বড় এরিয়া নিয়ে; চীনের কিন্তু আমাদের মত ছোট।

পুরানো ডালহাউসি ইন্‌স্টিটিউট—যেটা এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে—এতে বেশ সুন্দর একটা এপ্রন স্টেজ ছিল। ওখানে আমি প্রথম অভিনয় করি ১৯১৩ সালের শেষ দিকে। একটা বই ঠিক করে অভিনয় করার ব্যবস্থা হল। ও হলের ভাড়া ছিল ১০৲ টাকা, প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব ঐ টাকাটা দিয়েছিল। প্রফুল্লর অভিনয়ের দিকে একটু ঝোঁক ছিল। ওয়ার ফণ্ড না কি ফণ্ডের জন্যে চ্যারিটি হিসেবে অভিনয় করা হল—১৭০০৲ উঠেছিল। প্রফুল্ল বললে ১৭০০৲ দেওয়া যায় না; সে আরো ৮০০৲ দিয়ে ২৫০০৲ করে ফণ্ডে জমা দিলে।

সেই আমার বাইরের লোকের সামনে প্রথম অভিনয়। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল winter visitor, তারা আমার অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। কিন্তু ও প্রশংসার খুব বেশী মূল্য দেওয়া যায় না।

থিয়েটার আর্টস কাগজটা আমাকে পাঠায়। ওদের কাগজের চব্বিশ বছর ধরে এডিটার ছিলেন—কি যেন নাম ভদ্রমহিলার—এখানে আসেন। আমি তখন তারাকুমারের বইটা (জীবনরঙ্গ) করছি। অভিনয় দেখে এসে আমায় গ্রীণ রুমে বললেন—"Mr Bhaduri, you are one of the greatest actors of the world. আমার চৌষট্টি বছর বয়স, এর মধ্যে এমন অভিনয় খুব কমই দেখেছি। আমার এখন হংকং, চীন যেতে হবে; ফিরে এসে তোমার সব নাটকের অভিনয় দেখব।" তিনিই পাঠান।

কে একজন বললে—ডেম সিবিল থর্ণডাইক বোধ হয়।

বললেন—না, ডেম সিবিল থর্ণডাইক নয়। সিবিল থর্ণডাইক তো বৃটিশ। উনি আমাকে সামনাসামনি খুব প্রশংসা করলেন। নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন; কিন্তু

দেশে গিয়ে লিখলেন, "Calcutta is a place where most modern theatre flourishes side by side with the mediaeval type".

ওরা আমাদের প্রশংসা কোনদিনই করতে পারে নি; আজকাল তো আরো পারবে না, কেন না এখন ওদের থিয়েটার খুব নীচু স্তরের।

একজন প্রশ্ন করলেন—কন্টিনেণ্টাল থিয়েটার দেখেছেন কিছু?

বললেন—কন্টিনেণ্টাল থিয়েটার দেখি নি। তাছাড়া ফরাসী ভাষাও তো জানিনা, তবে শুনেছি ওদের নাটক খুব ভালো জাতের হয়। ভাষা না জানলে রসগ্রহণে অসুবিধে হয় বটে, কিন্তু এমনও কেউ কেউ থাকেন, যিনি ভাষা না জানলেও রস ঠিক ঠিক ধরতে পারেন। আমেরিকার এক বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক আমাদের অভিনয় দেখে নিউইয়র্ক সানে লিখেছেন—The love of Rama and Sita will ever contiune for ever and ever. অর্থাৎ বিরহ তাদের প্রেমকে ম্লান করতে পারবে না।

হুবহু বই-এতে যে কথাগুলি আছে তারই অনুবাদ।

একটাও ভাল নাটক লিখতে পারলে না। কিন্তু ওদের চেষ্টা আছে খুব, একটা চরিত্র তিনজন অভিনয় করলে তিন রকম interpretation দেবে, মানে তার যে রকম মনে হয়েছে। কতটা ভাবে বুঝে দেখ। তাছাড়া, তারা অভিনয়ের ইতিহাস খুব যত্ন করে লিখে রাখতে চেষ্টা করে। আমাদের দেশে ইতিহাসই নেই। গিরিশবাবুদের নাম হারিয়ে গেল, রইল খালি রবিবাবুর নাম। কাগজে সত্যিকারের সমালোচনা তো আর বেরোয় না! সমালোচকরা অন্যদেশে দর্শক তৈরী করে, নাটকের উন্নতির পথ দেখায়। আমাদের দেশে কোথায়?

আমরাও পাব্লিসিটি বুঝতুম না, আজকালকার ছেলেরা ওসব খুব বোঝে: আমি প্রথমে ওকথা বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু এখন দেখছি পাব্লিসিটিরও দরকার আছে।

চাএর পালা শেষ হয়ে গেল। আবার ষোড়শী পড়তে সুরু করলেন, বললেন—শিরোমণি বা জনার্দন কমিক রিলিফ দেবার জন্যে সৃষ্টি হয় নি। ওগুলো সত্যি চরিত্র—ওরকম অনেক দেখা যায়। তাছাড়া ভিলেন হলেই যে হাসবে না এমন কোন কথা নেই। তবে ওরা কোন সময়েই দর্শকদের সিমপ্যাথি পায়না, বরং শেষ দৃশ্যে শিরোমণি যখন বলে—সর্বনাশ, ও আমাদের সর্বনাশ করবে। দর্শকরা তখন হাসে, বলতে চায়—কেমন মজাটা টের পাও!

শিরোমণি যোগেশদা খুবই ভাল করেছিলেন, কতকগুলো চরিত্র তো ওঁর মতো আর কেউই করতে পারে না।

বোড়শীতে শেষ পর্যন্ত বলা হচ্ছে—জমিদার থাকবেনা, শোষক থাকবেনা, থাকবে শুধু ঐ চাষীর দল।

হঠাৎ পড়া থামিয়ে বললেন—আজ এই পর্যন্ত থাক। এবার গল্প করা যাক।

রাজনীতিকদের সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন—রাজনীতিকদের মধ্যে বিপিন পালের মত অমন বাগ্মী দেখি নি। আজও যেন শুনতে পাচ্ছি—'রক্তাক্ত রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়া স্বরাজের রথ ঘর-ঘর শব্দে চলিয়া যাইবে।'

বিপিনবাবু মোটেই সাহসী লোক ছিলেন না, আর সে কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। ফেডারেশন হলের মাঠে মিটিংএ ওঁকে যখন টাকার তোড়া দেওয়া হয়, উনি তখন নিজেই বলেছিলেন, ঘরের ভেতর থেকে যখন দেখেছি বাইরে ব্রীজের উপর দিয়ে চলেছে ট্রামগাড়ী আর তার মধ্যে বসে আমারই দেশের ভাইবোন—তাদের রয়েছে খোলা আকাশ আর প্রচুর আলো হাওয়া; আর আমার ছোট্ট ঘর, আকাশ পর্যন্ত ছোট হয়ে গেছে, তখন ভেবেছি, দিই লিখে, যা ওরা চায় লিখে দিই।

রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী consistent ছিলেন। আর কি ওঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা! আমি পান্তীর মাঠ ইত্যাদি জায়গায় ওঁর বক্তৃতা শুনেছি।

সুরেন্দ্রনাথ শেষের দিকে কিছু কাজ করেছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট যা আইন করেছিলেন প্রায় পারফেক্ট—মানে যতটা হওয়া সম্ভব আর কি!

রবীন্দ্রনাথ করতে পারতেন অনেক কিছু, কিন্তু করলেন কই? কবিতায়, গানে, গল্পে উনি অনেক কিছু দিয়েছেন মানি, কিন্তু নাটক বা উপন্যাসে কি দিলেন? নাটকও লিখেছেন মোটে দু'টি।

একজন বললেন—উপন্যাসের ধারাকে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন—উপন্যাসের ধারা বঙ্কিমচন্দ্র নতুন পথে নিয়ে গেলেন বলছ, কিন্তু তার আগে কি উপন্যাস ছিল? ছিল তো গল্প? নভেল বলতে যা বোঝায় তা কোথায় ছিল? অবশ্য দশকুমার চরিতে অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে। একজনকে তো বলেছিলুম যে, সিনেমা করতে চাও ত দশকুমার চরিত কর।

রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের প্রতিভার সমাদর করেন নি। উনি আর জ্যোতিবাবু দুই ভাই মিলে খুঁত ধরতে বসলেন। প্রথম দিকের লেখায় তো যথেষ্ট নিন্দে আছেই। সেগুলো দগ্ধ করা উচিত বললেও পরে আবার ওঁর কবিতার ছন্দের কি দোষ, তাকে কি ভাবে লেখা চলত তাও লিখেছেন।

একমাত্র কিছুটা সমালোচনা লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের, তাও যেভাবে লেখা উচিত ছিল, সেভাবে মোটেই লেখেন নি। অথচ লিখতে উনি পারতেন।

একজন বললেন—বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে ভাল লিখেছেন উনি।

বললেন—বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কি লিখেছেন জানি না, তবে হ্যাঁ, ঐ একটা চরিত্র, ওঁকে নিয়ে বিরাট একটা নাটক লেখা যায়। বারটি বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য—ওঁর সার্টিফিকেটে বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে রসময় দত্তর সই আছে, ওতেই সব কিছুর বিশদ বর্ণনা আছে। উনি বেদান্ত, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, ন্যায়, সব কিছু জানতেন। অথচ দেশ ঐ রকম পাণ্ডিতকে গর্ডন ইয়ংএর মত বাচ্ছা সিভিলিয়ান অপমান করতে পারে। উনি যখন চাকরি ছাড়লেন, তখন ওঁকে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু উনি থাকলেন না। তবে তিন মাস সময় চেয়েছিলেন, বলেছিলেন—অনেকগুলো স্কুল খুলেছি, অনেক টাকা খরচ হয়েছে, তার সমস্ত দায়ভার আমার ঘাড়েই পড়ে যাবে।

তার পরের দিন ফ্রেডারিক হ্যালিডে সাহেব formal জবাব পাঠালেন—When you have resigned it is no longer necessary for you to continue.

মানুষটার কেমন সাহস ছিল দেখ। যাঁর বাপ আট টাকা ষোলো টাকা, বা চব্বিশ টাকার বেশি কখনো মাইনে পান নি, তাঁরই ছেলে অকুতোভয়ে ঋণ করে চলেছেন। বিশ্বাস আছে বই লিখে সব টাকা শোধ করে দেবেন। আর দিয়েও তো ছিলেন। বই যা লিখলেন তাও সব বিদ্যালয়-পাঠ্য অর্থাৎ যাতে শিক্ষা বিস্তার হয় তার জন্যে। উনি যা উপক্রমণিকা লিখেছিলেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখার তার চেয়ে ভাল বই আর হয় না। অথচ আজ সেকেণ্ডারি বোর্ড সে বই পছন্দ করেন না, ভাল নয় বলে! বিধবা বিবাহ দেবার আন্দোলন চালালেন একলা, তাও ইমোসানের ওপর নয়, স্মৃতির সাহায্যে।

বাড়িতে যে কেন ওঁর সঙ্গে গোলযোগ হল তা কিন্তু জানা যায় না। বাপ মা ছাড়া ভায়েদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, কিন্তু কেন?

একজন সুপরিচিত থিয়েটার-মালিকের নাম করে বললেন—সে আজ এসেছিল। বলছিল অন্য দুটো হলের তুলনায় বিক্রী কম হচ্ছে, তবে লোকসান হবে না। কোন রকমে খরচ চলেও কিছু লাভ থাকবে। একশ' রাত পার হলে আবার একটা ধাক্কা খেয়ে ভালো করে চলতে পারে।

তাকে আমি বললুম—বাবা পয়সার তো তোমার অভাব নেই, আর পয়সাও

তোমাদের থিয়েটারের দৌলতে। তা থিয়েটারের যাতে উন্নতি হয় সে কাজ তো তোমার করা উচিত।

তাতে বললে—বলুন, কি করতে হবে?

বললুম—কিছু লেখাপড়া জানা লোক নাওনা কেন? মাইনে তো খুব খারাপ দাওনা, ষাট টাকায় তো আজকাল বি-এ পাস পাওয়া যায়।

তাতে বললে—সে হবে না।

রবীন্দ্রনাথ নাকি শারদোৎসব আর কি একটা বই করেছিলেন শান্তিনিকেতনে—রথীবাবু লিখেছেন, যা নাকি খুব ভালো হয়েছিল। রবিবাবুর প্রোডাকসনের মধ্যেও ভালো হয়েছিল ডাকঘর সিম্বলিক সেটিংএর জন্যে, আর তাসের দেশ—অপেরা। এমনি নাটকে উনি স্বীকার করেছেন আমাদের প্রোডাকসনই ভালো হয়েছে। উনি আমার উপরেই ভার দিয়েছিলেন, অথচ ওঁর অফিসিয়াল বায়োগ্রাফিতে লেখা হচ্ছে, উনি নাকি অহীন্দ্রর জন্যে বই লিখেছেন। কোন্ বইটা লিখেছেন? উনি মণিলালকে চিঠি লিখছেন—আমি বাইরে যাচ্ছি, যাতে গোলমাল না হয় তাই শিশিরের ওপর প্রয়োগের ভার দিয়ে যাচ্ছি।

সে চিঠি নাচঘরে ছাপা হয়েছিল। অথচ বলেছে অহীন্দ্রের জন্যে লেখা হয়েছে। ও তো এক চিরকুমার সভাতেই নেবেছিল। ঐ বইটাও কিন্তু উনি আমাকেই লিখে দিয়েছিলেন। তার প্রথম এডিশনের কাটা বইএ কাগজ মেরে রবিবাবুর হাতে লেখা কারেকশন, এতকাল আমার কাছেই ছিল, এখন এই নতুন বাড়ি বদলাতে গিয়ে হারিয়ে গেল। তপতীর কাটা কাগজ মেরে কারেকশন করা বইটা এখনও আছে।

একজন বললেন—এসব কথার উত্তর দেন না কেন?

ম্লান হাসলেন—উত্তর দিতে হবে বলে তো কোন দিন ভাবিনি!

চিরকুমার সভা স্টার থিয়েটারে অভিনীত হবারও একটা কাহিনী আছে। বইটা পাবার পর আমি অন্য বই অভিনয় করছি, সেই সময় প্রবোধচন্দ্র গিয়ে ওঁকে বললে—এই তো শিশিরবাবু এতদিন রেখে দিয়েছেন, এখন আবার অন্য বই করছেন। উনি করবেন না। কান পাতলা লোক ছিলেন তো, তখনি ওকে দিয়ে দিলেন।

সাজাহান নাটকের কথা উঠল, বললেন—সাজাহানে ঐ যে দৃশ্যে পাগল হয়ে বলছে, তুমি ঝঞ্ঝা, আমি তড়িৎশিখা, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিই।

তারপরেই আছে—দিই লাফ, দেব লাফ। আগের দৃশ্যটা কেউ করে, না করলে সাজাহানের পাগল হওয়ার কারণটা বোঝা যায় না।

বিনয়দা বললেন—আপনার মত সবাই তো বুঝে অভিনয় করেন না, আর করতেনও না।

মাথা নাড়লেন—না না, ওকি বলছ। আমার আগে কেউ বুঝে অভিনয় করবে না কেন! ও কথাটা তো ঠিক নয়। তোমরা তো আর কেউ গিরিশবাবুর অভিনয় দেখ নি। ওঁরা তো চরিত্র বুঝেই অভিনয় করতেন।

গাড়ীতে যেতে যেতে বললেন—ট-বির ফল তো চোখের সামনেই দেখলুম, যাদের টাকা পয়সা আছে, তারা যে কেন চিকিৎসা করে না, চাপা দিতে চায়, বুঝি না। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক কোটিপতি। ছেলের অসুখের কথা চেপে রাখলেন, তারপর শেষ পর্যন্ত লসনে গিয়ে চিকিৎসা করে সারল। হয়ত আগে গেলে বেশী ভাল হত।

১৩ই নভেম্বর এলেন, সেদিনকার প্রথম কথা হল—আজকাল ভিক্টোরিয়া স্টিল কেউ পড়ে! কত তাড়াতাড়ি ডেটেড হয়ে গেল দেখ। অথচ আমাদের সময় খুব পড়ত।

নানা জনের মদ খাওয়ার কথা হলে বললেন—মদ অন্যদেশের লোকেরাও খায় কিন্তু এতটা মাতাল হয় না। আর মদে জ্ঞানলোপ হতে গেলে অন্ততঃ বছর দশেক খেতে হয়।

এবার নিউইয়র্কের একটু স্মৃতি বললেন—নিউইয়র্কে দেখেছি একটু চেনা হলেই ফ্লার্ট করে।

ডিসেম্বরে নাট্যোৎসবের কথা পাকা করতে বিনয়দা আগের দিন ওঁর বাসায় গিয়েছিলেন, সেই কথাই বললেন—বিনয় কাল আমার ওখানে গিয়েছিল।

বলা হল—আমরা জানি, যাবার আগে আমাদের সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল।

আমাদের একজনকে বললেন—বিকেল পাঁচটার সময় তুমি এখানে ছিলে? ডাক্তার মানুষ বিকেল পাঁচটার সময় এখানে বসে কি করছিলে? রুগী বুঝি ডাকেনা এখনো?

বলা হল—না, তবে আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে ডাকবে নিশ্চয়? তাছাড়া হাসপাতালে কাজ করি, প্রাইভেট প্রাকটিশ করা চলেনা।

হাসলেন—ঘন ঘন ডাকে এই তো আশা করি। হাসপাতালে কাজ করা অবশ্য ভালো, কোন্ হাসপাতালে কাজ কর?

হাসপাতালের নাম শুনে বললেন—বাঃ, বেশ ভাল জায়গা তো!

জানানো হল—কিন্তু ভি-আই-পিদের বড় উৎপাত, বড্ড জ্বালাতন করে।

হাসলেন—ও উৎপাত এখন সর্বত্র। আগে এটা ছিল না। যখন থেকে গ্রাম আলগা হতে আরম্ভ করেছে, তখন থেকেই এরকম চলেছে। আমি যখন হাসপাতালে—in the thirties—তখনই দেখেছি—আমার কাছে অনেকে আসত, খাবার ফলটল দিয়ে যেত, তাতেই curious হয়ে সিস্টার আমাকে জিগ্যেস করেছিল—তুমি কে? কি কাজ কর?

বললুম—তুমি যা ভাবছ তা নয়। I am an actor by profession, তাই অত লোক আসে।

ভি. আই. পি কথাটার পুরো হল Very Important Person.

একজন বললে—কথাটা আমেরিকানরা চালু করেছে!

বললেন—আমেরিকানরা চালু করবে কেন? তবে ওদের কথার প্রথম অক্ষর নিয়ে abbreviation করার ওপর একটা ঝোঁক আছে। ওদের সোলজারকে বলে G. I., G. I. মানে General Issue। আর্মিতে সব কিছুই জেনারেল ইস্যু, তাই সোলজারও জেনারেল ইস্যু! ব্রিটিশ আর্মিতেও সোলজারকে বলা হয় টমি অ্যাটকিনস! ওদের রেডকোটও বলা হয়। জি. আই. বলার আগে আমেরিকানদেরও কি একটা বলা হত মনে পড়ছে না।

এবার পড়ব, কিন্তু বিনয় কি রাম এখনো আসেন তো! মাতব্বর গোছের কেউ না থাকলে কার কাছে পড়ব?

বলতে বলতেই বিনয়দা ঢুকলেন, তখন আবার বললেন—আগের দিন আমরা ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য শুরু করেছিলুম, কিন্তু শেষ করিনি; কাজেই প্রথম থেকেই আরম্ভ করা যাক।

পড়তে শুরু করলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে জীবানন্দের সঙ্গে পথিকের কথা বলার অংশটা পড়ে বললেন—এই যে পথিকের সঙ্গে কথা বলতেই সে 'বাবু' বললে জীবানন্দ ভাবছে, বললে জমিদারবাবু! 'কাল আসব' বলার মানে কিছু টাকা দেব।

যখন তাকে বললে—চল, ওদিকে গিয়ে একটু নাম-গান শুনিগে। তখন সে তার গায়ের ছেঁড়া চাদর টানতে যায়, এদিক দিয়ে ছেঁড়া ওদিক দিয়ে ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ে। জীবানন্দ তখন নিজের গায়ের শাল খুলে তাকে পরিয়ে দেয়।

যে লোকটা দামী চাদরে হাত মোছে, শাল পেতে শোয়, তার কাছে একাজ করা মোটেই আশ্চর্য কথা নয়।

পথিক শেতল খুব ভাল করেছিল, গানটাও ওরই জোগাড় করা।

একজায়গায় নির্দেশ আছে 'সভয়ে,' সেখানটা পড়ে বললেন—এই দেখেছ, এখানটা সভয়ে নয়, ঠাট্টা করছে। এটা শরৎদা'র দোষ নয়, এরকম লিখে রাখা মানে অ্যামেচার পার্টির সর্বনাশ করা। তারা তো 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' করবে!

মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে জীবানন্দ, অন্যরা সে কথা এখনও জানে না। জীবানন্দের সংলাপ পড়ে বললেন—ব্যস হেরে গেল ষোড়শী, complete defeat!

জীবানন্দ সারারাত না ঘুমিয়ে ছটফট করেছে। সকালবেলা পেট চেপে শুয়ে আছে। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আগের দিন রাতে বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে যায়, ওকে কোনরকমে ধরে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এইসব গোলমালে ঘুম হয় নি।

পড়া শেষ করে বললেন—বইটা আরো ভালো করা যেত কিন্তু মাঝের তৃতীয় পক্ষের জন্যে আর হল না। শেষের দিকটা অনেক বদলেছেন। মানে যেখানে যেখানে আমার সাজেশান মতো লিখেছিলেন, সেখানে নির্মমভাবে মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছেন। এ একধরনের ছেলেমানুষী, অথচ উনি লিখলে লিখতে পারতেন, কিন্তু ঐ যে লোকেরা বোঝাল, তুমি এমন লিখিয়ে আর কে এক ভেড়ের ভেড়ে শিশির ভাদুড়ির কথায় লিখবে। তা সে কথা তো শুধু শরৎদা'কেই বলেনি, ক্ষীরোদদা'কেও ঐ একই কথা বলেছে।

ষোড়শী আমি পছন্দ করে নিয়েছিলুম। উনি আমায় দিয়েছিলেন পল্লীসমাজ। ওটা আগে স্টার থিয়েটারকে দিয়েছিলেন। তা প্রথম দিনেই (বই) মার খেল, দু'তিন দিন পরে গোলমাল হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তখন একহাতে ছাতা নিয়ে এসে হাজির হলেন। (কথাটা আমার নয় সুধার)। এসে বললেন—শিশির, এটা তুমি নাও। আমি টাকা পয়সা চাইনা, কেটেকুটে যা খুশি কর, শুধু দেখিয়ে দাও বইটা জমে।

সুধা বলেছিল—বনমালী পাড়ুই বলে যে স্কুল মাষ্টারের চরিত্রটি আছে, ওকে হোরেশিয়ো করে দিন। Ramesh is an inexplicable character! ওকে বোঝাবার জন্যে বনমালী পাড়ুইকে ব্যবহার করুন। আপনার ভাষার গুণ খুব বেশি আর শিশির বলতেও পারে ভাল, বেশ চলে যাবে।

তাইতেও চটে গিয়েছিলেন।

শেতল পাল যখন যে চরিত্রই করেছে, তাই ভাল করেছে। ওর ভেতর একটা কিছু ছিল যে। যোগেশদা'ও তো খুব ভাল অভিনয় করেছেন। উনি ছিলেন সত্যিকারের character actor—a character of unusual brilliance.

বিজয়া খুব সুইট বই, চার্লস গাভিথে্র লেখা বইএর মত—বিশেষ কিছু পদার্থ নেই, তবে হিউম্যান এলিমেণ্ট আছে, আর হিউম্যান এলিমেণ্ট থাকলেই জমে যাবে।

প্রভা বিজয়া বড ভালো করেছিল। অবশ্য কোন বইটাতেই বা ও ভালো পার্ট করে নি? সিরিয়াস পার্টই হোক আর হাসির পার্টই হোক, বড় পার্টই হোক আর খুব ছোট পার্টই হোক, সবতাতেই সে ভাল অভিনয় করেছে। তার সব চেয়ে বড় অপরাধ সে বাঙলা দেশে জন্মেছিল।

বাঙলা নাটকের আর মঞ্চের একটা সত্যিকারের ইতিহাস লেখা হল না। সবাই জানল নাটক যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গিরিশবাবুরা তো বাদ গেলেনই, রবীন্দ্রনাথের তপতীও নাটক নয়, নাটক হয়েছিল পোস্ট অফিস (ডাকঘর)। আমার নিজের জন্যে কিছু মনে হয় না, দুঃখ হয় গিরিশবাবুদের জন্যে।

বাঙলা নাটক সম্বন্ধে আগের কথাটা লিখেছে মুলুক রাজ আনন্দ। মুলুক রাজ একখানাও বাঙলা নাটক কখনো দেখেনি, অথচ কেমন মতামত লিখে বসল। আর আশ্চর্যের কথা, তার একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত কেউ করলে না।

একজন প্রশ্ন করলে, আপনি যে এতগুলো নাটক করেছেন, তার মধ্যে কোনটি আপনার পছন্দ বেশি?

বললেন—সব কটাই পছন্দ, নয়ত করব কেন? কোন্ বিশেষ চরিত্র সব চেয়ে ভালো লাগে বলতে পারব না, যখন যেটা করি তখন সেটাকে সব চেয়ে ভালো লাগে।

রবীন্দ্রনাথ বড় স্পর্শকাতর ছিলেন। টমসনের ব্যাপারটা নিয়ে কি কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটালেন। নিজেই উত্তর লিখলেন।

বিনয়দা বললেন,—না, ওটা নীহার রায়ের লেখা।

বললেন,—নীহার রায় লিখেছিল? কি জানি! আমি কিন্তু লেখার সময়েও দেখেছিলুম, যখন পড়েন তখনও শুনি। আমায় জিগ্যেস করতে গেলেন, আমি পালিয়ে বেড়াতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেল। আমি শুনে বললুম—ওটা আমার মতে না ছাপালেই ভাল।

ওঁর ভাল লাগল না, আমার ওপর রাগ হয়ে গেল।

রাত হয়ে গেছে, এবার উঠলেন। গাড়ীতে যেতে যেতে বললেন—আচ্ছা, আজকাল আর জগদ্ধাত্রী পুজো হয় না? ওপুজো করা তো শক্ত, গৃহস্থের পক্ষেও পুরোহিতদের পক্ষে তো বটেই। সব কিছু দুর্গাপুজোর মত অথচ করতে হবে একদিনে। আজকাল সংস্কৃত মন্ত্রকে বাঙলা করা দরকার, আর কিছু হোক আর নাই হোক, তাতে লোক অন্ততঃ বুঝতে পারবে।

॥ ৯ ॥

ইতিমধ্যে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, ডিসেম্বর মাসের ১১ই থেকে ১৪ই পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে নাট্যোৎসব হবে। এও ঠিক হয়েছে নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদের নিজস্ব প্রচেষ্টা হিসেবে পরে মালিনী মঞ্চস্থ করা হবে আর সেই জন্যে আপাততঃ সোমবার-সোমবার তার মহলা চলবে। পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন এবার থেকে হবে শুক্রবার। আর সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে দরকার মত নাট্যোৎসবের নাটকগুলোর মহলা চলবে।

১৪ই নভেম্বর এ নিয়ে আলোচনা করতে এলেন। প্রথমেই বললেন—আলমগীর তো করা দরকার। আলমগীর প্রথম করি ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর। তারপর ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৩৫তম বার্ষিকী পর্যন্ত করি আমার বাড়িতে। ১৯৫৬ সালেও কেমন একটা যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল যাতে ১০ না ১১ তারিখে করেছিলুম। খালি বাদ যায় ১৯৫৭ সালে। সেবারও হয়েছিল ২৩শে ডিসেম্বর—সেটা অনেক পরে। ১০।১১ তারিখ হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। প্রথম দিন দু'চার কথা বলব আর কি!

আলমগীরের পোষাক-টোষাক সব সময়েই ভালো ছিল। রাখালদা'কে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিলুম—সে অবশ্য ১৯০৪ সালে। কিন্তু মদন কোম্পানীর সময়েও বেশ ভালো ছিল পোষাক। রাজেন সেন সেই সময় কতকগুলো ছবি তুলেছিল।

একজন বললে—বিশ্বরূপায় তো ছবি আছে আপনার!

বললেন—সেটা হাফবাস্ট তো! ওটা তো কাগজ থেকে তৈরী করা। মণিলালের নাচঘরে ছাপানো হয়েছিল; সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। ছবিটা অ্যালফ্রেড থিয়েটারের পেছনে বসিয়ে তোলা।

রাজেনবাবুর কাছেই ছবির কাঁচটাচগুলো ছিল। উনি ১৯৪২ সাল নাগাদ আমায় দিতে এসেছিলেন। তাতে আমি বলি—কোথায় রাখব ওসব।

তিনি তো মারা গেছেন, সে সব কাঁচটাচ আছে কিনা কে জানে?

আলমগীর করতে কি আমায় কম কষ্ট পেতে হয়েছে! যে যা আবদার করেছে সব শুনতে হয়েছে। ঐ ঘোষ বলে একজন তম্বর খাঁ করেছিল, সে বললে—ঘর ফাটিয়ে ডাকলাম। ইত্যাদি কথা না থাকলে পার্ট ই করব না।

কুসুমকে নিয়েও কি কম হাঙ্গামা! সে আমায় এসে বললে—ম্যানেজার বাবু (তখন সবাই আমায় ম্যানেজার বাবু বলত), দেখুন, আমি দুপুর বেলায় আসব।

আমি বললুম—সে কি, কেন?

বললে—না, মানে, ছোট ছোট মেয়েরা দেখবে আপনি আমায় শেখাচ্ছেন, সে আমার লজ্জা করবে। অবশ্য শেখা আমার দরকার, কেননা এরকম তো আমরা শিখি নি। তাই বলছিলুম কি, দুপুরে যখন কেউ থাকবে না, তখন এসে শিখে নেব।

আমি বললুম—তা না হয় নেবে, কিন্তু কথাটা কি চাপা থাকবে?

তাতে বললে—আপনি রাজি থাকলেই হল, বাকিটা আমি ব্যবস্থা করে নেব।

কি আর করি, তাতেই রাজি হতে হল।

ডাঃ অধিকারী বললেন—কুসুমের শেষ দিকের অভিনয় আমার ভালো লাগে নি।

বললেন—কুসুমের শেষ দিকের অভিনয় তোমায় ভালো লাগেনি বলছ, কিন্তু ও তো চিরকাল একই রকম অভিনয় করেছে। তবে তখন সকলেই ওই রকম অভিনয় করত তাই বোঝা যায় নি। ওর চেয়ে তারাসুন্দরীর ব্যক্তিত্ব ছিল বেশি আর অভিনয় বুঝতও বেশি। কুসুম কিন্তু নাচত খুব ভালো। শেষের দিকে দেখেছি ঐ অতবড় শরীরটা নাড়ছে কিন্তু পা ফেলার আওয়াজ হচ্ছে না মোটে! চারুকে বললুম—দেখ, তোমরা দেখে শেখ।

তা সে বললে—কুসুমদি আমাদের চেয়ে ভাল নাচে।

আমি বললুম—নাচো তোমরাও ভালো কিন্তু কুসুমের ক্ষমতা আছে, ওই অতবড় শরীরটা ফেলছে অথচ পায়ের কোন আওয়াজ নেই।

আলমগীর করার সময় প্রথম দিকে একদিন খুব গোলমাল হয়েছিল। এদিকে তো খুব বিক্রী হচ্ছে, তার উপর লেডিজ সিটের কোন নম্বর নেই, যত পেরেছে বিক্রী

করেছে। বসবার যা জায়গা ছিল সব ভর্তি হয়ে গিয়ে, বক্স পর্যন্ত ভর্তি করে বসে আছে তারা। কালীবাবু, জ্যোতিষবাবু খুব ছুটোছুটি করছে, এদিকে বক্স কিনেছে যে সব বড়লোকেরা তারাও এসে হাজির—মহাবিপদ। মেয়েদের বলতে যেতেই তারা ধমকে উঠল। একজন বলল—জায়গা যখন নেই টিকিট বেচেছ কেন? যেখানে জায়গা পেয়েছি সেখানেই বসেছি। ওঠাবে কেমন করে দেখি? বেশি কথা বললে এক চড় মারব।

বীরাঙ্গনা তখনও ছিল এদেশে! সেদিন থিয়েটার আরম্ভ করতে এক ঘণ্টা দেরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কি করে মিটমাট হয়েছিল জানি না।

রাজসিংহ করতেন ললিতবাবু। প্রথমে অবশ্য করেছিলেন প্রবোধ ঘোষ। পার্ট খুব মন্দ করেন নি, তবে সুরটা তো ছিলই।

একটি বিশেষ চরিত্রের নাম করে বললেন—এটা করত 'অমুক'। চেহারাটা খুবই সুন্দর ছিল আর পার্টও ভালো করেছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু নেশাখোর হয়ে গেল। অবশ্য দোষ খুব নেই। নজরধরা চেহারা দেখে একটি মেয়ের ভালো লাগল। ও তার খপ্পরে পড়ে গেল। বাপ-মাকে ছেড়ে তার কাছেই এসে রইল। তারপর তাকে ছেড়ে একজন, এমনি করে সব মেয়ের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত মরফিয়া ধরল।

আমি একবার ওর নেশার ফল দেখেছিলুম। তখন আমরা লক্ষ্ণৌ গেছি। অভিনয়ের আগে দেখি একেবারে ছটফট করছে, চোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলা-ঘোলা, ঘাড় লটকে পড়েছে! ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হল। এদিকেও খবর দেওয়া হল, একজন অভিনেতা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন; উনি একটু সুস্থ হলে, না হয় বদলী একজনকে তৈরী করেই নাটক আরম্ভ করা হবে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে গেছে, ওকে দেখে-টেখে বললে—কোন ভয় নেই, এখনই ঠিক হয়ে উঠবে। ফুঁড়েও দিলে। ব্যস, পনেরো মিনিটের ভেতর অন্য মানুষ।

ফেরার সময় লক্ষ্ণৌ স্টেশনে ওকে নিজে ইনজেকশন নিতে দেখলুম। কিছুক্ষণ ছটফট করে ঘুরে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে সিরিঞ্জ বার করে পায়ে বসিয়ে দিলে। দেখলুম, ওষুধটা ভরবার সময় থেকেই চেহারা বদলে গেল।

শেষদিকে ও বড় লোককে ঠকাত।

ডাঃ অধিকারী বললেন—আমাকেও একবার ঠকিয়েছিল।

বললেন—তোমায় মোটে একবার ঠকিয়েছিল। রাম, তাহলে তো তুমি ভাগ্যবান।

আলমগীর প্রসঙ্গে এলেন আবার—যখন মদনে আমি আলমগীর করছি, তখন আমার কনট্রাক্ট শেষ হতে আর মাস চারেক বাকি। অন্তরা তখন বুড়োকে বুঝিয়েছে আমার নাম হলে অসুবিধে হবে, তাই ঝপাক করে আলমগীর বন্ধ করে দিলে। আলমগীরের পরে হল আলিবাবা।

প্রশ্ন করা হল, আলিবাবার আপনি কি পার্ট করেছিলেন?

বললেন—আলিবাবায় আমার কোন পার্ট ছিল না। তারপর হল রঘুবীর।

আমি ছাড়বার পর নির্মলেন্দুকে নিয়ে ওরা প্রতাপাদিত্য খুলল, বললে—আর কাউকে দরকার নেই, একলাই চালিয়ে নেবে। খুলেই ভীষণ মার খেল, তিন দিনের দিন বন্ধ হয়ে গেল। নির্মলেন্দু মোটে তিরিশ টাকা মাইনে পেত।

তখন তো অমনিই ছিল। এক সময়ে দানীবাবুও পেতেন তিরিশ টাকা করে। তবে দানীবাবুর কোনদিনই খুব পপুলারিটি ছিল না।

দেবুদা পুজোর সময় রাজস্থানে বেড়িয়ে এসেছেন, তাঁকে দেখে বললেন—এই যে বড় দেবু, কবে এলে? কতদূর ঘুরে এলে?

দেবুদা ফিরিস্তি দাখিল করলে—জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর, অম্বর, আজমীর ইত্যাদি।

শুনে বললেন—আজমীর ঘুরে এলে, তিলাকুঠি, পাথলকুঠি দেখেছ—শেঠ নেমিচাঁদের?

আমিও একবার ওখানে গিয়েছিলুম—এক আত্মীয়ের সুবাদে। খুব খাতির-যত্ন করেছিল। সে অনেক কাল আগেকার কথা, আমি তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে।

জয়পুরে তো অনেক বাঙালী ছিল। লোকে বলত—সংসারবাবুর বাসা, মুখুয্যেদের বাসা আর রেসিডেন্সীর কোঠি।

কে একজন বললে—জয়পুরের মহারাণীও তো বাঙালী।

একটু যেন আশ্চর্য হলেন, প্রশ্ন করলেন—জয়পুরের মহারাণী বাঙালী?

সে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, কোচবিহারের মেয়ে।

বললেন—ও, কোচবিহারের মেয়ে। কোচরা তো বাঙালীই নয়, তবে তিনশ' বছর আগে জোর করে ওরা বাঙালী হয়েছিল। আজকে কি আর চাইলেই তিনশ' বছরের ইতিহাস ভুলে যাবে? আচ্ছা বল তো, বাংলাদেশের আবা সেদিন কবে আসবে, যেদিন ন্যাড়ারাও স্বীকার করবে আমরাও বাঙালী হচ্ছি

সেদিন আসবেই, তার বেশি দেরিও নেই।

একটু সময় চুপ করে বসে রইলেন, তারপর একেবারে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন—দানীবাবুর অভিনয়ের মধ্যে ছিল অপূর্ব গলা, অমন গলা দেখা যায় না। তবে গিরিশবাবুর অভিনয়ের কাছে কিছুই নয়। গিরিশবাবুর অভিনয় প্রথম দেখি দক্ষযজ্ঞে—উনি সেজেছিলেন দক্ষ। এখনও মনে আছে—সবুজ রঙের সিল্কের লম্বা-হাতা জামা পরনে। দানীবাবু হয়েছিলেন শিব। ওঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ গলায়—কোথা যাই, কোথায় পালাই: ছিলাম সন্ন্যাসী, হয়েছি সংসারী ইত্যাদি বললেন।

গিরিশবাবুর কিন্তু তুলনা হয় না। একবার কমবাইণ্ড নাইটে ভ্রান্তি দেখেছিলুম, পুরঞ্জন দানীবাবু, নিরঞ্জন অমর দত্ত আর রঙ্গলাল গিরিশবাবু। সে অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল—Girish Babu first and every body else nowhere

দানীবাবু কিন্তু খুব বেশি পপুলার ছিলেন না, ওঁর নামে কোনদিনই খুব একটা লোক আসত না। সেদিক দিয়ে অমর দত্ত ছিলেন হাজার গুণ পপুলার। দানীবাবু প্রথম নাম করতে সুরু করেন ১৯০৭ সালে অর্ধেন্দুবাবু মারা যাবার পর। গিরিশবাবু তখন আর বড় একটা নাবেনই না; নাবলেও প্রফুল্লতে যোগেশ আর বলিদানে করুণাময়। চন্দ্রশেখরে প্রথম দু'তিন দিন চন্দ্রশেখর করেছিলেন, তাও ফাঁকি দিতেন। শেষ পযন্ত করতেন সুন্দরীর স্বামী—ঘরজামাই। পার্টে তো কিছু নেই—নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারার মানুষটি, কোঁচানো কাপড়টি পরে এসে ঢুকতেন, তারপর ঘাড় নেড়ে বলতেন—আস্তে, আস্তে কে শুনতে পাবে।

সুন্দরী যখন হাঁটু গেড়ে বসে গান ধরত, বলতেন—চুপ চুপ কে দেখতে পাবে।

ভূমিকায় কিছু নেই, কিন্তু কি অপূর্ব অভিনয়! চরিত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠত।

তবে বড্ড ফাঁকি দিতেন। শেখানর ব্যাপারেও তাই। দুবার বললেন তো, ভাগ্য ভালো। তারপরেই বলতেন—বেশ বলেছিস। তোর বয়সে আমি ওরকম পারতুম না। এখন এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল।

আমিও বলি ওঁর নকলে।

দানীবাবুর যতদিন গলা ছিল ততদিনই নাম, তারপর আর কেউ মনে রাখল না। অভিনেতার গলা গেলে আর কিছুই থাকে না। যখন বুঝবে ওপরে দু' অক্টেভ (উঠছে না) আর নীচে এক অক্টেভ নাবছে না (গলা) তখন তার অভিনয় ছেড়ে দেওয়া উচিত।

সিনেমা হবার পরেই অভিনেতারা পয়সা পেল। কুসুমই বলেছিল—একদিন কাজ করবার জন্যে পঞ্চাশ টাকা, তা বাপু করব না কেন বল?

এবার বললেন রবীন্দ্রনাথের কথা—রবীন্দ্রনাথের নাটক বলতে তো দু'খানা, তপতী আর মালিনী। গোড়ায় গলদ শুধু কথা দিয়ে সাজান, তবে কথা যা আছে খুবই সুন্দর। অথচ লোকে জানে রবিবাবুর ভালো বই হল ডাকঘর, তাসের দেশ; কিন্তু ওগুলো কি ঠিক নাটক হল। ওঁর কোন বই-ই দাঁড়ায়নি, এমন কি তপতীও নয়।

রবিবাবুকে আমেরিকায় তো মোটেই খাতির করেনি, বলেছে that half-crazy prophet! শেষবার উনি যখন আমেরিকায় যান তখনত রীতিমত অখাতিরই করেছিল। আমরা তখন আমেরিকায়, হপ্তায় ছ'হাজার ডলার দেবে বলে প্রথম খুব খাতির করেছিল, তারপর রিহার্সাল দেখে থমকে গেল।

উনি তখন ফাংশনে গান গাইবেন আর রুথ সেণ্ট ডেনিস নাচবে ঠিক হয়েছিল। দু'ভাই—বি. এস. আর এফ. এস মগ ব্যবস্থা করেছিল। তা উনি নিজে না গেয়ে অন্য কোন ছেলেকে দিয়ে গাওয়াবেন ঠিক করলেন। শেষ পর্যন্ত তেমন কাউকে না পেয়ে, আমায় এসে বললেন, কঙ্কা এখন গায় কেমন?

আমি বললুম—মন্দ নয়, কেন?

তাতে বললেন—ওকে দিয়ে গানগুলো গাইয়ে দেব ভাবছি।

আমি বললুম—একটু অসুবিধে আছে যে। এখানে কনট্রাক্ট করিয়াছে কোথাও অভিনয় করব না। শেষ পর্যন্ত যদি গোলমাল করে?

বললেন—তা করতে পারে, তবে থাক।

মিটিংএ গিয়ে দেখি দু'চারজন সাহেব আর পেছনে আমরা ভারতীয়ের দল, মাঝখানটা একেবারে ফাঁকা। শেষ পর্যন্ত পেছনের লোকদের এগিয়ে আসতে বলা হল। আমরা যেমন ভাবে যাই হুড়মুড় করে এগিয়ে গেলুম। উনি প্রথমে একটা গান গাইলেন। তারপর অনেকক্ষণ আর কার্টেনই ওঠে না। ওঁর সেক্রেটারী মিঃ ফিরবি এসে কি একটা বললেন, ওঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর আবার এসে ওঁকে কি বললেন, উনি উঠে গেলেন। শেষে কার্টেন উঠল, দেখা গেল উনি বসে আছেন আর রুথ সেণ্ট ডেনিস নাচছে।

তবে একটা ভাল কাজ করেছিলেন, হঠাৎ জনগণমনঅধিনায়ক গেয়ে বসলেন, ট্রানশ্লেট করলেন না। কিন্তু সাহেবতো (কেউ) ছিল না।

পরে মিঃ ফিরবি বললেন—গুরুদেবের কথা আর বলবেন না, এমন ছেলেমানুষ! কনট্রাক্ট আছে উনি বসে থাকবেন তবে সে নাচবে, আর উনি যাবেন না!

আমেরিকায় আমায় খুব খাতির করেছিল। মিঃ আর মিসেস মিলে তো আপনার লোকের মতো করেছিলেন। মিসেস মিলে জন্মেছিলেন মাদ্রাজে, তাই ভারতীয়দের ওপর তাঁর একটা মায়া ছিল।

ধনগোপালের সঙ্গে প্রথমে দেখা হয় নি, পরে এসে বললে—আগে জানলে আপনার সঙ্গে সময়মত দেখা করতুম।

মিসেস মিলে আসবার সময় একটা ছোট ডিনার দিয়েছিলেন। তাতে উইল ডুরাণ্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথা বিশেষ হয় নি, ভীষণ সিরিয়াস লোক।

ইনস্টিটিউট অব সোসিয়োলজির ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক বললেন—দেখ, বাঙলা আমি জানি না, সংস্কৃত কিছু কিছু পড়েছি। বলে এমন কতকগুলো সংস্কৃত নাটকের নাম করলেন যার অধিকাংশই আমি পড়ি নি। ভদ্রলোক ছ'টা ভাষা জানতেন, তার মধ্যে তিনটে বেশ ভাল জানতেন, লিখতে পড়তে পারতেন। বাকিগুলো পড়তে পারতেন ঠিকই, কিন্তু ভাল করে লিখতে পারতেন না—cannot express myself well!

হারভার্ডের সংস্কৃত প্রফেসার জ্যাকসনের সঙ্গেও চেনা হয়েছিল। তিনি সরাসরি আমায় প্রশ্ন করে বসলেন—তোমাদের বইটি দু'হাজার বছরের পুরাণো বলছ, কিন্তু বাঙলা ভাষা তো—

কথাটা চাপা দিতে তাড়াতাড়ি বললুম—ওটা পাবলিসিটি হ্যাণ্ডআউট! আসলে ওরিজিন্যাল গল্পটা তো রামায়ণ থেকে নেওয়া। তারপর একথা সেকথা বলে কেটে পড়লুম।

আমাদের নাটকের অখ্যাতি বিশেষ কেউ করেনি, এক নিউইয়র্ক টাইমস ছাড়া। ওরা বলেছিল—A medieval story with a slow tempo. নিউইয়র্ক সান খুব ভাল লিখেছিল।

মসেরা আমায় ইংরেজীতে অনুবাদ করে করতে বলেছিল। তাতে আমি বললুম—সবই তো ঠিক বলছ, কিন্তু ওদের অ্যাকসেণ্ট যে খারাপ হবে।

তার উত্তরে বললে—Worse the accent, the better. ওরাই বলেছিল

—ব্রুকলিন, নিউ জার্সিতে যত ভারতীয় আছে সব পাগড়ী বেঁধে স্টেজে তুলে দেবে। স্টেজে হাতী তুলতেও চেয়েছিল।

ওদের আসল মতলব ছিল—তোমরা যে জংলী সেইটাই সকলকে প্রমাণ করে দেব।

আমি রাজি হই নি, বলেছিলুম—বাঙলায় নাটক করাতে এনেছ, বাঙলাতেই করব।

১৭ই নভেম্বর এলেন মালিনীর প্রথম রিহার্সাল দিতে। কথা হচ্ছিল—অভিনয় করানর জন্যে কিছু অল্পবয়েসী মেয়ে দরকার আর তাদের কিছু শিক্ষা থাকা দরকার। শুনে বললেন—অল্প বয়েসী মেয়ে তো আমাদেরও ছিল। এখানে চল্লিশ বছরে গালটাল তুবড়ে যায়, রঙের গোলা লাগিয়ে কি আর বয়েস বেঁধে রাখতে পারে?

আবার বললেন—বেশি শিক্ষিত মেয়ের তো দরকার নেই, শুধু বর্ণপরিচয় থাকলেই হবে। তবে উচ্চারণটা ভালো করে করতে জানা চাই, তাহলেই চলবে। বইএর শিক্ষা তো শিক্ষা নয়, সারা জীবনের শিক্ষাই হচ্ছে আসল শিক্ষা। একজন গ্রাজুয়েটের চেয়ে লেখাপড়া না জানা একজন দেখবে কার্যক্ষেত্রে বুদ্ধিমান। কাজ তো দেয় বুদ্ধিটাই। বড় বড় অনেকে সব জানি বলে মাথা দোলায়, কিন্তু অন্তরে তারা কিছুই বোঝে না।

বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা তুললেন এবার—বিদ্যাসাগর মশায়ের তুলনা হয় না। ওঃ, কম কষ্ট পেয়েছেন তিনি! ন বছরের বালককে বাড়িশুদ্ধ লোকের রান্না করতে হয়েছে; অথচ তার ভেতর নিজের অন্তরের তাগিদে কিছু করতে পেরেছেন।

জীবনে সান্ত্বনা হচ্ছে কিছু করতে পারা। হ্যাঁ, সত্যিই তুমি কাজের কাজ করেছ একথাটা কেউ কোনদিন বলে না কাউকে। সবাই শুধু নিতেই চায়। বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে মাসোহারা পেলেই সবাই শান্ত। তাছাড়া আর কিছু তারা কেউ জানত না।

পাছে সব টাকা খরচ হয়ে যায়, তাই বাইরে যাবার আগে একজনের কাছে চোদ্দশ' টাকা রেখে কয়েকজনের নাম বলে তাদের মাসিক আশী টাকা করে মাসোহারা দিতে বলে যান। ফিরে এসে শুনলেন যাদের প্রাপ্য তারা কেউ টাকাটা পায় নি। যার কাছে (টাকা) রেখে গিয়েছিলেন, তাকে জিগ্যেস করাতে, সে বললে—না, টাকাটা দেওয়া হয়নি, তাড়াতাড়িই দিয়ে দেব।

তারপর আর কোনদিন তাকে বিদ্যাসাগর মশায় তাগাদা দেন নি। উনি একবার দুবার কি বড় জোর তিনবারের বেশি তাগাদা দিতেন না বা করতেন না।

এবার মালিনী নাটকটা ধরলেন, বললেন—মালিনীর প্রথম অংশটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন, অথচ কোথাও তার বিষয়ে কিছু লেখেন নি পর্যন্ত।

এই সময়ে শ্যামলী চক্রবর্তী এসে ওঁকে প্রণাম করলেন। তারপর কি কথা বলতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। উনি পরিচয় জানতে চাওয়ায় ওঁকে পরিচয় দেওয়া হল, শুনে বললেন—শ্যামলী কি দুর্গেশনন্দিনীতে অভিনয় করেছিল? ও তো সতীশ দাশগুপ্তের বই। লোকটা বোধ হয় কিছু করতে পারত, কিন্তু নিজেকে নষ্ট করলে।

আকস্মিক ভাবেই বললেন—সীতা মঞ্চস্থ করতে আমার নব্বই হাজার টাকা খরচ হয়েছিল আর উঠেছিল কত জান? মাত্র পঁচাত্তর হাজার টাকা। সে অনেক কিছু ব্যাপার! প্রত্যেকের সবচেয়ে বেশি গ্রেড একশ টাকা, তারপর তার চেয়ে কম, এমনি করে মাইনে ধরা হয়েছিল বা দেওয়া হত। শেষ পর্যন্ত গোল বাধালে একশ টাকার হোমরা-চোমরারা। তারা বললে—অন্যদের একশ টাকা হলে আমাদের আরো বেশি হওয়া দরকার।

ওয়ান সাহেব বলতেন—তোমাদের সবচেয়ে বড় দোষ তোমাদের আতিশয্য।

আবার মালিনী ধরলেন, বললেন—মালিনীর প্রথমেই কাশ্যপ যে কথাগুলো বলছেন, বলার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে হবে—ভবিষ্যতের কথা। মহাক্ষণ কথাটা খুব দরকারী! সেটা ঠিক করে প্রকাশ করতে হবে। চোখ দুটাকে বড় করতে হবে।

মালিনী অভিনয় করার পারমিশান সম্বন্ধে বললেন—মালিনী আর ঘরে-বাইরে আমার পারমিশান নেওয়া ছিল ৪৩এ। ভাবলুম কর্তা গত হলেন, কে আবার কি বলবে। চার বছরের মধ্যে করাব কথা ছিল, করতে পারি নি। তারপর চাইলেই পারমিশন দিয়েছে। রেডিয়োতে ঘরে-বাইরে শুনলাম—বলবার মত নয়।

এবার কাশ্যপের ভূমিকায় এক একজনকে ডেকে পড়াতে লাগলেন। দেবুদা'কেও পড়ান হ'ল, (মানে বিনয়দা' জোর করে পড়ালেন)। দেবুদা খুব হাত-মাথা নেড়ে পড়ছিলেন, বললেন—দেবু তুমি হাতটাকে নেড়ো না। ঘাড়টাকেই বা ওরকম করছ কেন? তোমার দু'টাকা তের আনা বাদ রেখে দাও।

তারপর মালিনী আর রাণীর ভূমিকায় রিহার্সাল দিতে শ্যামলী চক্রবর্তী আর করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকলেন, বললেন—তোমাদের দু'জনকে সুন্দর মানাবে। একজন মালিনী আর একজন রাণী।

করুণা বৌদি মৃদু আপত্তি তুললেন—আমার গলা ভালো নয়, গলার জোর নেই।

হেসে বললেন—তোমার গলা বেশ ভালো: তোমার গলায় যে কত জোর তা তুমি নিজেই জান না।

দু'জনকার ভূমিকা পড়ান শুরু হল, কিছুটা পড়িয়ে বললেন—তোমার বাপের দৈন্য বলতেই রাণী চটে গেছেন, তাই রাগ করে পরের কথাগুলো বলে নিলেন। তারপরেই আবার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করছেন। রাজা এসে যেই বলছেন—নির্বাসন, অমনি চটে গেছেন রাণী, পরের কথাগুলো (তাই) ব্যঙ্গ করেই বলছেন।

সুপ্রিয়র ভূমিকা করা অনেক কঠিন। ক্ষেমঙ্করের চরিত্রে একটা কাঠিন্য আছে, সেটা সহজেই ফোটে, কিন্তু সুপ্রিয়র বোকা বোকা ভাবটা দেখানো অত সহজ নয়।

মালিনীর ভালবাসা কিন্তু মোটেই personalized নয়, idealized.

রবীন্দ্রনাথের 'মব' সত্যি মারাত্মক! অবশ্য মালিনীতে অতটা নয়, কিন্তু তপতী, বিসর্জন কি রাজারাণীতে 'মব' করা রীতিমত শক্ত। তপতীতে একজনকে শেখাতেই একমাস লেগে গেল।

কে একজন বললেন—মহাজাতি সদনের হলে accoustics ভাল নয়। অভিনেতাদের ছোট দেখায়।

শুনে বললেন—তাই নাকি? আমি তো মেট্রোপলিটান গ্র্যাণ্ড অপেরার ওপরে বসে অভিনয় দেখেছি, অভিনেতাদের একেবারে পুতুলের মতো দেখায় কিন্তু সব কিছু পরিষ্কার শোনা যায়। আমাদের এখানে ফার্স্ট এম্পায়ার হলও খুব ভালো, সেখানকার accousticsও খুব ভালো—ডোমের নীচে হল তো। স্টেজটা এখন কেমন আছে জানি না, তবে আগে কিন্তু খুবই ভালো ছিল। এখন কি যেন নাম হয়েছে?

বলা হল—রক্সি।

মালিনীতে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে সব উক্তি আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন—আগে আমাদের ব্রাহ্মণদের খাতির ছিল বেশি। ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন খাওয়া হলে তবে অন্যরা খেতে যেতে পারত। বাড়ির কর্তা এসে বলতেন—ব্রাহ্মণদের জায়গা হয়েছে।

আমার বিয়েতে শহীদ সুরাবর্দিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলুম, জামাকাপড় পরিয়ে একেবারে খাস হিন্দু বানিয়ে দিয়েছিলুম।

একবার এক বন্ধুর বিয়েতে ব্রাহ্মণদের ডাকতে এসেছে, আমরা বললুম—আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ট্রাহ্মণ নেই। আমরা সবাই ৭নং কলেজ স্কোয়ারের দল।

১৮ই নভেম্বর এলেন নাট্যোৎসবের নাটক রিহার্সাল দিতে। ইতিমধ্যে ঠিক হয়েছে নাট্যোৎসবে মাইকেল, ষোড়শী আর বিজয়া হবে। পুরাণো স্মৃতির তাগিদে ওঁর ইচ্ছে ছিল আলমগীর করবার, আর অনেক দিন আগে শেষ অভিনীত নাটকের পুনরাভিনয় দেখার লোভে আমরা চেয়েছিলাম দিগ্বিজয়ী নাটক অভিনয় করতে। (এককালে যে নাটক যথেষ্ট সুনাম পেয়েছে, আমাদের মধ্যে বয়স্কেরা যে নাটকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অথচ আমাদের জ্ঞানতঃ যে নাটক অভিনীত হয়নি, তার অভিনয় দেখার লোভ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বৈ কি!) কিন্তু দু'পক্ষের কারো ইচ্ছাই পূর্ণ হল না। রফা হল মাইকেল, ষোড়শী, বিজয়া—এই হবে নাট্যোৎসবের নাটক।

এদিন এসে তাই ঐ নাটকগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করলেন। প্রথমে বললেন—বিজয়া নাটকে আর আছে কি? বেশ একটা মিষ্টি গল্প, তাতে human element প্রচুর। নাটকটাকে ভাল করে ফোটানর জন্যে একটা সিন লেখাতে চেয়েছিলুম, বিজয়া কেন সই করল। ও যে দয়ালকে বলছে—আমি যে নিজের হাতে সই করে দিয়েছি।

তাতে দয়াল বলছেন--নলিনা আমায় সব কথা বলেছে। তোমার হাত সই করেছে, মন সই করেনি।

ওখানে বিলাসের অ্যাকটিং-এরও স্কোপ থাকত। বিলাসকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলুম—বাবার কি ইচ্ছে তা আমি জানি না। আমি কিন্তু তোমার সম্পত্তি চাই না! আমি তোমাকে ভালবাসি তাই তোমাকেই চাই। আমাদের আচার ব্যবহার একরকম, আমরা ছোট থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, পরস্পরকে আমরা চিনি কাজেই পরস্পরকে পেয়ে আমরা সুখীই হব।

তারপরেই বিজয়া সই করে দিলে।

এ দৃশ্যটা শরৎদা'কে অনেকবার লিখতে বলেছি, কিন্তু উনি বলেন—Not a line more. কিছুতেই লেখাতে পারলুম না। সব মানুষেরই idiosyncracy থাকে তো, ওঁরও ছিল। লেখা এক লাইনও উনি কাটতে দিতেন না। ঐ কাটা নিয়েই তো পল্লী-সমাজে গোলমাল বাধল, উনি তখন বললেন—আমি অন্য জায়গায় যাই।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ফিরে আসতে হল, বললেন—ভায়া, ওরা বুঁদে করতে পারে, সন্দেশ করতে জানে না।

পঙ্কজদা নাট্যোৎসবের স্যুভেনিরের অন্যতম সম্পাদক হয়েছেন, তাতে নাটকগুলি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখবেন ঠিক করেছেন, সেই প্রসঙ্গেই ষোড়শীর কথা তুললেন। উনি বললেন—ষোড়শী সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে পারি, তবে এখানে নয়, বাড়িতে বসে। এখানে আমার মাথার ঠিক থাকে না। ষোড়শী নাটক আর দেনা পাওনা উপন্যাসে বিশেষ মিল নেই। জীবানন্দ ঐ যে বলছে না—আমি চাই ; স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ঘর-বাড়ি সব কিছু চাই। জানি মরণ যখন আসবে, তাকে ঠেকাতে পারব না, কিন্তু স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সামনে নিজের বাড়িতে মরতে চাই। এই কথাগুলো উপন্যাসে ছিল না।

কিন্তু তার পরেই বলছে—ফাঁকি দিয়ে পেয়ে পেয়ে আমার লোভ বেড়ে গেছে। কিন্তু আর ফাঁকি দিয়ে পেতে চাইনে।

আবার আছে—জমি আর জমিদারের নয়, জমি এখন কৃষকের।

একেবারে ব্যক্তিগত জিনিস সাধারণ হয়ে দাঁড়াল।

এবার বললেন মাইকেলের কথা—মাইকেলে ছ'টি সিনে মাইকেলের জীবনের এক একটি বাঁক ফোটান হয়েছে। মাইকেল লিখেছেন তো মোটে পাঁচ বছর—না, বোধ হয় তারও কম হবে ; কিন্তু কি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন। নাটক ওঁকে লিখতে দিলে না তাই। বিলেত থেকে ফিরে বোধ হয় লিখেছিলেন—না, না বিলাত যাবার আগেই লেখেন, মাদ্রাজ থেকে ফিরে।

তারপর বিলেত গেলেন ব্যারিস্টারি পড়তে, কেন না তখন মাথায় এসেছে টাকা রোজগার করতে হবে। ওঁকে কিন্তু বিপদে ফেললে গুরুদাস—যার হাতে বিষয়ের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন আর কি ! ওঁর পরিবারকে মাসে মাসে আড়াইশ' টাকা করে দেবার কথা, কিন্তু এক পয়সাও দিলেন না। তারা বিপদে পড়ে টাকা ধার করে মধুর কাছে চলে গেল। সেখানে তিনি তখন না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন, ছেলে-পুলেরা যেতে বেশি অসুবিধেয় পড়লেন। নানা বিখ্যাত লোকের সঙ্গে মিশছেন, অথচ ল্যাণ্ডলেডি বলছে, ভাড়া না দিলে বার করে দেবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ওঁর জন্যে কিন্তু অনেক করেছেন। প্রচুর ধার করে পাঠিয়েছিলেন, ওঁর জন্যে বাড়ি ভাড়া করে সাজিয়ে রেখেছিলেন : উনি না ওঠায় বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু ক্ষুণ্ণ হন। তারপর সময়মতো ধারশোধ না করাতে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভুল তাঁরই হয়েছিল। সুকিয়া স্ট্রীটে যে মাইকেল থাকতে পারেন না, এটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন নিয়ে, বিশেষ করে শেষ-জীবন নিয়ে, খুব ভাল

একটা নাটক লেখা যায়। কেন উনি পরিবারের সকলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন; কেন মা দেশে থাকলেও বীরসিংহে গেলেন না; ভায়েরা কেন ছাপার অক্ষরে তাঁকে গালাগাল দিলেন তা জানা যায়না। সেইজন্যই বোধ হয় উনি বলেছিলেন— ও লোকটা আমায় গাল দিচ্ছে কেন? আমি তো কখনও ওর উপকার করিনি!

বিদ্যাসাগর মশাই প্রথম দেখালেন যে, লিখেও সংসার চালান যায়। প্রতি বছর হাজার হাজার টাকা রোজগার করা সহজ কথা নয়। অথচ উনি তাই করেছেন।

॥ ১০ ॥

মাইকেল সম্বন্ধে শিশিরকুমার অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তাঁর মতে, শুধু কবি হিসাবেই নন, নাট্যকার হিসাবেও মাইকেল খুবই বড় ছিলেন। নানা কারণে তাঁর নাটক লেখায় বাধা না পড়লে, তিনি বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারতেন। ফর্মের দিক থেকে তাঁর নাটক একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

এতদিন পরে মাইকেলের নাটক পড়বার কথা হল। ২০শে নভেম্বর মাইকেলের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা পড়তে এলেন। প্রথম কথা বললেন—মাইকেলের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা—১৮৫৮ সালে লেখা। ভাষাটা সেদিনকার দিনের পক্ষে মোটেই খারাপ নয়, একটু আধটু বদলে দিলে একেবারে আধুনিক ধরনের হয়ে যাবে।

শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃতের প্রভাব খুব বেশি দেখা যায়। কিন্তু নাটকের গঠন-সংস্থান খুব সুন্দর। অথচ এই লোকটিকে নাটক লিখতে দেওয়া হল না বলেই উনি আর নাটক লিখলেন না। এতদিন পরেও বাঙলা নাটক কৃষ্ণকুমারী থেকে একপাও এগোয় নি। ইচ্ছে করে ওটা পড়বার আগে টডের রাজস্থানের কাহিনীটা পড়ে শোনাই। ওতে সবকিছুই ভালো এক তপস্বিনী নামটা ছাড়া। ওটা প্রায়োরেস বা অ্যাবেস-গোছের কোন একটা চরিত্র কল্পনা করে লেখা। ওটার কোন একটা নাম দিলেই বোধ হয় পারতেন।

নাটক পড়তে শুরু করে বললেন—শর্মিষ্ঠার শুরুতে এই যে লম্বা বক্তৃতা আছে, এটা সম্বন্ধে নাট্যকার ওয়াকিবহাল তাই পরিক্রমণ লেখা। পরের প্রকৃতি বর্ণনা একেবারে সংস্কৃত থেকে নেওয়া।

দ্বিতীয় দৃশ্যে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সখীর কথাগুলো একটু বেশি দীর্ঘ। দেবযানীর সঙ্গে পূর্ণিকার কথাও এত বেশি বলবার কোন দরকার নেই, কিন্তু দর্শকরা পাছে বুঝতে না পারে তাই হয়ত বলা হয়েছে। এই অংশটা হল যাত্রার প্যাঁচ। যাত্রার ধরণের সঙ্গে নাটকটির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

আবার কিছুটা পড়ে বললেন—এইখানে নাটকটি কতখানি এগিয়ে গেল। তাই তো বলছি এর গঠননৈপুণ্য চমৎকার! শুক্রাচার্য যে মেয়ের মনোভাব জানবার জন্যে পূর্ণিকাকে বলেছিলেন আর সে তা জেনে জানাচ্ছে—এই কথাটুকু জানার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি এগিয়ে গেল।

পরের দৃশ্যটা পড়ে বললেন—আমি হলে শেষের স্বগতোক্তিটা দিতুম না। রাজার মনের ভাবটা এই দৃশ্যে চমৎকার ফুটেছে। বিদূষকের বলার কথা হল—একটি নারীকে তোমার দরকার, তা যে কোন নারীই হ'ক না কেন!

পরের দৃশ্যটা পড়ে বললেন—এখানে মন্ত্রীর মুখ দিয়ে কথাগুলো বলানর অর্থ অনেকখানি টাইম ল্যাগ দেখান। মানে পরবর্তী অঙ্কের আগেই যযাতির পাঁচটি ছেলে হবে। শাপ দিলে তাদেরই একজন বাপের জরা নেবে তো।

এই সময় চা এল, পড়া বন্ধ করলেন। দেবুদা'র পিসীমা এসেছিলেন, তিনি তাঁর ভগ্নীপতির পরিচয় দিলেন। শুনে বললেন—পুরুলিয়ার শশধর গাঙ্গুলী তো! হ্যাঁ, তাকে খুব চিনতুম। কতদিন তার বাড়িতে গিয়ে থেকে এসেছি। সে ও কোলকাতায় এলেই আমার কাছে থাকত। একবার একটা কেসের ব্যাপারে ওর বাড়িতে গিয়ে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। শশধরের বিপক্ষে ছিল অম্বুজাক্ষ।

অন্য কথায় গেলেন—জোলার বই আমার ভাল লাগে না, ওতে বড্ড prurient details থাকে।

চন্দর (চাণক্য) করবার কথা হচ্ছে নারকোলডাঙ্গায়। আমি ওদের বলেছি without সেলুকাস—ওরা তাতেই রাজি হয়েছে। বাইরে একদল সীতা করতে ধরেছিল, বলেছিল—সতেরশ' টাকা দেব না হয় একশ' টাকা বেশিই দেব। কিন্তু চোখের জন্যে রাজি হলুম না। 'কার কণ্ঠস্বর' বলে ছুটে এসে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে পারি না বলে তিনটে কেটে একটা করলুম, কিন্তু তাও হোঁচট খেতে খেতে রয়ে গেলুম। তাই শেষ পর্যন্ত বন্ধ করতে হল।

চন্দ্রগুপ্তের ছায়া কে করবে একজন জানতে চাওয়ায় বললেন—ছায়া তো গীতা করবে বলেছে। ও সাতটায় যাবে।

কে একজন বললেন—ওঁর তো পার্ট আছে, শেষ হতে দেরী হবে বোধ হয়।

বললেন, ওর পার্ট যখনই শেষ হ'ক না কেন, যাবে যখন বলেছে, তখন ঠিক সময়েই যাবে। ও তো আজ পর্যন্ত আমাকে বিট্রে করেনি, একবার শুধু ভুল করেছিল। গীতা বেশ ভেবে চিন্তে বুঝে পার্ট করে, কাজেই পারবে।

আজকালকার দিনে দুটি মেয়ে মোটামুটি বেশ ভালোই অভিনয় করে। একটি হল গীতা, অন্যটি—

কে একজন ফস করে বলে বসলেন—কেতকী।

একটু অবাক হয়ে বললেন—কেতকী? সে কে?

ভদ্রলোক বললেন—প্রভার মেয়ে ছুটু।

বললেন—ছুটু? না, তার অভিনয় দেখি নি। আমি বলছি নমিতার কথা। ওর মধ্যে বেশ সম্ভাবনা ছিল, হয়ত বন্দোবস্ত করা যেত, কিন্তু আজকাল ওর নিজেরই কেমন ফাঁকি দেবার ঝোঁক এসেছে।

নরেশ আজকাল কাত্যায়ন করে, তাতে নাকি প্রাণ থাকে না। আচ্ছা, এতকাল ধরে করেছে, এখনও প্রাণ থাকেনা এটা কি রকম করে হয়! এক বলতে পার প্রথম থেকেই প্রাণ ছিল না, কিন্তু তাহলেও অন্যায় করা হয়। কাত্যায়ন ও খুবই ভালো করত।

ইনস্টিটিউটের হল সম্বন্ধে বললেন—ওখানে মাইক দিতে হবে, নয়ত দোতালায় যারা বসবে তাদের ওপর অন্যায় করা হবে। হলটার accoustics খুবই খারাপ, ছাদটার জন্যে কথাগুলো ভালো করে শোনা যায় না। তাছাড়া মোটা মোটা থামগুলোর জন্যে দেখারও অসুবিধে হয়। কিন্তু ওটা তো ইচ্ছে করে করা! পনেরো ইঞ্চি করে দেওয়াল করারও দরকার ছিলনা, আর অত মোটা থামেরই বা কি দরকার ছিল? যাতে থিয়েটার না করা যায় সেই জন্যেই ওভাবে তৈরী করা। যেভাবে হলটা তৈরী তাতে মিটিং হতে পারে, অভিনয় নয়। হ্যাঁ তবে অভিনয় আমরা করেছি। গুরলে সাহেব বলেছিলেন—ওখানে যে ড্রামা হবে তা আমি জানতুমই না।

ডালহৌসি ইনস্টিটিউটে অভিনয় করেছিলুম ১৯১৩ সালে—

ওঁর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের যুগের বন্ধু কান্তিবাবু এসেছিলেন একদিন, তিনি বাধা দিয়ে বললেন—না ওটা ১৯১৪ সালে।

বললেন—কান্তি তুমি বলছ ওটা ১৯১৪ সালে। ওর একটা প্রোগ্রাম আমার কাছে আছে, দেখব এখন। ইনস্টিটিউটে রত্নাবতী করবার কথা হল; তা আমরা

এখানে না করে ওখানে করলুম। কতকগুলো ফিরিঙ্গী মেয়ে এসেছিল। বিনা প্রচারেই এত লোক হয়েছিল যে, টিকিট দিতে পারা যায় নি। ওখানকার প্রোগ্রামেই প্রথম বেরয় Directed by Sisir Kumar Bhaduri.

২২শে নভেম্বর এসে ইনস্টিটিউটের এক মাতব্বরের নাম করে বলেন—অমুক বলছিল, আলমগীর করলে বিক্রী হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি আলমগীর করতে আর ভাল লাগে না। হ্যাঁ, আমি ওকে বলেছি যে, অত যদি ঝোঁক থাকে তো অন্ত এক সময় কর।

চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছিল, সেই প্রসঙ্গেই বললেন—চন্দ্রগুপ্তে ছায়া করবে গীতা, এইরকম কথা হয়েছে। ছায়ার একটা দৃশ্য সবচেয়ে দরকারী। যানে শেষ দৃশ্যে গলায় মালা পরাতে গেলে যে হেলেন বলবে—আমায় নয় রাজাকে দাও—সেটার কোন অর্থই হয় না, কারণ তার আগের দৃশ্যটা বছর কুড়ি করা হয় নি।

মগধ রাজদূত বিবাহের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে, মন্ত্রী বলছেন, আমাদের রাজকন্যার আর কোনদিকে মন নেই, কুণো হয়ে গেছেন, যাবেন কিনা সন্দেহ।

তারপরেই এলেন ছায়া, শুনে বললেন—ভালো কথা! নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলুম, কিন্তু যেতে পারব কি না সন্দেহ। রাজদূত চলে যেতেই মনে হল—এ দুর্বলতা জয় করতে হবে। তাই ডেকে বললেন মন্ত্রীকে—রাজভাণ্ডার থেকে রত্নভার নিয়ে গিয়ে শ্রেষ্ঠ আভরণ তৈরী করাও, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।

এবার কোন নাটকে কে কি ভূমিকা করবে তাই নিয়ে আলোচনা সুরু হল।

মাইকেলে এক বিশেষ ভূমিকাভিনেতার নাম করে বললেন—ও তো করত পার্টটা কিন্তু সে যখন আমাদের দল থাকতেই অন্য দলে চলে গেল, অভিনয় করল, তখন তাকে তো আর ডেকে আনতে পারি না। তবে সে যদি নিজে আসতে চায় তো, না বলব না। আমার যা বয়স তাতে পুরাণো কথা মনে করে রাগ করতে পারি না, সেটা অন্যায়।

বলতে বলতে যাঁর সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল তিনি এসে হাজির। তাঁকে দেখে বললেন—আরে এস এস, তোমার কথাই হচ্ছিল। তারপর বিভিন্ন নাটকে তাঁর কি কি ভূমিকা থাকবে বুঝিয়ে দিলেন। এবার জানতে চাইলেন, ষোড়শীতে এককড়ি কে করবে? এক সৌখীন অভিনেতার নাম করাতে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে দিয়ে চলবে।

মাইকেল দেবকী কে করবে সে প্রশ্ন তুললেন এবার। একজনের নাম করাতে

বললেন—হ্যাঁ ও পারবে, কিন্তু ওকে তো মানবেনা। বড্ড রোগা, তাছাড়া বয়েসের ছাপ পড়ে গেছে। তবে আমি যদি মাইকেল করতে পারি ত ওতো দেবকী করতে পারে। গান ও ভালই গাইবে।

মেয়েটি সম্বন্ধে আরও বললেন—ওর মধ্যে একটা দৃঢ়তা আছে। ও যখন প্রথমে এসেছিল, তখন দেখতেও ভালো ছিল। স্বামীর কাছে গিয়ে থাকলে সুখেই থাকত, কিন্তু গোলমালের জন্যে যায় নি। মেয়েটা ভালো, পয়সা করতে চাইলে করতে পারত, কিন্তু সে ইচ্ছে ওর হয় নি। ওর বড় মেয়েও বেশ ভালো, তবে ছোট মেয়েটাকে সামলাতে পারলে না। এই লাইনের এই তো সবচেয়ে বড় দোষ।

আবার চন্দ্রগুপ্তে আত্রেয়ীর ভূমিকা ওঁর পরিচিত দু'টি মেয়ের কথা তুলে জানতে চাইলেন, ওদের মধ্যে কে বড় রে? আত্রেয়ীর গলাটা শোনা চাই তো, তবে তো বলব, কার কণ্ঠস্বর? মানে গলার মিল, চোখের ভাব বড় হলেও বদলাবে না তো?

কেষ্ট যখন করত, তখন বলেছি—ওকে গাইতে দাও। তা বলত—ও গাইতে জানেনা যে বড়দা।

অন্য কথা তুললেন—আজকাল কি আর কেউ রামায়ণ মহাভারত পড়েনা? আমার কিন্তু সেদিন পর্যন্ত প্রায় পুরো রামায়ণ মুখস্থ ছিল। মুরারির ত ছোটবেলায় পড়তে শেখার আগেই রামায়ণ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল; যে কোন একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেই গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেত। রামায়ণ বড় ভাল বই। অঙ্গদ রায়বারের মত অমন অপূর্ব বর্ণনা বড় একটা দেখা যায় না।

এলেন টেরীর শেষ অভিনয় যখন হয়, তখন তাঁর বয়েস ৭০ বছর। তাঁকে জিগ্যেস করা হয়, কি বই করবেন? বললেন—রোমিয়ো-জুলিয়েট।

আলোটালো ডিম করে করান হ'ল কিন্তু তবু বয়েসের বলিরেখা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু কি সুন্দর হাত আর কি অপূর্ব গতিছন্দ।

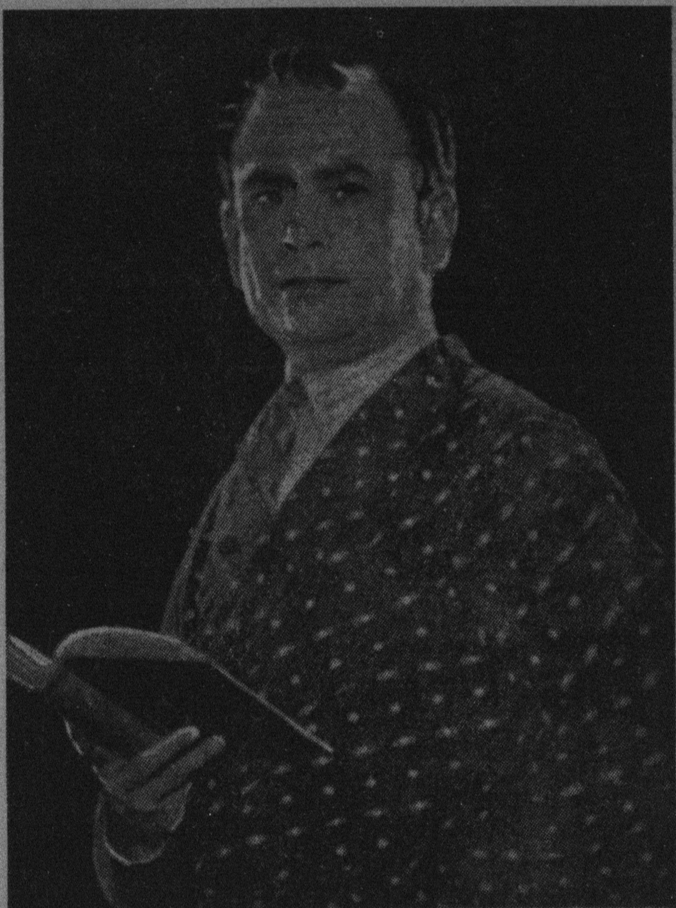
প্রভা ছিল সত্যিকারের ভাল অভিনেত্রী, কিন্তু দেশের কাছে কি সম্মান পেয়েছিল? অন্য চরিত্রের কথা ছেড়ে দাও—বুধবারে আমাদের একটা হাসির বই হচ্ছে তাতে ও করেছিল একটি গেঁয়ো মেয়ের পার্ট। সে কলকাতায় নতুন এসেছে, স্বামীর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। একগলা ঘোমটা, তার মধ্যে থেকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, অনভ্যস্ত পা থেকে চটি খুলে খুলে পড়ছে, থেকে থেকে পেছিয়ে পড়ছে, আবার স্বামী ধমকাতেই ছুটতে ছুটতে কাছে যাচ্ছে।—একেবারে পুরোপুরি গেঁয়ো মেয়ে। অথচ টুরে যাওয়া ছাড়া ও কখনো গ্রামই দেখেনি।

বার্ণপুর থেকে লোকেরা এসেছিল। ওদের ওখানে কে একজন আমার নাম



রাম . শিশিরকুমার

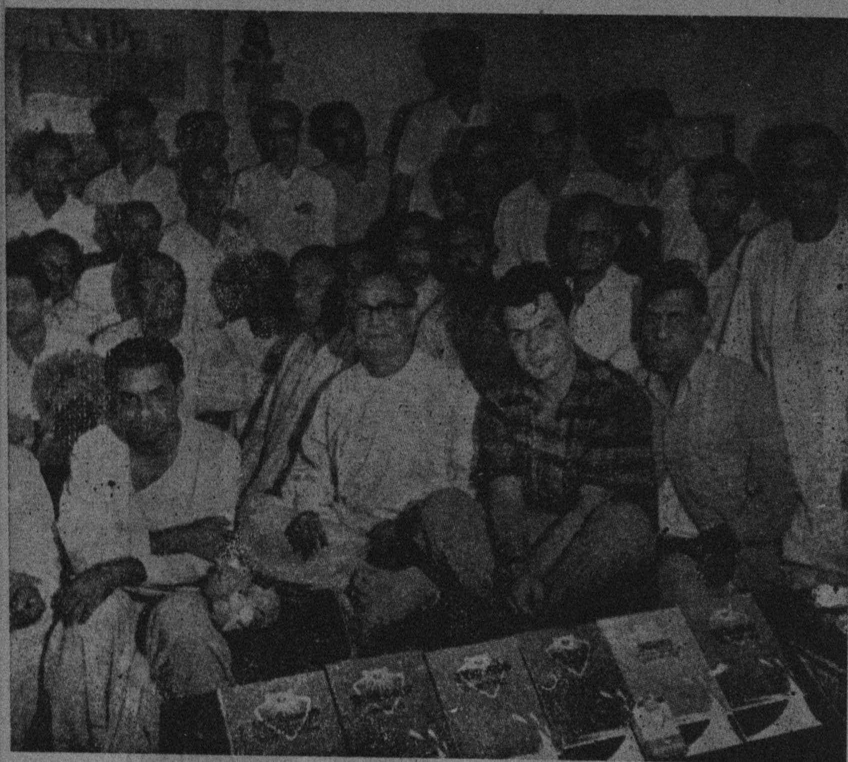
সীতা · কঙ্কাবতী



রীতিমত নাটক · দিগম্বর · শিশিরকুমার



জাহান্দর শা · শিশিরকুমার



নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, স্কান্ড্রামভ্, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, কুমারেশ ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র ঘোষ, দুলালী দেবী, গণেশ বসু, চিত্ত সরকার, ফণী রায়, ডাঃ রবি মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শৈলেন সেন, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার বসু প্রভৃতি

করে গিয়েছিল। আমি তো ওদের আগেই বলে দিয়েছিলাম—মধ্যাহ্ন রেখে কোন কাজ করব না। ওরা বলছিল ডিসেম্বরের শেষে যেতে। তা বললুম—এই চারদিনের পর আর পারব না।

তাতে বললে—পরে কবে পারবেন?

বললুম—বলতে পারিনা! ভবিতব্য জানে!

ওরা বললে—মেজর-জেনারেল চৌধুরী আপনার কথা বলছিলেন।

মেজর-জেনারেল চৌধুরী খুবই যত্ন করেছিলেন আর ওঁর স্ত্রী সত্যি গৃহলক্ষ্মী। ছ' শ' টাকা মাইনের অফিসারের বৌরা রঙ মেখে, বিদঘুটে জুতো আর গা-খোলা ব্লাউজ পরে আসত আর একুশ শ' টাকা মাইনের অফিসারের বৌ একেবারে খাঁটি মধ্যবিত্ত বাঙালী বৌ। বাড়িতে জুতো পরেন না, এক বাগানে বেড়ানর সময় চটি পরেন। সকালে সাড়ে পাঁচটায় উঠে কুকুরকে নিয়ে বেড়িয়ে এসে, চান করে পুজো সেরে, রান্নাঘরে ঢুকলেন।

আমি জেনারেল চৌধুরীকে বললুম—আপনার খুব সৌভাগ্য মশায়!

জেনারেল চৌধুরী হচ্ছেন সেকেলে দুঁদে আই. এম. এস.—যুদ্ধের সময় সুরাবায়াতে আটকে গিয়েছিলেন। ওঁর কাছেই অস্ট্রেলিয়ান আর ব্রিটিশদের খুব নিন্দে শুনি। বলেছিলেন—ওরকম স্বার্থপর আর কাউয়ার্ড দেখিনি, নিজেদের বাঁচাতেই ব্যস্ত। সুরাবায়া থেকে এক জাহাজে গাদাগাদি করে কলোম্বো এসেছিলেন। বললেন—কলোম্বো এসেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল! সেখানেই প্রথম চান করা, দাড়ি কামানো ইত্যাদি সারলাম। ওদের গালাগাল দিয়ে সব চেয়ে আনন্দ পেয়েছি।

এবার নিজের কথা বললেন—এই নাটকগুলো শেষ করেই চোখ কাটাব। অন্য কোন কাজ আর নেই। তবে নার্সরা বড্ড জিনিসপত্র চায়—সিগারেট দাও, চকোলেট দাও। কিন্তু খাটেও ওরা খুব।

বলা হল—সে সব নার্স আজকাল আর নেই।

বললেন—ওঃ আজকাল তারা নেই বুঝি?

তাঁর আগের কথার জের টেনে কে একজন বললেন—আর্মির লোকেদের ঠকান খুব শক্ত, যায় না বললেই হয়। হেসে বললেন—আর্মির লোকেদের ঠকান যায় না বলছ? তবে একটা গল্প বলি শোন। তখন আমি মদনে। সেখান থেকে কিসের সব ক্যানভাস সাপ্লাই দিয়েছে, তা মাপে ছোট হয়েছে। সে এক দুঁদে সাহেব মেজর এসে হাজির—গোলমাল হয়েছে, সব ফেরৎ নিতে হবে।

সবাই ভেবে অস্থির, কি করবে ঠিক করতে পারছে না। সামলালে বুড়ো মদন নিজে! বললে—নিশ্চয়, ছোট হলে ফেরৎ নেব বৈকি। কিন্তু তুমি নিজে যে কোন একটা বাক্স থেকে বার করে দেখ মাপ ঠিক আছে কিনা!

সাহেব তখনি ঘেঁটেঘুঁটে বার করে তিনটে বাক্স খুললে, দেখা গেল মাপ ঠিক আছে। ব্যস, গোলমাল মিটে গেল।

সাহেব চলে যেতে অন্যরা বললে—বাব্বা, খুব বরাত ভালো। আমাদের ভয়ে বুক টিপটিপ করছিল।

২৪শে নভেম্বর মালিনীর রিহার্সালে এসে প্রথমেই বললেন—দেখ একটা দল খোলা তো দরকার! মিনিমাম খরচ নিয়ে শহরে-শহরে অভিনয় করে বেড়াবে, তাতে অন্ততঃ নাটক সম্বন্ধে ইণ্টারেস্ট বাড়বে। এরকম দু-তিনটে গ্রুপ একসঙ্গে বের করা দরকার।

মালিনীর কথা তুললেন—মালিনী খুব ভালো বই, চরিত্রগুলোর ডেভেলপমেণ্ট খুব ন্যাচারাল। রবীন্দ্রনাথ সত্যিকারের বড় নাট্যকার হতে পারতেন, কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গে তো মিশলেন না—না, না, তাহলে ভুল বলা হয়, মিশতে উনি চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি।

প্রথম অবস্থায় পারেন নি, কারণ তখন যারা থিয়েটারে ছিল, তারা ওঁকে আমল দেয় নি, আর তাছাড়া ওঁর মতো লোকের পক্ষে তাদের সঙ্গে মেশাও কষ্টকর ছিল। দ্বিতীয় অবস্থায় ওঁর স্তাবকরা মিশতে দেয় নি। যা উনি করেছেন, তাই খুব ভালো, খুব ভালো, করেছে সবাই। আর শেষের দিকে উনি তো বিশ্বের হয়ে গেলেন।

ওঁর তপতীও খুব ভালো বই।

বিনয়দা বললেন—তপতীর শেষটা মোটেই লজিকাল নয়।

বললেন—বইএর শেষটা লজিকাল নয় বলছ কেন বিনয়? রাণী আর কি করতে পারতেন? তাঁর পক্ষে তো আর ঘরে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া অভিনয় করলে খুব জমে যায়।

এবার একজনকে পড়তে ডাকলেন—দেখি পড়। হ্যাঁ, গলা ভালো, কিন্তু উচ্চারণের দোষ আছে। আচ্ছা ওখানে একটা অনাবশ্যক W দিলে কেন! ওই হাফ-ভাওয়েলকে আমরা W বলি। ওতে কি লাভ হয়?

রিহার্সাল সুরু করবেন, বললেন—শ্যামলী এখনো এল না কেন?

বিনয়দা'ই বোধ হয় বললেন—তারা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

বললেন—না, না, ওকে সরাসরি আসতে বল। তারা নানা কাজের লোক, তার পক্ষে নিয়ম মেনে আসা কষ্টকর। তা আজ এল না কেন ?

কে বললে—W.B.P.C.Cর মিটিং আছে।

বললেন—সেটা আবার কি ?

তারপর বুঝিয়ে দিতে বললেন—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। হ্যাঁ তার মিটিংএ যেতে পারে।

সকলে মিলে ওঁকে মালিনী নাটকটা পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেন।

বললেন—পড়ে শোনাব! ভেবেছিলুম আজ ফাঁকি দেব। আচ্ছা পড়া যাক।

কিন্তু পড়া আরম্ভ করার আগেই ওঁরা এসে পড়লেন, বেশ একটু নিশ্চিন্তভাবে বললেন—এসে গেছে, তবে শুরু হোক রিহার্সাল। প্রম্পট্ করবে কে ? সবাইকে কিন্তু ভালো করে মুখস্থ করতে হবে। প্রম্পটার থাকবে, বইও থাকবে, কিন্তু প্রম্পট্ করা হবে না। নিতান্ত যখন একেবারে ভুলে যাবে তখন ধরিয়ে দেবে।

সুপ্রিয় কে করবে ? ঐটাই সবচেয়ে কঠিন পার্ট। ক্ষেমঙ্করের পার্ট তো অথর ব্যাকিং আছে, একটু করতে পারলেই চলে যায়। কিন্তু সুপ্রিয়র ঐ যে বোকা বোকা পার্ট, ঐ ভ্যাসিলেটিং মাইণ্ড—ওটা ফোটান বেশ কঠিন।

কে ওঁকে লেখার কথা বলায় বললেন—দেখ, লেখা কিছুটা দরকার। কি ভাবে অভিনয় করতে হয়, সে সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বড় দরকার—কতকগুলো নাটকের নাটকীয় চরিত্রগুলোকে অ্যানালাইজ করা। চরিত্রের ইণ্টারপ্রিটেশন কেমন হবে, তা নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, একটার বেশি ইণ্টারপ্রিটেশন থাকতে পারে, তা নইলে কন্টিনিউয়াস অভিনয় করতে করতে স্টেল হয়ে যেত, রাতের পর রাত একটা চরিত্র ফোটাতে পারত না।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের সবচেয়ে বড় দোষ ডাইরেক্ট নয়, তবে মানুষটি নিজেও তো ডাইরেক্ট কথা বলতেন না, ওঁদের ধারাই হল ইনডাইরেক্ট কথা বলা।

ওঁকে আমাদের থিয়েটারে এনেছিলুম, কিন্তু নাটক আর দেখা হয় নি। বললেন—আমি এখন বাইরে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমাদের নাটক দেখব।

তা উনি যখন ফিরে এলেন, অভিনয় আর তখন হচ্ছে না।

অভিনয়ের সময় কথা বলবার কৌশল শেখালেন—কথা যখন বলবে তখন ঠোঁট বা গলা থেকে নয়, বলবে বুক থেকে। আর যখন আরো গভীর কথা বলতে চাও তখন বলবে পেট থেকে। আমি তো ঠোঁট থেকে কথাই বলতে পারি না

চাণক্যর কথাগুলো—'নর্দমার পচা-পাঁক' কি 'বদ্ধ জলার ওপর ধোঁয়া উঠছে' ওগুলো পেট থেকে বললে খুব ভালো শোনায়। এদিক থেকে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল দানীবাবুর।

দেখ, আমি যখন এই সব নাম বলি, তখন ধরে রাখবে গিরিশবাবু অলওয়েজ একসেপ্‌টেড। ওঁর সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। অমৃতলাল বোসের কাছে শুনেছি, যৌবনে ওঁর কণ্ঠ ছিল নাকি অতুলনীয়। তারপর এক সময়ে কি জন্যে জানি না, উনি নাকি গলা দিয়ে দেন।

আমি কিন্তু বিশ্বাস করি নি। আমার মনে হয় অপরিমিত মদ্যপানের ফলে ওঁর গলা নষ্ট হয়ে যায়। ওঁর মদ খাওয়া কি সাধারণ খাওয়া!

একবার ছোটবেলায়—তখন আমার কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল—গিরিশ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, সঙ্গে ছিলেন একজন বয়স্ক লোক। আমাদের সামনেই গেলাস এল, চেহারা দেখে তখন মনে হয়েছিল বুঝি লাইমেড খাচ্ছেন, এখন বুঝি 'র'। সঙ্গের ভদ্রলোককে জিগ্যেস করাতে তিনি ইনডাইরেক্টলি বললেন—মদ-টদ হবে। তিনি বলেছিলেন—ব্র্যাণ্ডি। এখন বুঝি ব্রাণ্ডি নয়, হুইস্কি।

তা এই রকম এক ঘণ্টায় তিনবার খেলেন, মানে মোট পরিমাণ সাড়ে আট আউন্স হবেই। এক ঘণ্টায় সাড়ে আট আউন্স, তাহলে সারাদিনের পরিমাণটা ভাব একবার! অমৃতলাল বোসের লেখায় চার ছিলিম গাঁজা, দু' বোতল হুইস্কি আর এক ডজন বিয়ার খাবার কথা আছে।

গিরিশবাবুর উচ্চারণ মোটামুটি ভালোই ছিল। দু'একটা উচ্চারণের ভুল এখনো মনে আছে। একটা হল মুন্ত্রী—মন্ত্রী উনি কিছুতেই বলতে পারতেন না, বলতেন মুন্ত্রী। আর একটা হল—কুহুক। ওটাতে আমারই গোলমাল হয়, কুহকীর কুহকে পড়ে গেছি আর কি।

উচ্চারণ ভালো করতেন অমৃত মিত্তির আর অর্ধেন্দুবাবু। অর্ধেন্দুবাবুর তো কোন দোষই ছিল না।

থিয়েটারের সঙ্গে পানদোষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; অমন যে হেনরী আরভিং, যিনি আয়রন ডিসিপ্লিন মেনটেন করতেন, তিনি পর্যন্ত প্রচুর মদ্যপান করতেন। শোনা যায়, একবার এমন অবস্থা যে দাঁড়াতে পারছেন না, অভিনয় কিন্তু ঠিকই করছেন। অভিনয়ের পরে কার্টেন কলে ঠিকমত যেতে পারবেন কিনা সবাই ভাবছে, কিন্তু ঠিকমত গেলেন, একই ভাবে হাঁটু মুড়ে বাউ করলেন। একবার

ছ'বার করে পাঁচবার গেলেন। শেষবার ফিরে আসতেই ছ'পাশ থেকে ছ'জন ধরে ফেললে, কারণ আর চলবার অবস্থা ছিল না।

আরভিং-এর চেহারা ভালো ছিল না, গলা ছিল শ্রিল; কিন্তু তার মধ্যে থেকেই পার্সনালিটি কেমন প্রোজেক্ট করতেন।

ভগবান সব বড় অভিনেতাকেই বড় বড় চোখ দিয়েছেন, কেবল আমাকেই বঞ্চিত করেছেন! তবে তা নিয়ে দুঃখ করলে চলবে না, যা আছে তাকেই ফোটাতে হবে।

আলো সম্বন্ধে বললেন—আলো সাধারণ আলোই ভালো। স্পট দিলে এক জনের মুখে আলো পড়ে বটে, অন্যজনের মুখে অন্ধকার হয় আর তাহলে তার মুখের রি-অ্যাকশানটা বোঝা যায় না। তার চেয়ে ওয়াইড ফ্লাডলাইড ব্যবহার অনেক ভালো।

ডিমারের কথা বলায় বললেন—ডিমার তো আমারও ছিল। ডিমার করতে আর কত খরচ পড়ে? একশো সাতাশী, দুশো সাতাশী, তিনশো সাতাশী টাকার মতো হবে! তবে পয়েণ্টের ডিমারের চেয়ে জলের মধ্যে দিয়ে ডিমার ইউজ করার ফল অনেক ভালো হয়।

২৭শে এলেন সাধারণ রিহার্সাল দিতে। প্রথমেই বললেন, মালিনী নাটক আমাদের ভালোই হবে, তবে অনেক দিন রিহার্সাল দিতে হবে। মেয়েদের পার্ট দু'টোয় খুব সুন্দর মানাবে শ্যামলী আর করুণাকে। ছেলেদের নিয়েই ভাবনা! সে রকম ভালো ছেলে কই? রবীন্দ্রনাথের লেখাতে ছোট ছোট চরিত্রগুলোও বেশ কঠিন। সুপ্রিয় চরিত্র কে করবে? ক্ষেমঙ্করের চরিত্রে তো লেখক নিজেই জোর দিয়ে গেছেন।

সীতাতে আমার লাভ হল না। অথচ মাসের পর মাস ৫৲/৭৲ টাকার টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। এমন অন্য কোনো বইয়েতে দেখি নি। লাভ না হবার কারণ লোকে প্রচুর ঠকিয়েছিল। তাছাড়া মিসম্যানেজমেণ্ট আর চুরিও ছিল।

আবার বললেন—ঐ যে মনোমোহনে ছিল, গলাবন্ধ কোট পরত, সীতার সিনের জন্যে পুরানো কাঠ আমাকে এনে দিলেন, চাইলেন দশ হাজার টাকা। আমি দিয়ে দিলুম। তখন কি জানি, মনোমোহন থিয়েটারের পুরানো সিনগুলো আমায় বেচে দিয়েছেন।

আমি যখন মনোমোহন থিয়েটার থেকে চলে আসছি তখন মনোমোহন বাবু বললেন—ওগুলো তো তোমায় ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল।

আমি বললুম—সে কি? ওগুলো তো আমি কিনেছি।

উনি বললেন—কিনলে কি রকম? কাঠগুলো দেখ তো?

দেখি, সত্যি সত্যি সব পুরানো কাঠ, মানে পুরানো সিন কেটে করে দেওয়া।

মনোমোহন থিয়েটার থেকে আমাকে উঠিয়ে দেবার জন্যে কত রকম চেষ্টা হল। অত বছর ধরে অত লোক যেখানে বসে থিয়েটার দেখেছে, সেটার মধ্যে অনেক রকম দোষ দেখান হল? দাশ সায়েব থাকতে অবশ্য পারে নি, কিন্তু যা চেষ্টা করতে বললে, তা কনডেমনেশনেরও বেশি। হরিপ্রিয় আমাকে বললে—ও বাড়ি লোক বসিয়ে ভাঙা যায় নাকি? শাবল দিয়ে ভাঙতে পারে কিনা ছাখ তো! তুমি কেস কর, আমরা তোমার হয়ে সাক্ষী দেব।

কিন্তু তার অগেই আমাকে বাড়ি ছাড়তে হল, আর আমি ছাড়া মাত্র কনডেমনেশন উইথড্রন হল।

মহেন্দ্রবাবু আমার গ্যারাণ্টর ছিলেন, ওঁর সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট লেখা ছিল, উনি বললেই আমি বাড়ি ছেড়ে দেব।

আমার সঙ্গে মনোমোহন পাঁড়ের যখন গোলযোগ চলেছে, তখন মনোমোহন বাবু হঠাৎ ওঁর ছেলেদের গিয়ে কি বোঝালেন, তারাও আমায় এসে বাড়ি ছেড়ে দিতে বললেন। আমিও ছেড়ে দিলুম।

থিয়েটারটা কিন্তু ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ভাঙত না। গার্নার না বমপাস—ওদের চীফ আর্কিটেক্ট—আমায় বললেন—ও বাড়ি আমরা ভাঙতে চাই না। আমাকে ইকুইভ্যালেণ্ট জায়গা দাও, আমি বাড়ীটাকে আইল্যাণ্ডের মত রেখে দু'পাশ দিয়ে রাস্তা বার করে নিয়ে যাব।

তাড়াতাড়ি মনোমোহন বাবুকে খবরটা দিতে গেলুম, ভেবেছিলুম খবরটা পেয়ে খুশী হবেন। তা নয়, বললেন—না ভায়া, ও বাড়িতে আমার লক (luck) গেছে, ও বাড়ি ভেঙেই ফেলুক।

আমাদের এখন অনেক নাট্যকার দরকার। নাটক লিখুক না, অন্ততঃ খান তিনেক বই নিয়ে আমরা অভিনয় করতে নাবি। আমি কিন্তু ৫০ রাত্তিরের বেশি কোন নাটক করতে দেব না।

২৭শে এলেন অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে, আগের দিন পড়ার চশমার ডাঁটিটা ভেঙে গেছে, বললেন—এখন কি করে পড়ব বল তো?

একজন চশমাটা তাড়াতাড়ি সারাতে নিয়ে গেল। তখন বললেন—চুপচাপ বসে থেকে কি করব? তার চেয়ে দু-একটা কবিতা আবৃত্তি করি। তোমরা শোন, যদি কোথাও আটকায় বা ভুল করি তো আঙুল তুলে দেখিও।

এর পর মিনিট পনেরো-কুড়ি একটানা আবৃত্তি করে গেলেন, দু'তিনটে কবিতা বললেন, একবারও আঙুল তুলতে হল না। আবৃত্তি শেষ করে বললেন—তাহলে শিশির ভাদুড়ি এখনো মরে নি।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—চশমাটা এখনও নিয়ে এল না!

দেবুদা সান্ত্বনা দিলেন—ব্যস্ত হবেন না, পাকা লোক গেছে, সারিয়েই নিয়ে আসবে। তাছাড়া সারাতেও তো সময় লাগবে।

থিয়েটারে কে প্রম্পট্ করবে, সে সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে বললেন—দেখ, কম বয়সে অনেক কিছু করেছি, যা এখন ভাবলে বুঝি অন্যায় করেছিলুম। প্রথম প্রথম প্রম্পটারদের কি কম কষ্ট দিয়েছি! বলতে বলতে কথা ভুলে গেছি, ভাবলুম, কি আমি শিশির ভাদুড়ি, আর আমি নিজে তৈরি করে বলতে পারব না? বলতুমও, লোকের তা ভালোও লাগত, হাততালি দিত। কিন্তু হতভাগ্য প্রম্পটারের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। এ পাতা ও পাতা সে পাতা খুঁজে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আমার বলার পর ধরিয়ে দিতে কি কষ্ট তাকে পেতে হত বল দেখি?

উনি কথাও শেষ করেছেন আর চশমাও সারিয়ে নিয়ে ফিরে এল। খুশী মনে চশমাটা হাতে নিয়ে পরতে পরতে বললেন—এই সব সংস্কৃতি-টংস্কৃতির প্রচলন কবে বন্ধ হবে বলতে পার? এই যে সভায় গিয়ে দু-চার কথা বলা এতে কার লাভ হবে?

শর্মিষ্ঠা পড়তে সুরু করলেন। একটা দৃশ্য পড়ে বললেন—এই দৃশ্যটার কোন প্রয়োজন নেই, একেই বলে বিষ্কম্ভক। লোকেরা বলেছে হাস্যরস দিতে হবে, তাই হাস্যরস দিতে চেষ্টা করেছেন। বইটা আমার কেটে পড়াই উচিত ছিল। এতে যেসব অবান্তর কথা আছে, কেষ্টকুমারীতে সেসব কিছুই নেই। এ বইটার ওপর সংস্কৃতের প্রভাব প্রচুর। জায়গায় জায়গায় আবার সেক্সপীয়রের ছাপও আছে।

শর্মিষ্ঠাতে উনি তবু ভয়ে ভয়ে বিশ্বনাথের অনুশাসন মেনেছেন, কিন্তু কেষ্ট-কুমারীতে একেবারে সব কনভেনশন লোপ করেছেন। কেষ্টকুমারীর মতো নাটক বাঙলায় কমই আছে, এমন কি তার থেকে নাটক এগোয় নি।

আবার একটা দৃশ্য পড়ে বললেন—এই যে দু'জনে দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না, এটা মিড-সামার নাইটস্ ড্রিমের মতো।

মাইকেল অনেকগুলো ভাষা জানতেন। ইংরেজী ছাড়া ল্যাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান আর সংস্কৃত—এই ছ'টা হল। সুতরাং টার্নারের মতানুযায়ী উনি কালচার্ড। উইলিয়াম টার্নার বলেছেন—যে ছ'টা ভাষা জানে না, সে কালচার্ড নয়।

ঈশ্বর সিং আর প্রতাপ সিং-এর ছবি কোথাও আছে? নাচঘরে বুঝি বেরিয়েছিল, জাতীয় নাট্যশালা করলে সেখানে ওদের দুটো বড় বড় ছবি টাঙিয়ে রাখা উচিত, বেলগেছেতে ওরা না করলে বাঙলা নাটক কোথায় থাকত?

মাইকেলের গান হল গিরিশবাবুর আদর্শ, অবশ্য উনি অনেক ভাল লিখেছেন।

১লা ডিসেম্বর মালিনীর রিহার্সাল দিতে এসে প্রথমেই বললেন,—ব্রাহ্মণগুলো বেশ ভাল লোক চাই—পাঁচ জন কথা বলার আছে, চার জনে করা যেতে পারে, দেবদত্তর মোটে দু'-তিনটে কথা আছে। চারুদত্তের কথাগুলো একটু বাঁকা ধরনের। সোমাচার খুব হুড়মুড় করে কথা বলে এবং একটু বেশী ইমোশানাল।

সুপ্রিয়র চরিত্রটা খুব শক্ত, ওটা করার জন্যে ভালো লোক চাই। একজন এসেছিল বাড়িতে, কার্তিক এনেছিল, গলাটা বড় ভালো; ঘরে তো ঠিক বোঝা যায় না, এখানে আসতে বলেছিলুম, কিন্তু এল না কেন বুঝতে পারছি না।

এরপর কিছুক্ষণ রিহার্সাল হল। আমাদের আগ্রহাতিশয্যে রাজার ভূমিকা নিতে রাজি হয়েছিলেন। কাশ্যপ, মালিনী, রাজা আর রাণীর ভূমিকারই রিহার্সাল হল। একসময়ে চা এল, চা খেতে খেতে গল্প জুড়লেন—পুলিস আজকাল যেখানে সেখানে ঢোকে, কলেজের কর্তারা নিজেরাই ডেকে আনেন। অথচ এদিক দিয়ে সায়েবরা অনেক ভাল ছিলেন।

এণ্ড্রু ফ্রেজার আসছেন স্কটিশ কলেজে—উনি নিজেও তো স্কচম্যান। তা খুব জোর অ্যারেঞ্জমেণ্ট হয়েছে। এণ্ড্রু ফ্রেজারকে মারবার চেষ্টা হয়েছিল, আবার মারতে গিয়েছিল স্কটিশেরই ছেলে জীবনলাল।

বাইরে চারিদিকে পুলিস দেবার পর এক অত্যুৎসাহী পুলিস কর্মচারী কোয়াড্রাঙ্গেলের ভেতর, সিঁড়ির আশেপাশে লোক দাঁড় করাতে শুরু করলেন, ওয়ান সায়েব তখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন, পুলিস দেখে এসে বললেন—**Who has allowed you to come in?**

অফিসারটি আমতা-আমতা করতে আরম্ভ করলেন। ওয়ান সায়েব তখন

বললেন—You get out of my compound.গেটের ধারে দাঁড়াতে বললেন—No, out my compound. He is my guest, I know how to receive him.

জেমস সায়েবও ঐরকম ছিলেন। ইডেন হিন্দু হোস্টেল সার্চ করতে দিলেন না, আর তার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাকরি ছাড়তে হল। প্রথমে বললেন—দেব না। তারপর রাত্তিরবেলা নিজে দাঁড়িয়ে থাকলেন, বললেন—আমার ছেলেদের তোমরা অসুবিধেয় ফেলবে, তা চলবে না।

কিছুই অবশ্য পাওয়া গেল না। একটি ছেলে একটা ভাঙা তোরঙ্গ চাবি বন্ধ করে একগাছা ঝাঁটা রেখে দিয়েছিল। তারপর বলছে, চাবি পাওয়া যাচ্ছে না, তালা ভাঙুন। একটা লোহার কি দিয়ে টানতেই খুলে গেল—দেখে ঝাঁটা!

জেমস সায়েবের ওপর সেই থেকে গভর্নমেণ্ট চটে গেল, তারপর বিপদে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। উনি শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিলেন।

যখন তখন পুলিস যেখানে সেখানে এসে হাজির তখন। একদিন দেখি প্রেসিডেন্সী কলেজে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, সঙ্গে টেগার্ট নিজে। আমার অ্যাকাউন্টান্টের সঙ্গে একটু দরকার ছিল। গিয়ে বলতে মিষ্টি হেসে টেগার্ট বললে—You can not go through this road to-day. Go by the side-door,

বেকার ল্যাবরেটরীর পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে প্রশ্ন করলুম—কি ব্যাপার?

ভদ্রলোক বললেন—কে জানে!

সায়েবদের মধ্যে উলটো ধরনের লোকও ছিল।

দেখ, প্রথম যখন অভিনয় করতে আরম্ভ করি তখন আমার সময় খুব ভালো ছিল। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত আমার কোন বই-ই ফেল করে নি, প্রথম ফেল করল রবীন্দ্রনাথের তপতী।

একটু থেমে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, আমার 'পরিচয়' লোকে নিল না কেন?

বিনয়দা বললেন—ওর নায়ক মুসলমান।

বাধা দিয়ে বললেন—ওর নায়ক তো মুসলমান নয়, হিন্দু। আমাদের সমাজ তাকে মুসলমান করে দিল।

বিনয়দা বললেন—রায়টের ঠিক পরেই এ কাহিনী মেনে নিতে দেশের লোক প্রস্তুত ছিল না।

একটু সময় ভাবলেন, তারপর বললেন—রায়টের পরে বলেই গোলমাল হল

বলছি। কিছুক্ষণ চুপ করে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, তখত এ-তাউস তো প্রোডাকশান হিসেবে বেশ ভালো হয়েছিল; অভিনয়ও কিছু খারাপ হয়নি, তবে ৭৭০ টাকার বেশী বিক্রী হল না কেন?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর কেউ দিতে পারলেন না। চুপচাপ বসে রইলাম সবাই। একসময়ে আবার রিহার্সাল শুরু হল—এবার ব্রাহ্মণদের বলালেন।

রিহার্সাল শেষ হয়ে গেল, শুরু হল গল্প। নিজের পাবলিক থিয়েটারে প্রথম নাবার সময়কার কথায় বললেন—আমি যখন প্রথম থিয়েটারে আসি, থিয়েটারের তখন কি ভয়ংকর অবস্থা!

তখনকার দিনে দেখেছি আগা হাসার রিহার্সাল দিচ্ছেন আর মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছেন, সঙ্গে বিয়ারের বোতল-হাতে লোক। খেয়েটেয়ে গিয়ে আবার বসতেন রিহার্সালে। গিরিশবাবুর রিহার্সালের সময়েও হুইস্কি-সোডা বসান থাকত। জিনিসটা কিন্তু বড় দৃষ্টিকটু লাগত, নয় কি? সবাই তো আর গিরিশবাবু নয়! উনিও বলতেন—আমি মদ খেলে মাতাল, স্টেজে নাবলে গিরিশ ঘোষ, মদ না খেলে তু বেটা কেরে? তবু বলব ওঁরা প্রিসিডেন্ট ভালো রাখেন নি।

থিয়েটারে এসে ভালোই করেছিলেন বলায়, বললেন—এসে আর কি করলুম। কিন্তু তবু বলব, এই একটা জিনিসই কিছুটা করতে পারি আমি। এ কাজে নেবে আমার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। তখন পড়াতে হত কম, বাকি সময়টা জমি কেনা-বেচা, বন্ধক ইত্যাদির দালালী করে অনেক রোজগার করতুম। থিয়েটারে নাবায় সেগুলো সব বন্ধ হল তো।

২রা ডিসেম্বর রিহার্সালই হল, অবশ্য তারই ফাঁকে দু-চার কথা বললেন। প্রথমে আগের হপ্তায় কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গে বললেন—কেষ্টনগরে গিয়ে খুব একচোট বলে নিয়েছি। সংস্কৃতি নিয়ে এই ধরনের ছেলেমানুষী আমার ভালো লাগে না। আমি বোধ হয় বেশিই বকি; আর বকব না। এই সব সংস্কৃতির ব্যাপারে আমি থাকবই না।

কেষ্টনগরে গিয়ে অমিয় সান্যালের সঙ্গে দু-একবার ছিলুম। ও ফিফথ ইয়ার কমপ্লিট করে আর পরীক্ষা দিলে না। বাবা দীননাথ সান্যাল অনেক পয়সা রেখে গিয়েছিলেন তাই, তা নাহলে কষ্ট পেতে হত।

গুরুদাসবাবু আর বিনয়বাবু বেঁচে থাকলে আমার পক্ষে থিয়েটারে নাবা কষ্টকর হত। সিণ্ডিকেটের মেম্বার হলেও আমি থিয়েটারে নাবতে পারতুম না।

গুরুদাসবাবু বলেছিলেন—থিয়েটারই তোমার রিয়েল ভোকেশান, কিন্তু আমাদের দেশে থিয়েটারের সামাজিক মূল্য জান তো?

থিয়েটারের একজন লিবারেল মাইণ্ডেড প্যাট্রন দরকার, মিস্ হনিম্যানের মত। ঝগড়া করছে, কিন্তু কখনও টাকা দেওয়া বন্ধ করছে না। বিলেতে সরকার দেয়; ওল্ড ভিক ২৮০০০ পাউণ্ড পায়, আগে পেত ৩৫০০০ পাউণ্ড। স্যাডলার ওয়েলস পায় লক্ষাধিক পাউণ্ড। ওদেশে অপেরার খুব দাম দেয়। ইউরোপ তো অপেরার জন্যে পাগল। অপেরার সিঙ্গার বা অভিনেতাদের মাইনে অনেক বেশি।

মেট্রোপলিটান (গ্রাণ্ড অপেরা)-এর পুরানো বাড়িটা কি বদলেছে? সে বাড়িটা মোটেই কিছু ভালো ছিলনা।

আগেকার দিনের অভিনেতারা আমাদের সময়ের অভিনেতাদের চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন। আমরা যতই হৈ-চৈ করি না কেন, এক প্রোডাকশানে কিছু উন্নতি করা ছাড়া ইণ্ডিভিডুয়াল আর্টিস্টিক ব্রিলিয়ান্সে পুরানোদের কাছেই লাগি না। অর্ধেন্দুবাবুর কথাই ধর। ঐ যে পেটুক বামুন—গজপতি বিদ্যাদিগগজ—করলেন, দেখলে একেবারে পিলে চমকে যায়। একটা কমপ্লিট ক্যারে-ক্টারাইজেশন।

গিরিশবাবুর তো কথাই নেই। কিন্তু উনি বড্ড ফাঁকি দিতেন। ছত্রপতি শিবাজীর চতুর্থ দিনে দেখলেন, লোকজন বিশেষ হয় নি, 'অমনি চল মন্ত্রী, মন্ত্রণার প্রয়োজন' বলে বেরিয়ে গেলেন। আমি অমন করি নি, ২৫৲ টাকা যেদিন বিক্রী সেদিনও সব কথা বলেছি, ৪৮৲ টাকা বিক্রীতেও প্রাণপণ চেঁচিয়েছি।

গিরিশবাবুর পাণ্ডবগৌরব মোটেই ভালো বই নয়। আমি অবাক হয়ে ভাবি—ঐ হাত দিয়ে ঐ জিনিস বেরোল কি করে। ফরমাসী লেখা অবশ্য সেক্সপীয়ারও লিখেছেন, কিন্তু তবু কেমন ভালো লাগে না।

গিরিশবাবুর সঙ্গে দ্বিজুবাবুর সদ্ভাব ছিল না, দ্বিজুবাবুর বইএতে কখনও নাবেন নি। দ্বিজুবাবুও ওঁর লেখাকে ভালো বলতেন না। একবার মহেন্দ্র মিত্র গোলমাল মেটানর জন্যে দ্বিজুবাবুর কাছে গিরিশবাবুকে নিয়ে যেতে চাইলেন। গিরিশবাবু বললেন—তুমি বলছ যখন, হাফ মনিব, চল দেখা করে আসি, কিন্তু লাভ কিছু হবে না।

দ্বিজুবাবু তখন সুরধামে থাকতেন। পুরানো সুরধাম দেখেছ তো? সাজানো বাগান, বারান্দা ইত্যাদি ছিল। বাগানে মহেন্দ্রবাবু আর গিরিশবাবু বসলেন; দ্বিজুবাবু তখন ভেতরে। সেখানে তখন গুজব-সম্রাট ছিল—সে ছিল আবার দ্বিজু

বাবুর খুব ভক্ত—তার কাছ থেকেই শোনা, কি দু-একটা কথার পর মহেন্দ্রবাবু বললেন, চলুন, এবার যাওয়া যাক।

অপরেশবাবুর কর্ণার্জুন লেখার মতলবটা তো আমার সামনেই খাড়া হয়। ওঁরা বললেন—পার্শী থিয়েটার মহাভারত করে এত পয়সা করলে আর আমরা কিছু করতে পারি না?

অপরেশবাবু বললেন—আমার কর্ণার্জুন লেখা হচ্ছে।

তার আগে ক্ষীরোদবাবু কর্ণ লিখবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সেটা কিন্তু চাপা পড়ে গেল। আমাকে দেখতে যেতে বলেছিলেন, দেখি হুবহু পার্শী মহাভারতের মতো। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ একেবারে গহরের যেভাবে বস্ত্রহরণ করেছিল সেই ভাবে। রক্ত দেখাতে হলে ব্লাডারে লাল রঙের জল পুরে কায়দা করে রক্তপড়া দেখাত। তিলুয়া ভীম করত, সে দুঃশাসনের বুকে বসে জামার ভেতরে রাখা ব্লাডারের লাল রঙের জল খেত।

অভিনয় দেখার পর আমায় যখন জিগ্যেস করলেন, কেমন দেখলে? তখন কি বলি! নরেন বোসের বৈঠকখানার কথা, নরেন বোস বললে—বাজে।

আমার ওপর কিন্তু খুব চটেছিলেন।

সীতায় আমার লোকসান হবার কথা নয়, শুধু চুরিই নয়, ঠকানোও হয়েছিল আমাকে। আজ দু'শ' টাকার কাঠ এল, কাল তিনশ' টাকার কাঠ—এমনি কত নিলে। অথচ মাসের পর মাস পাঁচ টাকার টিকিট ফুল।

আলিবাবাতেও খুব বিক্রী হয়েছিল, পাঁচ রাতে একুশ'শ, বাইশ'শ' তেইশ'শ, টাকা পর্যন্ত। আমি কিন্তু নাবি নি।

আজকালকার দিনে মহৎ নাট্যসৃষ্টি আর হচ্ছে কোথা? তিন'শ, চার'শ রাত্তির চললেই কি মহৎ নাটক হয়? লোকের মনে তেমন নাড়া দেয় কৈ? লোকে তার ডায়ালগ বলে কোথা? রাস্তায় তার গান গাওয়া হয় কৈ? রঘুবীর তো মোটে দু' নাইট হয়েছিল আর তার পরেই আমি ছেড়ে দিলুম। কিন্তু ঐ দু'দিনেই গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে গেল! তার কারণ গুপ্তহত্যা।

থিয়েটারের আগে বক্তৃতায় আমিও তো বলেছি—স্বাধীনতা আসা দরকার, তা সে অহিংস উপায়েই হ'ক আর সহিংস উপায়েই হ'ক।

তাতে পুলিসের হীরালাল মুখুয্যে বললে—দাদু, আমাদের চাকরি কি আর আপনি রাখবেন না?

আমি বললুম—বেশ তো, আমায় না হয় ধরেই নিয়ে যাবে। ছ' মাস আটকে রাখলে আমার বিক্রী বেড়ে যাবে।

একবার আমায় অম্বালাল সারাভাই বম্বে যেতে বলেছিল, বলেছিল—যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়ার খরচ দেব আর বিক্রী যা হবে তুমি নেবে।

তাতে আমি বললুম—ডিসেম্বর হল আমার বিজি সিজন। সীতা ভাল চলছে তা বন্ধ করে যাব, কিন্তু কত টাকা লাভ হবে? হাজার তিরিশ টাকা। কিন্তু তাতে তো চিরকাল চলবে না।

দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ—এইসব জায়গায় একবার যাওয়া দরকার। মালিনী নিয়ে যাওয়া যায়: কিন্তু শুধু মালিনী নয়, তিন-চারখানা বই—মানে একটা রেপার্টারি থিয়েটারের মতো আর কি। ওদের দেখান, ভালো থিয়েটার কাকে বলে। আর তার জন্যে একটা ভালো লোক দরকার, যে এসব বন্দোবস্ত করবে।

সবাইকে বলেছিলুম—স্বাধীন হ'ক দেশ, তাহলে থিয়েটারের উন্নতি একটা হবে। দেশ স্বাধীন হল কিন্তু থিয়েটারের উন্নতি কৈ? কেমন যেন সব তাল-গোল পাকিয়ে গেল। সরকারের তো এখন থিয়েটারের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা দরকার। তা সরকার করছেও, কিন্তু তাতে কি কাজ হচ্ছে?

গলা ভালো রাখার সব চেয়ে ভাল উপায় হল মিছরীর পানা খাওয়া। অনেকে ভষেস পিল খায়, কিন্তু তাতে লাভ কি? গলা ঠাণ্ডা রাখা দরকার নয়, ঠাণ্ডা রাখা দরকার পেট। আগে অভিনয় করতে গিয়ে প্রায়ই গলা শুকিয়ে যেত। একজন বন্ধু বললে, অত চা খাস কেন? মিছরীর পানা খেয়ে দেখ, অনেক ভালো থাকবি।

সেই থেকে তো ভালোই থাকি। মাইকেলে যত জায়গায় মদ খাওয়ার কথা আছে, মিছরীর পানা আর চায়ের লিকার মিশিয়ে খাই।

ওরা ডিসেম্বরে একজনকে শেখানর সময় বললেন—আচ্ছা, কথা বলতে গিয়ে একটা জায়গায় ঝোঁক দাও কেন? জার্ক দেয় কারা জান? যাদের দম কম। জার্কি স্পীচ যে সুরু করে তার আর নাম করব কেন?

আমরা অনেক অনুরোধ করায় বললেন—অ্যান্টিগোনাসের সৃষ্টিকর্তা রাধিকানন্দই জার্কি স্পীচের সৃষ্টিকর্তা। ওর থেকে নিল ভূমেন, আর এখন তো সব দিকে ছড়িয়ে গেছে।

পুরানো স্মৃতিচারণ করলেন—আমরা যখন ইনস্টিটিউটে চাণক্য করি, তখন

সেলুকাসের পোষাক দেখে প্রেসিডেন্সী কলেজের এক প্রফেসার বললেন, এটা কি ননসেন্স হয়েছে!

বিনয়বাবুও বাদ দিতে বললেন, সেই থেকে আমরা বাদ দিয়েই করি।

ইনস্টিটিউটে আমরা খুব ভালো চালিয়ে ছিলুম, স্যার গুরুদাস যতদিন বেঁচেছিলেন, না না বিনয়বাবু যতদিন বেঁচেছিলেন তারপরেও আমি ছিলুম, কিন্তু সে সবের কোন খবর পাবে না, কাগজপত্র সব নষ্ট করে দিয়েছে। আনন্দ বলছিল যে, ১৯১৩র পর আর কোন কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বললুম, সে তো যাবেই না।

আচ্ছা, ঠাকুরবাড়ির আর কি আছে এখন? একটা বাড়ি থেকে অমন চার-পাঁচ জন বড়লোক বেরোন অবশ্যই গর্বের, কিন্তু তাতে তো আর এখন কিছু লাভ হবে না। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ছাড়া অবনবাবুও মস্ত বড়লোক ছিলেন। আর্টিস্ট, লেখক, এমন কি অভিনেতা হিসেবেও তিনি বড় ছিলেন।

ইনস্টিটিউটে স্টেজের করা বই-ই চিরকাল করা হয়েছে; এমন কি আমাদের সময়েও। আমি আর অঘোর জোর করে কুরুক্ষেত্র ড্রামাটাইজ করে করালুম। নরেশকে দুর্বাসা করতে দেওয়া হল। ও বললে, তুই হিরো আর আমার দু'সিন? (আমি অভিমন্যু করছিলুম।)

কিন্তু পার্ট'টা পড়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হল। ওতে দুর্বাসাকে কর্ণের বাবা করা হয়েছিল তো।

ডি. এল. রায়ের সীতা করার একটা ইতিহাস আছে। বইটা ইনস্টিটিউটে করার কথা বলি। যাদের নিজের হাতে শিখিয়েছিলুম, তারাই আপত্তি করলে, বললে—ওতে কিছু নেই। ভার্স খাবাপ!

আমরা ঠিক করলুম, বইটা করা হবে। পার্ট সিলেকশনের দিন, আমরা চার পাঁচ জন বড় এসে বসলুম, কিন্তু যারা করবে তাদের কোন পাত্তা নেই। কিছু পরে ছোট ছোট পার্টের দু'চার জন ছেলে এল; অন্যদের কথায় বললে—এই আসছে! কাজে আছে! এসেছে তো, বোধ হয় নীচে বসে আছে!

আধ ঘণ্টা বসে চলে এলুম। সবই বুঝেছিলুম, ভেবেছিলুম আর কোনদিন ঢুকব না, কিন্তু সেই ঢুকতে হল।

ওই এলেন কৃষ্ণকুমারী নাটক পড়তে। প্রথমেই নেশা করার কথা তুললেন—নেশা করলে কিছু লাভ হয় না। শ্যাম্পেনে লোকে বলে নেশা হয় না, কিন্তু বেশী শ্যাম্পেন খেলে নেশা হয় বৈ কি। ওয়াইনের নিয়ম হল খেলে একটা

rosy langarousness (glamarousness বলতে যাচ্ছিলুম, malapropism হয়ে যাচ্ছিল আর কি ?) হয় আর স্পিরিটস খেলে হয় joyousness। অবশ্য পরে একটু রি-অ্যাকশন হয়। নেশা করলে গলা ভালো হয়, এ কথা অনেকে বলে ; কিন্তু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, মিছরীর পানা ছাড়া আর কিছুতেই সুবিধে হয় না।

আমি সব কিছু খেয়েছি। একদিন গাঁজা খেয়েছিলুম। সেদিন ইনস্টিটিউটে বুদ্ধদেব ; গলাটা খুব ভাল নয়, গুরুদেবের আদেশে গাঁজা খেয়েছিলুম। মন্মথ বাবু ইনডাইরেক্টলি বললেন—গাঁজা খেলে গলা ভালো হত।

অমূল্য চক্রবর্তী তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, সে বললে—ভাবনা নেই, আমার ওখানে চল।

সেখানে গিয়ে হাত-কল্কে সেজে দিল, কিন্তু একটান দিতেই হুড়হুড় করে বমি করে ফেললুম, মাথা ঘুরতে লাগল। বললুম—আমি এখন শোব।

বুদ্ধদেব থিয়েটার করার আগেই বুদ্ধু বনে গেলুম। অবশ্য গলার কিছুই উন্নতি হল না।

আর একবার এক বন্ধু বললে—সবাই খায়, একটু ব্র্যাণ্ডি খা।

তা খেলুম, কিন্তু খেতে না খেতেই গলা বসে গেল। আর একবার মেদিনীপুরে থিয়েটার করতে গেছি, একজন (আমার চেয়ে অনেক বড় বয়েসে) বললেন—ওপন এয়ার বুঝছ না ভায়া, একটু বাওলা খাও। (জজ সাহেবের হাওয়ায় পাল টাঙিয়ে হচ্ছিল)।

আমারও নো প্রেজুডিস, খেয়ে নিলুম, কিন্তু কিছু লাভ হল না, গলা বসে গেল।

যারা ভাবে মদ খেয়ে ভালো অভিনয় করা যায়, তারা বোকা। মদ খেলে অনভ্যস্ত লোকের অসুবিধেই হয়। যারা অবশ্য নিয়মিত খেতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে ২।৩ আউন্স খেলে বরং সুবিধেই হয়। অনেকে নিয়মিত খান বলে অনেক বয়েস পর্যন্ত খেলে কিছু অসুবিধে হয় না।

আমার এক মামা আছেন, তিনি যে পরিমাণ আর্সেনিক খান, তা ভয়াবহ! অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত সিধে হয়ে হাঁটতেন। মাঝে অন্য অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে শরীর একটু খারাপ হয়েছে। আমায় লিখেছিলেন—তোমার হার্টের অসুখ বলেছ, প্রেসার বেশি কিনা জানি না, কিন্তু প্রেসার কম থাকলে আর্সেনিক খুব ভাল ওষুধ হত।

হাক্সলী মেস্কালিনের কথা লিখেছেন, ওটা হল সিদ্ধি। সিদ্ধি খেলে একটু boisterousness হয়; হাসি পায়, খিদে বাড়ে।

আফিং খেয়ে সাধারণতঃ ঝিম লাগে, কিন্তু শরৎদাকে কখনো ঝিমোতে দেখি নি। ওঁর আফিং খাওয়া সাধারণ লোকের মত তো ছিল না। উনি বড় এক আফিংএর ডেলা হুইস্কিতে ভিজিয়ে দিতেন, হুইস্কির রং কালো হয়ে যেত। গ্লাসে দাগ দেওয়া থাকত। সারাদিনে বেশ অনেকখানি খেতেন। শেষ ওঁর যে আটকে গিয়েছিল সে তো ঐজন্যেই।

একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, অনেকক্ষণ পরে উনি এলেন, এসে বললেন—কতক্ষণ এসে বসে আছ?

বললুম—ঘণ্টা আড়াই হবে।

বললেন—কি সর্বনাশ করেছি নিজের! তুমি আসবে বলে কাল রাতে এতখানি পেট্রোলিয়াম খেয়েছিলুম। আজ সকাল থেকে বসে বসে কিছুই হল না।

দেখলুম, মুখ দিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে। বললুম—এখনও তো আবার খেয়ে এসেছেন।

বললেন—কি অবস্থা হয়েছে এখন বুঝছ তো?

বললুম—এখনও সে কালো জিনিসটা খান তো?

তাতে বললেন—হ্যাঁ।

কৃষ্ণকুমারী পড়তে শুরু করি। তার আগে চিঠিগুলো পড়া দরকার।

একটা চিঠি পড়ে বললেন—কেশব গাঙ্গুলীকে এটা যা বলেছেন তা মনের কথা নয়, একটু তোয়াজ করা মাত্র। কৃষ্ণকুমারীর আগে রিজিয়া লিখেছিলেন, বইটা নিশ্চয় ভালো ছিল।

বাঙলা দেশের নাটক কৃষ্ণকুমারী থেকে এক পাও এগোয়নি, বরং পেছিয়েছে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের যে বাঁধন দেখা যায়, পরের (সব) নাটকের মধ্যে তার চেয়ে আলগাই দেখা যায়। ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, ইতিহাসকে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করেও এত সুন্দর নাটক আর হয় নি। সারারাত টডের অ্যানালস অব রাজস্থান পড়ে কাহিনীটি তাঁর সবচেয়ে ড্রামাটিক বলে মনে হল। আর দু'-চার দিনেই তার সিনপ্‌সিস তৈরী করে ফেললেন। কিন্তু বইটা আর অভিনয় হল না, ছোট রাজা মারা গেলেন আর সেই অজুহাতে অভিনয় করা বন্ধ হয়ে গেল, মাইকেলও রাগ করে নাটক লেখা বন্ধ করলেন।

আবার একটা চিঠি পড়ে বললেন—চিঠিটার এই অংশ থেকে জানা যায়, টডের ছিল বোধ হয় কর্পূরবতী, সেই চরিত্রই নাটকে হয়েছে বিলাসবতী।

নাটকের প্রথমটা পড়ে বললেন—রাজার একটি অবিদ্যা আছে, তার কাছে যাবেন, এখন মন্ত্রীর কথা তাঁর ভালো লাগবে কেন? ধনদাস হল রাজার পিম্প, সেই জন্যেই এইভাবে কথা বলছেন।

মাইকেলের মত পড়াশোনা ক'জনের ছিল? সত্যিকারের পণ্ডিত লোক ছিলেন তিনি। গিরিশবাবুর পড়াশোনাও খুব কম ছিল না। ওঁর মৃত্যুর পর স্যার গুরুদাস যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটা পড়লে ওঁর পড়াশোনার পরিমাণ জানতে পারবে। স্যার গুরুদাস আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন হেয়ার স্কুলে সহপাঠী, এক সঙ্গে চার বছর পড়েছেন দু'জনে। গুরুদাস বড় ছিলেন। উনি তো ঠিক পঞ্চান্ন বছর বয়েসে রিটায়ার করেন। স্টেটসম্যান উনি রিটায়ার করার পর একটা এডিটোরিয়াল লেখে। আজ-কাল তো কত লোকেই রিটায়ার করছে, কই কারো জন্যে তো এডিটোরিয়াল লেখে না।

লোকে না পড়েই বলে, গিরিশচন্দ্রের লেখা ভাল নয়। অথচ মাইকেলকে বাদ দিলে বাঙলাদেশের প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। এক পণ্ডিত ব্যক্তি আমায় বোঝাচ্ছিলেন—গিরিশচন্দ্রের লেখায় কিছু নেই। তাকে প্রশ্ন করলুম, পড়েছ? তা আমতা-আমতা করতে লাগল।

হঠাৎ যা হোক একটা কিছু বলে দিলে অনেক সময় কাজ দেয়। আশুবাবুর ঐ স্বভাব ছিল, খুব জোর ডিসকাসান হচ্ছে, হঠাৎ বলে বসলেন—আর্টিকেল টোয়েন্টি সেকশন সি অনুসারে এ চলে না।

কেউ যদি খুঁজে বের করলেন, আর্টিকেল টোয়েন্টির সেকশন সি-ই নেই, তো বললেন—তাই নাকি। তাহলে ভুল বলেছিলুম।

ততক্ষণে কিন্তু কাজ হয়ে গেছে।

আশুবাবুর স্মৃতিশক্তি কিন্তু খুব বেশি ছিল, তবে ইচ্ছে করে ভুল করতেন। আশুবাবুর কর্মশক্তি যদি স্যার গুরুদাসের চরিত্রবলের সঙ্গে মিশতে পারত, তাহলে দেশের কত কাজই না করতে পারত।

ওই বেশির ভাগ সময়েই রিহার্সাল হল, তারই ফাঁকে ফাঁকে বললেন—ইনস্টিটিউটের বাড়ি তৈরি হবার পেছনে একটা ইতিহাস আছে, তখন হ্যালিডে সায়েব ছোটলাট, তিনি একবার ইনস্টিটিউটের ফাংশনে এসেছিলেন। বিনয়বাবু তাতে আমাকে থ্যাঙ্কস দিতে বললেন। বলে দিলেন, বল আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ি যদি করে দেন তো খুব ভাল হয়।

সেইটাই গুছিয়ে আমার নিজের ভাষায় বললুম। তারপরেই বাড়ি তৈরি হল।

বাড়িটা তো আমায় দুঃখ দেবার জন্যেই তৈরি করেছে। শুরলে সাহেব বললেন—এখানে যে থিয়েটার হবে তাই আমি জানতুম না।

তা তাতেও আমাদের থামাতে পারেনি, ওখানেই থিয়েটার করেছি।

বয়সা ধরে মানুষের তিনবার—প্রথম কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে, দ্বিতীয়বার ৪০-৪২ বছরে আর তৃতীয়বার ৬০-৬২ বছরে। তবে শেষ বয়েসের বয়সা আর ধরে না বিশেষ।

৭-৬ তারিখের পুনরাবৃত্তি ঘটল। রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে কথা বললেন। বললেন—দেবপ্রসাদবাবু একবার ইউনিভার্সিটিতে থিয়েটার করা বন্ধ করে দিয়ে নিয়ম করলেন। সেই সূত্র ধরে ইনস্টিটিউটে প্রোপোজাল দিলেন যে, সেখানেও থিয়েটার বন্ধ করে দিতে হবে। ওঁকে একমাত্র সাপোর্ট করলেন হেরম্ব মৈত্র। তিনি বললেন—A boy has confessed to me that he did not know what he was going into when he joined in a dramatic performance and he was ruined.

আমাদের মধ্যে একজন বললেন—In any case he would have been ruined. ওঁদের কথার জবাব দিলেন স্যার যদুনাথ: বললেন—যারা থিয়েটার করে তারা তো কেউ খারাপ ছেলে নয়। আজ যারা আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, কাল তারা গ্রাজুয়েট, তারপর এম. এ., বি. এল.। (কান্তি আর নরেশ ঠিক তাই করেছিল।) তাছাড়া সমস্ত কাজের বেলায় ওরাই এগিয়ে আসে। ২৪ ঘণ্টার নোটিসে ১২০ জন ভলান্টিয়ার পেয়েছিলে কাদের কাছ থেকে?

বাকি সকলেই স্যার যদুনাথকে সমর্থন করলেন, কাজেই প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে নাট্যোৎসবের নানা কাজের চাপ আমাদের ওপর এসে গিয়েছিল, কাজেই ওঁর কথা শোনার আর অবকাশ হয় নি। একদিন কেবল বাড়ি থেকে নিয়ে আসবার সময় কিছু কথা বলেছিলেন। কথাগুলো বোধ হয় বলেন ১৪ই ডিসেম্বর।

বললেন—মদ আমি রোজ খাই নি, বছরে ৩০০ দিন খেয়েছি এমন বছরও খুব কম আছে। সন্ধ্যাবেলা ফুরসুৎ আর পেতুম কই। কোন কোন দিন রিহার্সাল দিতে দিতে রাত এগারটা বেজে যেত, তখন আর খাওয়া হত না?

তখন আমার গাড়ি ছিল; মাঝে মাঝে থিয়েটারের পর সোজা আসানসোল চলে যেতুম। ওখানকার রেলের রেস্তোরাঁয় বড় ভাল কফি করত।

অনিদ্রা আমার অনেক কালের রোগ। থিয়েটারে থাকতে ভোর রাতে পাইচারী করে বেড়াতুম। এক ভদ্রলোক ডেকে বলেছিলেন, মশায়, অমন করে সারা রাত হাঁটেন কেন ?

চোখ কাটাব মঙ্গল যষ্ঠে গেলে—৩০শে জানুয়ারির পর। মঙ্গল আমার চিরকালের বৈরী। শনি আর মঙ্গল এক ঘরে থেকে শুধু খেয়োখেয়ি করেই গেল ! খনার বচনেও আছে—

মঙ্গল নবমে যার, রন্ধ্রগত শনি।
কে দেয় অনলে হাত, কে ধরিবে ফণী ॥

আমার এক আত্মীয় আমায় বলেছিলেন—তোমার সবই হবে : নাম, সম্মান, অর্থ, কিন্তু কিছুই রাখতে পারবে না।

ইতিমধ্যে ১১ই থেকে ১৪ই ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ওঁর অভিনয় দেখতে অসম্ভব জনসমাগম ঘটল। বহু দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে উপস্থিত, তাদের একমাত্র প্রার্থনা—একখানা টিকিট।

অনেক দিন পরে সাধারণের পক্ষে সহজগম্য জায়গায় অভিনয় করছেন বলেও বটে, আবার হয়ত এই তাঁকে দেখবার শেষ সুযোগ এ ভেবেও লোক একেবারে ভেঙে পড়ল। দু-চার জন স্পষ্টাস্পষ্টি বলেও দিল—বয়েস তো হয়েছে, কবে আছেন নেই। দেখেই নিই এইবেলা।

দর্শক আগমন দেখে উনি নিঃসন্দেহে খুশি হলেন, কিন্তু সত্তর বছর বয়সে ঐ প্রচণ্ড জনসমাবেশের সামনে পর পর চার রাত্রি অভিনয় করবার ধকল তাঁর ভাঙা শরীরে সইল না। একেই তো একটানা প্রায় মাসখানেক রিহার্সালেই তাঁর দেহে-মনে রীতিমত ছাপ পড়েছিল, তার ওপর বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো অভিনয়।

এক একদিন অভিনয় শেষ হত আর দেখতাম অসহ্য ক্লান্তিতে দেহ-মন তাঁর ভরে উঠেছে। প্রায় কোন কথা বলবার মতো অবস্থাই থাকত না। ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে দেওয়া হত, উনি চলে যেতেন আর আমরা আসতাম পরিত্যক্ত মঞ্চ থেকে জিনিসপত্র কুড়িয়ে এনে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে।

১৪ই ডিসেম্বর ওকে যখন গাড়িতে তুলে দেওয়া হল, তখন বললেন—শরীর আর বইছে না। এখন ক'দিন বিশ্রাম করব।

ওঁর শারীরিক অবস্থা বুঝে আগেই আমরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, কাজেই বললাম—নিশ্চয়, নিশ্চয়। অন্ততঃ মাসখানেক বিশ্রাম নিন আপনি।

একটুখানি করুণ হাসলেন—মাসখানেক ! অত দিন কি পারব, আচ্ছা দেখি।

ওর গাড়ি সামনের পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল আর ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে আমরা বাকি কাজ সারতে গেলাম, কানের মধ্যে তখনও মাইকেল অভিনয়ের রেশ ভেসে বেড়াচ্ছে—মরণাপন্ন মাইকেল মনোমোহন ঘোষকে নিজের সমাধির ওপর কি লেখা হবে তাই বলছেন—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এ সমাধিস্থলে।

তখনও বুঝতে পারিনি মাইকেলের পরবর্তী তিরোধান দিবসে শিশিরকুমার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলতে হবে!

॥ ১১ ॥

একদা নরকে পাপীদের দুরবস্থা দেখে লঙ্কেশ্বর রাবণের মনের বড় দুঃখ হয়েছিল, তিনি স্থির করেছিলেন মর্ত থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটানা সিঁড়ি বানিয়ে দেবেন। তাতে অন্ততঃ নরকযন্ত্রণা আর মানুষকে সহ্য করতে হবে না। কিন্তু নানা কারণে তাঁর ইচ্ছা আর পূর্ণ হল না, রামরূপী মৃত্যু এসে তাঁকে পরমধামে পাঠিয়ে দিলেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের জীবনের শেষ ছ' মাস কাল নানা বাধার দরুন আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে পাই নি। ফলে অনেক কথা পুরো জানা হয় নি, অনেক প্রশ্ন জিগ্যেসই করা হয় নি তাঁকে। একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—ভালো ভালো নাটকের চরিত্রগুলো অ্যানালাইজ করা প্রয়োজন। আমরা মনে করেছিলাম বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এলে ওঁকে দিয়ে এ কাজটা করাব; যে ক'টি নাটক তিনি পড়ে শুনিয়েছিলেন তাছাড়া আরো অনেক নাটক তিনি আমাদের পড়ে শোনাবেন, মালিনী নাটক রিহার্সাল দিতে শুরু করেছিলেন, যথাসময়ে সেটা মঞ্চস্থ করাব: নতুন কোন নাটক রিহার্সাল দেওয়া সুরু করাব। ওঁর সাহায্যে আমাদের মধ্যে যাঁরা নাটক লিখতে পারেন তাঁদের দিয়ে নতুন নাটক লেখবার ব্যবস্থা করব।

রাবণের অপূর্ণ ইচ্ছার মত আমাদের ইচ্ছাও অপূর্ণই রয়ে গেল। আমাদেরই পরিচিত এক বন্ধু যখন ১৯৫৯এর ৮ই ও ১০ই মে মহাজাতি সদনে ওঁর অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, তখনও ভাবতে পারি নি এই তাঁর শেষ অভিনয়! (দীর্ঘ ৩৮ বছর আগে যে আলমগীর নিয়ে তিনি পেশাদারী মঞ্চে অবতরণ করেন ৮ই মে সেই আলমগীরেরই শেষ অভিনয় হল।) অবশ্য পরিচিত মহলের কেউ কেউ শংকাপ্রকাশ করেছিলেন, ওঁর স্বাস্থ্য বড় খারাপ হয়ে গেছে।

ওর মনে একটা ভয় ছিল, চোখ কাটালেই একটা কিছু বিপর্যয় ঘটবে ; তাই অনেকদিন চোখ কাটাতে চান নি, কিন্তু মার্চের শেষ শেষ অবধি চোখ কাটালেন। জুন মাসে ওঁর শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই, যদিও মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা ধরছিল, ক্বচিৎ কদাচিৎ অতি সামান্য শ্বাসকষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছিল। তাকে মারাত্মক-কিছু মনে করবার কারণ ঘটে নি। তাই ৩০শে জুনের কাগজে ২৯শে জুন শেষ রাত্রে তাঁর মহাপ্রয়াণের খবর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই মনে হয়েছিল।

শিশিরকুমারের জীবনের অতি সামান্য এক ভগ্নাংশ কাল আমরা তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম এবং তারও অতি ক্ষুদ্র অংশের পরিচয় আমরা সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছি।

আগেই বলেছি, শিশিরকুমারের জীবনী লেখবার প্রয়াসী আমরা নই, আর সে অধিকারও আছে বলে মনে করি না। এ কেবল মানুষ শিশিরকুমার, আলাপচারী শিশিরকুমারকে ফুটিয়ে তোলবার সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র।

এ কাহিনীর নায়ক ও বক্তা শিশিরকুমার স্বয়ং, আমরা এখানে অবান্তর। যদি কোথাও আমাদের ব্যক্তিত্ব বক্তব্যকে ব্যাহত করে থাকে তবে সে দোষ আমাদের। যদি আমাদের লেখা কারো মনে ব্যথা দিয়ে থাকে সে ত্রুটি আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়, বরং সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। তবু ব্যথা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কাছে আমাদের আন্তরিক দুঃখ জানাচ্ছি।

শিশিরকুমারের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের সামান্য প্রমাণই আমাদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার-বিমুখ। নিজের সম্বন্ধে কথা খুব কমই বলতেন, সামান্য যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাও আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে অনিচ্ছাসত্বে বলা।

তাঁর মহাপ্রয়াণের পর বহু জনে বহু কথা বলেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক কথাই বলা হবে। সে সব কথার অধিকাংশই ব্যক্তিগত মতামত, আর বহু মত তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন না, এমন বহুজনের। এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার ফলে আমাদের যা মনে হয়েছে তারই সংক্ষিপ্তসার ব্যক্ত করছি।

প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে তাঁকে মনে হয়েছিল অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশও দেখেছি আমরা। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তখন দেখেছি অত্যন্ত রসিক সজ্জন তিনি। আমাদের সঙ্গে বয়সের তাঁর অশেষ পার্থক্য সত্বেও আমরা ছিলাম যেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়। যেখানে তাঁর

পরিচয় দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত আর আমরা অতি নগণ্য (যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন বা আসতেন তাঁর কথা শুনতে, তাঁদের অনেকেই আমাদের চিনতেন না), সেখানে তিনি আমাদের কথা সব সময়ে স্মরণে রাখতেন, ঘরে ঢুকে প্রথমেই আমাদের (এখানে আমাদের অর্থে যে সব অল্পবয়সী ছেলের দল ঘরে আসর গুলজার করতাম তাদের সকলের কথাই বলছি) খোঁজ নিতেন, কেউ হাজির না থাকলে, তার কুশল জানতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তাঁর এ স্নেহ শুধু যে আমাদের ওপরই বর্ষিত হ'ত তা নয়, দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা তাঁর থিয়েটারে কাজ করেছে তাঁদের সকলকার সম্বন্ধেই তাঁকে সমান স্নেহশীল দেখেছি। এমন কি যাঁরা একদিন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধেও তাঁর স্নেহ অব্যাহত ছিল।

কোন এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সাধারণতঃ অন্যবিষয়ে একান্ত অজ্ঞ হন। শিশিরকুমার পড়তেন এর ব্যতিক্রমের দলে। নাটক সম্পর্কীয় অন্যান্য বই তো মনোযোগ দিয়ে পড়তেনই, তাছাড়াও ইংরেজী বহু পত্র-পত্রিকা তিনি নিয়মিত পড়তেন। ইংরেজী সাহিত্যের আধুনিকতম গতি-প্রকৃতির বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে তিনি অ-ইংরেজ নাট্যকারদের নাটকও পড়তেন, জীবনের শেষ দু'টি বছরে তিনি জার্মান নাট্যকার ও জার্মানীর নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা বার্টোল্ট ব্রেক্টের নাটক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে পড়েছিলেন। আমাদের কাছে তাঁর লেখা নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলতেন—এসব নাটক পড়, পড়লে জ্ঞান বাড়বে। বিদেশী নাটক হলেই প্রশংসা করতে হবে এমন একটা মতের অন্ধ পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তাই স্বচ্ছন্দে বলেছেন—ইবসেন ডেটেড হয়ে গেছেন, ডলস হাউসের নোরার চেয়ে শক্তিমতী নায়িকার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে।

শিশিরকুমারের আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। নিজের থিয়েটারে তিনি চিরকালই বাঙালী কেতায় টিকিট ছাপিয়ে, বাঙালী ধরনে নহবত বসিয়ে খাঁটি বাঙালী পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর বাঙালীয়ানার এখানেই শেষ নয়—অবশ্য বাঙালীয়ানা বলতে শুধু প্রাদেশিকতা নয়, সত্যকারের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে গর্ব আর সেই সঙ্গে নিজেদের দোষ-ত্রুটি দূর করে যতদূর সম্ভব নিখুঁত হবার আন্তরিক প্রচেষ্টাই বুঝেছি—জগতের যে কোন জাতির সঙ্গে তুলনায় বাঙালী যাতে হীন প্রতিপন্ন না হয় সে জন্য নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বিদেশির অনুকরণে গড়া বাঙলার ফ্রেমে-আঁটা থিয়েটারে বাঙালী বুদ্ধিবৃত্তি তথা

প্রতিভার পূর্ণ বা সম্যক বিকাশ কোনমতেই সম্ভবপর নয়, একথা তিনি একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করতেন আর সেই জন্যই বার বার তিনি আমাদের কাছে বলেছেন যে, বাঙলার নিজস্ব বস্তু যাত্রার উন্নতি ঘটিয়ে তাকে বর্তমান থিয়েটারের জায়গায় বসাতে হবে। নচেৎ বাঙালী জিনিয়াস কোন দিনই তার পূর্ণ মহিমায় মুঞ্জরিত হয়ে উঠতে পারবে না।

অভিনেতা শিশিরকুমার সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমরা বাহুল্য মনে করি। বাঙলা থিয়েটারের স্বর্ণপ্রসূ যুগের পরে যাঁর নাম একক ও অনন্য মহিমায় দীপ্যমান, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের মতামতের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না; দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের ইতিহাসে সে পরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। নাট্যপ্রযোজক-পরিচালক শিশিরকুমার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে কোন কথা আমরা বলতে পারব না, কারণ আমাদের সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত, তখন তিনি ভাঙ্গা হাটের সম্রাট। সন্ধ্যার ম্লান আভা থেকে মধ্যাহ্নের দীপ্তি কল্পনা করতে পারলেও তাকে সম্বল করে মন্তব্য করা চলে না। বরং প্রসঙ্গক্রমে নাট্যশিক্ষক শিশিরকুমার সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলতে চাই।

আমাদের একটা ধারণা ছিল, উনি কাউকে শেখান না; কিন্তু প্রথম পরিচয়ের ক্ষণ থেকেই সে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটেছিল। দেখেছি, শেখাতে পেলে উনি আর কিছু চাইতেন না। অর্ধেন্দুশেখর প্রসঙ্গে একদিন বলেও ছিলেন —ঘণ্টার পর ঘণ্টা অর্ধেন্দুবাবুর মত আমিও রিহার্সাল দিয়েছি। রিহার্সাল দিতে দিতে নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছি।

তাঁর রিহার্সাল দেবার প্রণালী ছিল রীতিমত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাধারণত শিক্ষার্থীকে শিক্ষক তাঁর নিজের ভঙ্গীর অনুকরণ বা বড়জোর অনুসরণ করতে শেখান। হুবহু হাবভাব অঙ্গভঙ্গী বাচন-প্রণালী অনুসরণ করে শিষ্যরা সাধারণত গুরুদেবের কার্বন-কপি হয়ে দাঁড়ান। শিশিরকুমার কিন্তু নাটকীয় চরিত্রটি ভালো করে পড়ে বুঝিয়ে বিশ্লেষণ করে দিতেন। তিনি আশা করতেন, ভূমিকাভিনেতা চরিত্রটি অনুধাবন করে তাতে নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারবেন। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর আশা সফল হত না। কিন্তু তিনি তাতে কখনো ধৈর্য হারাতেন না, বরং ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরলস পরিশ্রম করে চলতেন ঈপ্সিত ফললাভের উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর আশা ফলবতী হত না, তখন বাধ্য হয়েই বলতেন, ঠিক হয়েছে বাবা! সময় মাফিক এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলিস।

এই ধরনের রিহার্সাল দেওয়ায় যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে একটা

সংবেদনশীল মন। যে কথা তিনি বলতে চাইতেন সে কথা বুঝতে পারার জন্ম মনের কিছুটা প্রস্তুতি থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ, অন্ততঃ শেষের দিকে প্রস্তুতি তাঁর শিষ্যদের কারোরই ছিল না। ফলে বার বার তাঁর প্রচেষ্টা ব্যাহতই হয়েছে। অবশ্য চরিত্র-বিশ্লেষণ বুঝতে না পারলে বার বার প্রশ্ন করে অপরিজ্ঞাত অংশকে উজ্জ্বল করার সুযোগ ছিল বটে, কিন্তু তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের আড়ালে অন্যরা এতদূর নিষ্প্রভ হয়ে থাকতেন যে তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করবার দুঃসাহস কারো হত না। এর অবশ্যম্ভাবী ফলই তাঁর শেষদিককার নাটকে সুপ্রকাশিত ছিল।

শিশিরকুমারের নট ও নাট্য শিক্ষক-জীবনের গোড়ার দিকে বোধ হয় তাঁকে এতটা মনোভঙ্গের বেদনা অনুভব করতে হয় নি। কারণ, সেই সময়ে তাঁর শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, শৈলেন চৌধুরী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী চারুশীলা, রবি রায় প্রমুখ এতগুলি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম পাওয়া যায় একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সেই সময় শিক্ষক হিসাবে তিনি চরম সাফল্যই অর্জন করেছিলেন।

নাট্যবোদ্ধা হিসাবে শিশিরকুমার ছিলেন অতুলনীয়। যে কোন নাটক পাঠমাত্রেই তার দোষ-গুণ তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন ; এমন কি কোন্ কোন্ অংশের পরিবর্তন ঘটালে নাটকের নাটকীয়তা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা যায়, একথাও অতি সহজেই বলতে পারতেন। এ বিষয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় শ্রদ্ধেয় ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর মুখে শোনা একটি কাহিনী যথেষ্ট আলোকপাত করবে বলেই মনে হয়। ডাঃ অধিকারী বলেছিলেন—আমেরিকায় যাবার আগেই যোগেশবাবু (চৌধুরী) বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকটি লেখেন। তাঁর বাড়িতে নিশ্চিন্তে লেখার সুবিধা ছিল না বলে, তিনি আমার বাড়িতে বসে বসে নাটকটি লেখেন। এক একটি দৃশ্য শেষ হত আর আমাকে পড়ে শোনাতেন, তারপর বিকালে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে লেখার কোথায় কি দোষ ত্রুটি আছে, এ নিয়ে আলোচনা করতাম আমরা।

শিশিরবাবু আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর নাটকটির কথা তাঁকে বলা হয়, তা তিনি বলেন—লেখাটা একবার পড়ে শোনাতে পারেন? তাঁর বিডন স্ট্রীটের বাসায় লেখাটা নিয়ে গিয়ে পড়ে শোনালেন যোগেশবাবু। সবটা শুনে শিশিরবাবু এক এক করে কোথায় কি দোষ-ত্রুটি আছে বলতে সুরু করলেন : ১ম অঙ্কের ২য় দৃশ্যটা বদলান দরকার। ২য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য এভাবে থাকা উচিত নয় ; ৪র্থ অঙ্কের ১ম দৃশ্য অপ্রয়োজনীয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। উনি হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—আপনারা আমার সঙ্গে রহস্য করছেন বলে মনে হচ্ছে।

তখন যোগেশবাবু বললেন—না, রহস্য করি নি, তবে আমরা দুজনে ছ'মাস ধরে আলোচনা করে যে-সব দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করেছিলাম, আপনি একবার শুনেই তা ধরতে পারলেন কি করে?

একটু হেসে তিনি বললেন—আমি যে মাতাল।

শিশিরকুমার সবচেয়ে শেষে যে কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলোকে বাদ দিলে, সমস্ত কাহিনীটি থেকে একটা কথাই মনে হয়—কি অসাধারণ সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল তাঁর! যিনি একবার মাত্র শুনে একটি নাটকের সম্পূর্ণ দোষ-গুণ নখদর্পণে দেখতে পান নাট্যবোদ্ধা হিসাবে তাঁর নামের আগে কোন বিশেষণই তাঁর গুণের পরিমাপ করতে সক্ষম হবে না।

যে নাটক লোকে অসম্ভব বলেছে তাকেই অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিল তাঁর এই সূক্ষ্ম রসবোধ। সকল রসিকব্যক্তিই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সংলাপ সত্ত্বেও দেনা-পাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ ষোড়শী শিশিরকুমারের অভিনয় ব্যতিরেকে কোনদিনই নাটক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না। জীবানন্দের মত অসম্ভব চরিত্রও যিনি রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ করে তুলতে পারেন তাঁর রসবোধ যে কত সূক্ষ্ম আর কত তীক্ষ্ণ, তা বলে বোঝান বাতুলতার নামান্তর।

শিশিরকুমারের এই সূক্ষ্মদৃষ্টি শুধুমাত্র নাটক-বিচারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উপরন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা প্রখরভাবে প্রকট হত। একটা দৃষ্টান্ত দিই, একবার সারনাথের সংগ্রহশালায় বেড়াতে গিয়েছিলেন শিশিরকুমার, সঙ্গী ছিলেন ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী (কাহিনীটি তাঁর কাছ থেকেই আমাদের শোনা)। সংগ্রহশালার কিউরেটার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃবন্ধুকে সযত্নে সমস্ত কিছু দেখাচ্ছিলেন। এই সময়ে ওখানে একটি মূর্তি ছিল, সেটি যে কিসের মূর্তি বিশ হাজার নানান ধরনের দর্শকের কেউই তা ধরতে পারেন নি। অদ্রীশ বাবু শিশিরকুমারকে মূর্তিটি দেখিয়ে জানতে চাইলেন, সেটি কিসের মূর্তি। শিশিরকুমার একটু লক্ষ্য করে বললেন—এ তো মঙ্গোলিয়ান ধরনের দ্বারপাল-গোছের মূর্তি দেখছি। অদ্রীশ বাবু তো থ, বিস্ময়ের প্রাবল্য কমতে তিনি স্বীকার করলেন, তিব্বতী ধরনের মূর্তিটির সারনাথে উপস্থিতি তাঁদের বিভ্রান্তই করেছে, অথচ বিশেষজ্ঞ বিদগ্ধ দর্শকরাও এর ধরন ধরতে পারেন নি।

বিশ হাজার লোক যা দেখতে পায়নি শিশিরকুমারের চোখে তা পড়ল কি করে? তিনি নিজে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন—আমি যে বাবা মাতাল। কিন্তু মাতাল হলেই কি এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি পাওয়া যায়? তাহলে তো দেশের তাবৎ মাতাল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি হতে পারত। তা হওয়ার নয়, আর নয় বলেই মাতাল হ'ন বা না হ'ন. শিশিরকুমার শিশিরকুমারই, আর অন্যরা কিছু নয়। রাজরাণী মীরার একটি ভজনে এ পার্থক্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—

দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎসবালা
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

নন্দলালকে পেতে হলে প্রয়োজন যে প্রেমের এই কথাই সার। অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্যকে লাভ করতে হলে প্রয়োজন সাধনার আর প্রয়োজন সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো বিধিদত্ত ক্ষমতা।

শিশিরকুমার সম্বন্ধে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত—তিনি নাকি অত্যন্ত দাম্ভিক। প্রতিভার নিজস্ব একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় থাকে, তাকে অহমিকা বলে ভুল করা সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু এ ধরনের ভুল করা অন্যায়, কারণ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তিকে দাম্ভিক বললে তাঁর প্রতিভাকে অসম্মান করা হয়। প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, সে আপনার মাঝে আপনি হারায়ে কোন সুদূর দিগন্তে কল্পনার রঙীন পাখনায় ভর করে ভেসে বেড়ায়, দৈনন্দিনের রূঢ় বাস্তব তাকে স্পর্শ করে কিন্তু মনের মধ্যে তা স্থায়ী হয় না। এই আত্মনিমগ্নতাকে গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলে তাকে কি দম্ভ বলা যায়?

শিশিরকুমারের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে বলতে পারি, তিনি মোটেই দাম্ভিক ছিলেন না। প্রথম দর্শনে অবশ্য এ ভুল হওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর চারিদিকে একটা ছদ্ম-গাম্ভীর্যের বর্ম পরিয়ে রেখেছিল। পরিচয় কিছু ঘনিষ্ঠ হলেই বোঝা যেত, অত্যন্ত সদালাপী, হাস্যময় রসিক পুরুষ তিনি। মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে প্রায় আমাদেরই সমবয়সী হয়ে পড়তেন। তাঁর সরস বাচনভঙ্গী ও নির্মল রসিকতায় প্রায়ই আমাদের দলে হাসির রোল উঠত।

অর্থের প্রতি শিশিরকুমারের অত্যন্ত মোহ ছিল, এমন একটা কথাও শোনা যায়। আমাদের সঙ্গে তাঁর যখন পরিচয় হয় তখন তিনি অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু তবু সিনেমায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সে দিকে যান নি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সিনেমা তাঁর সৃষ্টির উপযুক্ত মাধ্যম নয়।

আমাদেরও সেই কথাই বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পুরানো নাটক পড়ে শোনানর জন্য যখন কথা বলা হয়, তখন তাঁকে দর্শনী নিয়ে নাটক পড়ার কথা আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল। তিনি কিন্তু রাজী হন নি, বলেছিলেন—না, বহুলোক এলে ঠিকমত ভাবে তারা পড়ার রস হয়ত পাবে না আর তাতে আমার মনও ভরবে না। তার চেয়ে তোমরা যদি আমার কাছে পড়া শুনে কোন লাভ হবে মনে কর তো তোমাদের কাছে গিয়ে পড়তে পারি। নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদ সৃষ্টির গোড়ার কথা এই।

এমন অনেক মানুষ থাকেন—যাঁরা আত্মসম্মানের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করতে চান না। আজকের বস্তুতান্ত্রিক যুগে আমরা তাঁদের ব্যবসা-বুদ্ধিহীন বা বোকা বলতে পারি, কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারি না। সেইজন্যই শিশিরকুমার যখন নিজের বিবেকের সঙ্গে আপস-রফা না করে বহু লোভনীয় প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে চলে যান, তখন তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত আমাদের হতেই হয়।

শিশিরকুমারের যে অর্থের প্রতি অপরিমেয় মোহ ছিল না তার প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি, ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দীর্ঘকাল ধরে যখন থিয়েটার বন্ধ ছিল তখনও তিনি দলের কোন লোককেই বরখাস্ত করেন নি, বরং প্রত্যেককেই নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু অর্থ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দিয়ে এসেছেন। এ ছাড়া নিতান্ত অক্ষম হলেও পারতপক্ষে তিনি কোন লোককেই ছাড়াতে চাইতেন না। এমন কি, অনেকে তাঁর দল ছেড়ে চলে যাবার পর আবার যখনই ফিরে আসতে চেয়েছে তখনই তিনি তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিতেন। এ প্রসঙ্গে কেউ কিছু বলতে গেলে, বলতেন—দেখ, আমার যা বয়েস, তাতে পুরানো কথা মনে করে রাখাটা অন্যায়। যারা আসতে চায় তাদের আসতে বাধা দেব না, আর কাউকে সেধে আসতেও বলব না।

উনবিংশ শতকে বাঙলা দেশে যে নবজাগরণের তরঙ্গ উঠেছিল, যার সাড়া জীবনের প্রতি কোষে নাড়া দিয়েছিল, যার পরিচয় বাঙলা সাহিত্যে, বাঙলার কৃষ্টি, বাঙালী মনীষা, বাঙালীর চিন্তাধারা তথা বাঙালী সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, শিশিরকুমার তারই অন্যতম শেষ ধারক ও বাহক। থিয়েটারে যোগ না দিলে চিন্তাজগতের অন্যত্রও তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ সুস্পষ্ট হয়ে উঠত, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তবুও তিনি কেন সামাজিক লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে স্বীকার করে নিয়ে থিয়েটারের বন্ধুর পথে এলেন ?

প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্য থিয়েটার-প্রীতি, না শুধু প্রীতিই নয় প্রেম।

থিয়েটারকে তিনি মনে-প্রাণে ভালবাসতেন, তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই থিয়েটারের উন্নতির কথাই ভেবেছেন।

তা ছাড়াও তিনি বিশ্বাস করতেন অভিনয়ই তাঁর true vocation, বলেছেনও—ঐটাই যা কিছু করতে পারি। A nation is known by its stage—এ কথাটা তিনি খুবই বিশ্বাস করতেন, তাই প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই দেশকে জাতিকে কিছু না-কিছু ভাববার কথা তিনি শুনিয়েছেন। অবশ্য তাঁর কথা শুধুমাত্র অরণ্যে রোদন সার হয়েছে কি না সে-খবর আমাদের চেয়ে অধিকতর ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা বলতে পারেন, আমরা শুধু এইটুকুই বলব যে, চিন্তার যদি সামান্য মূল্যও সমাজ দেয় তো শিশিরকুমারের চিন্তাধারা অমূল্য বলে বিবেচিত হবে।

আজকের সমাজ আর গত শতকের সমাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাই আজকের দিনে উনবিংশ শতকের ধারায় শিক্ষিত ভদ্র মার্জিত রুচির সঙ্গে আমাদের রুচিকে খাপ খাওয়ানো রীতিমত কষ্টসাধ্য। সমাজের যখন একমাত্র মন্ত্র—Dog eats dog, Everything is fair and devil take the hindmost. তখন শিশিরকুমার যে নিতান্তই বেমানান হতেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। যতই রুচিবান আর যতই হৃদয়বান হ'ন, মাষ্টার মশায়ের হাতের বেতের কথা স্কুল-পড়ুয়ারা ভোলে কি করে? সুতরাং মাষ্টার মশায়ের অন্তর্ধানে সকলেই নিশ্চিন্ত।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের অবদান আজকে বিচার করা সম্ভব নয়, তবু এইটুকু বলা চলে যে, বাঙলা নাট্যজগতের অবিসংবাদী সম্রাট গিরিশচন্দ্রের কাছাকাছি যিনি পৌঁছাবার দাবি করতে পারেন, তিনি শিশিরকুমার। চাণক্য ক্ষত্রিয়ের দেহে ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক চেয়েছিলেন, বিশ্বজয়ের স্বপ্ন সফল করবার জন্য। শিশিরকুমার সেই শক্তির অধিকারী হয়েও ব্যর্থ হলেন কেন, সে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

সহজাত কবচ-কুণ্ডলের অধিকারী কর্ণ অপরিমেয় পৌরুষ সত্ত্বেও কেন নিয়তির হাতে ক্রীড়নক হয়ে রইলেন, কেন বার বার বিরূপ-ভাগ্যের তাড়নায় করায়ত্ত সাফল্যলাভ করতে পারলেন না, তার রহস্য ছিল তাঁর জন্মমুহূর্তের মধ্যেই। শিশিরকুমারের ক্ষেত্রেও এমনি একটা কিছু ঘটেছিল কি না তা বলতে পারি না, তবে দাতাকর্ণের দানের ছিদ্রপথের মত কোন এক কোমলতার ছিদ্রপথেই যে নিয়তির অমোঘ সন্ধান তাঁর মর্মচ্ছেদ করেছিল এ সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত।

যে মানুষ দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের কর্মজীবনে সর্বদাই নাটকের আবেদন হৃদয়াবেগের দিকে চালিত না করে মস্তিষ্কের দিকে চালিত করেছিলেন, তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে হৃদয়াবেগের দ্বারা এত বেশি পরিচালিত হলেন কেন, তা বোঝা

অত্যন্ত কঠিন! অনেক বিচার-বিবেচনা করেও এ সমস্যার সমাধান করতে পারি নি।

নট, নাট্য-পরিচালক, প্রযোজক শিশিরকুমার আর ব্যক্তি শিশিরকুমার যেন দু'টি বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব। নাটক সম্বন্ধীয় সব বিষয়ে যে ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়, সেই ব্যক্তিত্বই ব্যক্তিগত হাসি-কান্নার দোলায় সম্পূর্ণ সাধারণ—এই দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বই তাঁর প্রতিভার মহত্তব প্রকাশের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা হয়ে পড়েছিল। যদি তা না হত তাহলে নাট্যাচার্যের যে অত্যুজ্জ্বল ভাতি আমরা দেখতে পেতাম তা যা আমরা পেয়েছি তাকে বহু নিচে ফেলে রেখে যেত। কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!

শিশিরকুমার সম্বন্ধে যা কিছু বলার ছিল তা এবার শেষ হল। পাঠকদের কাছে ব্যক্তি শিশিরকুমারের কিছু মাত্র প্রকাশ যদি দেখাতে পেরে থাকি তো তাই আমাদের চরম সার্থকতা।

মানুষ শিশিরকুমার গত হয়েছেন, কিন্তু স্রষ্টা শিশিরকুমার রইলেন চিরজীবী, সেই মৃত্যুঞ্জয়ীর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেই শেষ করছি।

নাট্যাচার্য অভিনীত। পরিচালিত। প্রযোজিত নাটকের তালিকা

আলমগীর | ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ | আলমগীর, রাজসিংহ, গরীবদাস
১০ই ডিসেম্বর ১৯২১, ম্যাডান কোম্পানী

রঘুবীর | ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ | রঘুবীর | ১০ই মার্চ ১৯২২

চন্দ্রগুপ্ত | দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | চাণক্য, পারিষদ, চন্দ্রগুপ্ত
১লা জুলাই ১৯২২, ম্যাডান কোম্পানী

সীতা | দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | রাম
ডিসেম্বর ১৯২৩, প্রদর্শনী ইডেন গার্ডেন

বসন্তলীলা | মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
(আলফ্রেড থিয়েটার, বর্তমান গ্রেস সিনেমা) ১৯২৩ দোল পূর্ণিমা

সীতা | যোগেশচন্দ্র চৌধুরী | রাম
৬ই আগষ্ট ১৯২৪, মনোমোহন-নাট্যমন্দির

পাষাণী | দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | ইন্দ্র ও গৌতম | ১০ই ডিসেম্বর ১৯২৪

জনা | গিরিশচন্দ্র ঘোষ | প্রবীর, নীলধ্বজ, বিদূষক | ৩রা জুন ১৯২৫

পুণ্ডরীক | শ্রীশ বসু | পুণ্ডরীক | ১৩ই আগষ্ট ১৯২৫

বিসর্জন | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | রঘুপতি, জয়সিংহ
২৬শে জুন ১৯২৬, নাট্যমন্দির (শ্রী সিনেমা)
নর-নারায়ণ—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ | কর্ণ, অর্জুন | ১লা ডিসেম্বর ১৯২৬
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। গিরিশচন্দ্র ঘোষ | কীচক ও ব্রাহ্মণ | ১লা জুলাই ১৯২৬
ভীষ্ম | ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ | ১৯২৬ | যুবক ও বৃদ্ধ ভীষ্ম
মুক্তার মুক্তি | মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় | ১৯২৬ | রতন চাঁদ
প্রফুল্ল | গিরিশচন্দ্র ঘোষ | যোগেশ, রমেশ (১৯২৭ সালের মাঝামাঝি)
ষোড়শী (দেনা-পাওনা) | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | জীবানন্দ | ৬ই আগষ্ট ১৯২৭
শেষরক্ষা (গোড়ায় গলদ) | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | চন্দ্রবাবু | ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭
সাজাহান | দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | ১৯২৭ | সাজাহান, ঔরংজেব
সধবার একাদশী | দীনবন্ধু মিত্র | ১৯২৭ | নিমচাঁদ
ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল) | অমরেন্দ্র দত্ত | ১৯২৭ | গোবিন্দ লাল
বলিদান | গিরিশচন্দ্র ঘোষ | করুণাময়, দোলাল চাঁদ | ২৫শে জানুয়ারী ১৯২৮
বিল্বমঙ্গল | গিরিশচন্দ্র ঘোষ | বিল্বমঙ্গল | ২৯শে মে ১৯২৮ নাট্যমন্দির
হাস-নো-হানা | বরদা দাসগুপ্ত | ঘাতক রুদ্রগিরি | ২৫শে আগষ্ট ১৯২৮
দিগ্বিজয়ী | যোগেশচন্দ্র চৌধুরী | নাদির শাহ্
১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৮ নাট্যমন্দির (কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার)
বিবাহ বিভ্রাট | অমৃতলাল বসু | মিঃ সিং | ৩রা মে ১৯২৯ নাট্যমন্দির
বুদ্ধদেব | গিরিশচন্দ্র ঘোষ | বুদ্ধদেব | ৮ই জুন ১৯২৯ নাট্যমন্দির
চিরকুমার সভা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | চন্দ্রবাবু, রসিক
২৯শে জুলাই ১৯২৯ স্টার থিয়েটার
রমা | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | রমেশ, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী
(পল্লীসমাজ) আগষ্ট ১৯২৯, নাট্যমন্দির
শঙ্খধ্বনি ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | কেতন লাল | ২রা নভেম্বর, ১৯২৯
তপতী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | বিক্রমদেব | ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৯
প্রতাপাদিত্য ক্ষীরোদপ্রসাদ | প্রতাপাদিত্য, রডা | জানুয়ারী ১৯৩০
মন্ত্রশক্তি অনুরূপা দেবী | মৃগাঙ্ক, রমাবল্লভ | জুলাই, ১৯৩০ আর্ট থিয়েটার
কর্ণার্জুন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | কর্ণ | জুলাই, ১৯৩০ আর্ট থিয়েটার
সীতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী | রাম—শিশিরকুমার, সীতা—প্রভাদেবী,
বশিষ্ঠ—যোগেশচন্দ্র, বাল্মিকী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
১২ই জানুয়ারী ১৯৩১, ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটার, ন্যু-ইয়র্ক
বিষ্ণুপ্রিয়া | যোগেশচন্দ্র চৌধুরী | নিমাই | ৮ই আগস্ট ১৯৩২, রঙমহল
পাণ্ডব গৌরব | গিরিশ চন্দ্র ঘোষ | ভীম ও ভীষ্ম
মহাপ্রস্থান | সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত | শ্রীকৃষ্ণ | ২৫শে নভেম্বর ১৯৩২ নাট্য-নিকেতন
গৈরিক পতাকা | শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | ১৯৩২ | শিবাজী
বৈকুণ্ঠের খাতা | রবীন্দ্রনাথ | ১৯৩৩ | কেদার, অবিনাশ, তিনকড়ি

রিজিয়া | মনোমোহন রায় | ১৯৩৩ | ঘাতক ও বক্তিয়ার
কেদার রায় | ১৯৩৩ ১লা জুলাই—স্টার থিয়েটার | কেদার রায়
দক্ষযজ্ঞ | গিরিশচন্দ্র ঘোষ | ১৯৩৩ | দক্ষ
অভিমানিনী | ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩৪ নব নাট্যমন্দির | রাজা বীরেন্দ্র সিংহ
ফুলের আয়না | নরেন্দ্র দেব ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী, ছোটদের জন্য প্রথম
বিরাজ বৌ | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | নীলাম্বর | ২৮শে জুলাই ১৯৩৪
সরমা | সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | রাবণ | ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪
দেশের দাবী | শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | দয়াল (জমিদার) ২৪শে নভেম্বর ১৯৩৪
বিজয়া | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | রাসবিহারী, নরেন
২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ নব-নাট্যমন্দির
শ্যামা | সত্যেন গুপ্ত | নবাব ক্ষ ভণ্ডীয় | ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
রীতিমত নাটক | জলধর চট্টোপাধ্যায় | দিগম্বর | ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩৫
অচলা | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | কেদার ও সুরেশ
(গৃহদাহ) ২০শে অক্টোবর ১৯৩৬ নব-নাট্যমন্দির
যোগাযোগ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | মধুসূদন | ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৬
জীবনরঙ্গ | তারাকুমার মুখোপাধ্যায় | নাট্যাচার্য অমরেশ
২৮শে নভেম্বর ১৯৪১ শ্রীরঙ্গম
উড়ো চিঠি | নিতাই ভট্টাচার্য | সুনীল | ১১ই মার্চ ১৯৪২ শ্রীরঙ্গম
দেশবন্ধু | মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য | মন্ত্রী-কহ্লন | ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২
মায়া | ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪২ | জেঠামশায়
মাইকেল | নিতাই ভট্টাচার্য | মাইকেল | ২৩শে এপ্রিল ১৯৪৩ শ্রীরঙ্গম
বিপ্রদাস | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | বিপ্রদাস | ২৭শে নভেম্বর ১৯৪৩
বিন্দুর ছেলে | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | যাদব | ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ শ্রীরঙ্গম
সিরাজদ্দৌলা | গিরিশচন্দ্র ঘোষ | ১৯৪৭—৪৮ | সিরাজদ্দৌলা
পরিচয় | জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | রায় বাহাদুর | ১০ই আগষ্ট ১৯৪৯
তখৎ-এ-তাউস | প্রেমাঙ্কুর আতর্থী | জাহান্দার শা | ১০ই মে ১৯৫১ শ্রীরঙ্গম
প্রশ্ন | তারাকুমার মুখোপাধ্যায় | নীতিচন্দ্র | ৩রা জানুয়ারি ১৯৫৩
চাটুয্যে বাড়ুয্যে | অমৃতলাল বসু | বাড়ুয্যে
খাসদখল | অমৃতলাল বসু | নিতাই
চন্দ্রশেখর (বঙ্কিমচন্দ্র) | অমৃতলাল বসু | ফস্টর
মিশর কুমারী | বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত | আবন
১৯৫৮-এর ১১, ১২, ১৩, ১৪ই ডিসেম্বর মাইকেল, ষোড়শী, বিজয়া ও মাইকেল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এবং সর্বশেষ অভিনয় মহাজাতি সদনে—৮ই মে ১৯৫৯ আলমগীর ও ১০ই মে রীতিমত নাটক।

ছাত্র জীবনে কলেজে—Hamlet-এ king ও Ghost, Julius ceaser-এ Brutus ; Merchant of venice-এ Antonio,

ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনে ইন্‌স্টিটিউটে—জনাতে প্রবীর, কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যু, বুদ্ধদেবে বুদ্ধদেব, চন্দ্রগুপ্তে চাণক্য, অশোকে অশোক, ভীষ্মে পরশুরাম, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে ভীম ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, রঘুবীরএ রঘুবীর, বৈকুণ্ঠের খাতাতে —অবিনাশ, কেদার, তিনকড়ি।

অবৈতনিক নাট্যসমাজে—রাণাপ্রতাপ-এ আকবর,

ল-কলেজে—পুনর্জন্মে অশ্বিনী,

পরিচালিত ও প্রযোজিত নাটক—জয়দেব, তুলসীদাস, কুন্তদরজী, ফুলের আয়না, আলিবাবা, রাধাকৃষ্ণ, বন্দনার বিয়ে, তাইতো, আগমনী, শিবরাত্রি, দুঃখীর ইমান, আবুহোসেন :

ছায়া ছবিতে ● নির্বাক ও সবাক চিত্রে—পোষ্যপুত্র, রীতিমত নাটক (টকী অফ টকীজ), সীতা, চাণক্য, বিচারক, পল্লীসমাজ প্রভৃতি।